এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

আধুনিক বাগর্থবিদ্যার গতিপ্রকৃতি : তত্ত্বায়নের সমস্যা ও সূত্রনীতি

(TRENDS IN MODERN SEMANTICS: PROBLEMS AND PRINCIPLES OF THEORISATION)

বিনয় চন্দ্র বর্মন

এম. ফিল. (দ্বিতীয় পর্ব)

রেজি: নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১০৮/১৯৯৫-'৯৬

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল

ক্রমিক নং - ২

ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক :

ডঃ রাজীব হুমায়ুন [illegible]

অধ্যাপক

ভাষাতত্ত্ব বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
401
BAA
C-2

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

382718

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

আধুনিক বাগর্থবিদ্যার গতিপ্রকৃতি ঃ তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি

(TRENDS IN MODERN SEMANTICS: PROBLEMS AND PRINCIPLES OF THEORISATION)

GIFT

বিনয় চন্দ্র বর্মন
এম. ফিল. (দ্বিতীয় পর্ব)
রেজিঃ নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ঃ ১০৮/১৯৯৫-১৯৯৬
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল
ক্রমিক নং - ২
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
382718
382718

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

ডঃ রাজীব হুমায়ুন কবির
অধ্যাপক
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য দাখিল করা হয়নি।

বি. বর্মন
০৮. ০৯. ৯৯

বিনয় চন্দ্র বর্মন

ঘোষণা

বিনয় চন্দ্র বর্মন আমার তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমার জানামতে তিনি এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য দাখিল করেননি।

382718

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

০৮. ০৯. ৯৯

রাজীব হুমায়ুন কবির
অধ্যাপক
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

প্রথমেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডঃ রাজীব হুমায়ুনের প্রতি, যার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। তার বিশাল পান্ডিত্য, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সৃজনশীল মানসিকতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিজ্ঞ সমালোচনা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলা ভাষায় বাগর্থবিদ্যার চর্চা ও গবেষণা শীর্ণতোয়া নদীর মতো। ফলে আমাকে প্রায় সর্বতোভাবে পাশ্চাত্য মনীষীদের বইপুস্তকের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। পরিভাষার তালিকা ও গ্রন্থপঞ্জির দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় বাগর্থবিদ্যার উপর যে হাতেগোনা দু'তিনটি পুস্তক রচিত হয়েছে তাদের কদর মূলত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে। তথাপি তাদের কাজের যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। রমাপ্রসাদ দাস, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, হুমায়ুন আজাদ, জাহাঙ্গীর তারেক প্রমুখ বাংলা ভাষায় বাগর্থবিদ্যা চর্চার পথিকৃত। তাদের প্রভাব আমার উপর প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত। পরিভাষার জন্য আমাকে ব্যাপকভাবে তাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। ডঃ হুমায়ুন আজাদ এবং ডঃ জাহাঙ্গীর তারেক ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এখানে আরো দুজন শিক্ষকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যারা সবসময় আমাকে গবেষণাকাজে উৎসাহ দিয়েছেন। তারা হলেন ডঃ খন্দকার ফজলুল হক, অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডঃ কাজল কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিজের সংগ্রহ ছাড়াও বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, ভাষাতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগার, ইংরেজী বিভাগের ভাষা গ্রন্থাগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বইপত্র আমি গবেষণায় ব্যবহার করেছি। তাই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট আমার ঋণ অন্তহীন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ইন্টারনেট ব্রাউজ করে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি সাম্প্রতিক ও চলতি তথ্যাবলী আহরণের মাধ্যমে। আমি এই কম্পিউটার কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

গবেষণা মানে গ্রন্থের সান্নিধ্যে জনবিচ্ছিন্ন অসামাজিক জীবনযাপন। গবেষণাকালে অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিনের মতো অবস্থা হয় গবেষকের। আমার এই অতিব্যস্ত সময়টিতে যারা নিজের গরজে মাঝেমধ্যে আমার খোঁজখবর নিয়ে জনবিচ্ছিন্নতা কাটিয়েছেন আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে বন্ধুপ্রতিম খাজা আহমেদ সবুজ, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, আসলাম হোসেন ও আযম খান বিভিন্নভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার দাবিদার পরিবারের সকল সদস্য যাদের নিঃশর্ত ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা না পেলে এই কঠিন কর্ম সম্পাদন করা হয়তো অসম্ভব হতো। বিশেষ করে আমার পিতামাতার আর্থিক আনুকূল্য ও স্নেহ আমি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো। পিতাকে কম্পিউটারে আমার সহযোগী হিসাবে পেয়েও আমি ধন্য।

বিনয় বর্মন

382718

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা

অংশগ্রহণকারী – participant
অংশগ্রহণকারী ভূমিকা – participant role
অংশগ্রাহক কারক – participative (case)
অংশনাম – meronym
অংশনামিতা – meronymy
অংশনামীয় – meronymous
অকর্মক ক্রিয়া – intransitive verb
অক্ষরক্রমে – alphabetically
অক্রমিক – non-gradable
অঙ্গীকারকর্ম – commissive
অঙ্গীকারসাধক – commissive
অতিবাক্য – text
অতিবাক্যিক কাঠামো – superstructure
অতিশয়োক্তি – hyperbole
অতিসেট – superset
অত্যাবশ্যক নিয়ম – essential rule
অদৃষ্টান্তস্থানীয় – atypical
অধঃমৌলিক স্তর – sub-basic level
অধিকরণ কারক – locative (case)
অধিক্রমন – overlapping
অধিক্রমন করা – overlap
অধিক্রমনমূলক বিরোধিতা – overlapping opposition
অধিবিদ্যা – metaphysics
অধিভাষা – metalanguage
অধীনস্থ – subordinate
অনাত্মবাচক সম্পর্ক – irreflexive relation
অনির্ধারণযোগ্যতা – indeterminacy
অনুকল্প – metonymy
অনুপূরক – supplementary
অনুলাপ – tautology
অনুস্থাপন – paradigm
অনুস্থাপনিক – paradigmatic
অনেকার্থক – polysemous
অনেকার্থকতা – polysemy
অন্যোন্য – reciprocal
অপেক্ষক – function
অপ্রকাশ্য কৃতিসাধক – implicit performative
অপ্রতিসম – asymmetrical
অপ্রতিসম সম্পর্ক – asymmetrical relation
অপ্রান্তিক গ্রন্থি – nonterminal node
অবধারণ – perception
অবনতি – degeneration
অবস্থা (ক্রিয়া) – state (verb)
অবস্থানক – positioner
অবস্থানিক সম্পর্ক – positional relation
অবাঙমূলক কর্ম – illocutionary act
অবিন্যস্ত – unordered
অভিক্রম – approach
অভিজ্ঞতামূলক – empirical
অভিজ্ঞতালাভকারী – experiencer
অভিধান – dictionary
অভিধানবিদ্যা – lexicography
অভিমুখ – direction
অভিমুখী – directional
অভেদমূলক সম্পর্ক – identificational relation
অর্থ – meaning / sense
অর্থ সম্পর্ক – sense relation
অর্থ স্বীকার্য – meaning postulate
অর্থবোধলোপ – semantic aphasia

Dhaka University Institutional Repository

অর্থমূল – sememe

অর্থমূলীয় সূত্র – sememic formula

অর্থসম্পর্ক – sense relation

অর্থাণু – semon

অর্থাণু জালিকা – semon network

অর্থোদ্ধার করা – decode

অন্তঃশায়িত বাক্য – embedded sentence

অন্তর্দ্যোতিক যুক্তিবিদ্যা – intentional logic

অন্তর্দ্যোতনা – intension

অন্তর্ভুক্তিমূলক – inclusive

অসঞ্চারমূলক সম্পর্ক – intransitive relation

অসমঞ্জস – anomalous

অসামঞ্জস্য – anomaly

অস্তিত্ববাচক পরিমাপক – existential quantifier

অস্তিত্ববাচক পূর্বধারণা – existential presupposition

অস্পষ্টতা – vagueness

অস্বীকার, নেতিবাচকতা – negation

আকস্মিক – accidental

আকস্মিক প্রতীক – accidental symbol

আচরণবাদ – behaviorism

আচরণবাদী – behaviorist / behavioristic

আচরণবাদী তত্ত্ব – behaviorist theory

আচারসাধক – behavitive

আত্ম – ego

আত্মবাচক – reflexive

আত্মবাচক সম্পর্ক – reflexive relation

আদর্শরূপ – prototype

আদর্শরূপ তত্ত্ব – prototype theory

আধুনিক বাগর্থবিদ্যা – modern semantics

আনুভূতিক – affective

আনুভূমিক – horizontal

আনুষঙ্গ – association

আনুষঙ্গিক – associative

আন্তর – intrinsic

আন্তরিকতা নিয়ম – sincerity rule

আপেক্ষিক – relative

আপেক্ষিকতা – relativity

আবেগাত্মক – emotive

আবেগার্থ – emotive meaning

আরোপন – substitution

আর্থশাব্দিক নিয়ম – semoleximic rule

আর্থশাব্দিক রূপান্তর – semoleximic transformation

আলংকারিক প্রয়োগ – figurative use

আলাপিত অর্থ – negotiated meaning

আলোচ্য বিষয় – topic

আহরণ – derivation

আহরণগত নিয়ন্ত্রণ – derivational constraint

ইঙ্গিত – implication

ইঙ্গিতমূলক নিয়ম – implicational rule

ইঙ্গিতার্থ – implicature

ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব – implicature theory

ইঙ্গিতের নিয়ম – rule of implication

উক্তি – utterance

উৎপাদক – productant

উৎপাদন নিয়ম – production rule

উৎস্য – source

উদ্দীপক – stimulus

উদ্দেশ্য কারক – purposive (case)

উন্নতি – elevation

উপনাম – hyponym

উপনামিতা – hyponymy

উপনামীয় – hyponymous

Dhaka University Institutional Repository

উপরি বাগর্থিক সংগঠন – surface semantic structure

উপরি সংগঠন – surface structure

উপশ্রেণীকরণ – subcategorisation

উপশ্রেণীকরণ নিয়ম – subcategorisation rule

উপসেট – subset

উপস্থাপন – presentation

উপস্থাপনা – representation

উপাদান – component

উর্ধ্বনাম – superordinate

উর্ধ্বস্তর – superordinate level

উর্ধ্বাক্ষর – superscript

উল্টো – reverse

উল্টোক – reversive

উল্লেখ – mention

ঋজুকরণ – reinforcement

একক – unit

একবাচনিক – singular

একরূপী – uniform

একস্থানিক বিধেয়ন – one place predication

ঐতিহাসিক – historical

ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যা – historical semantics

ঐতিহ্যগত – traditional

ঐতিহ্যবাহী বাগর্থবিদ্যা – traditional semantics

ঔপাদানিক – componential

ঔপাদানিক বিশ্লেষণ – componential analysis

কথোপকথনমূলক ইঙ্গিতার্থ – conversational implicature

করণ কারক – instrumental (case)

কর্তা – agent

কর্তৃকারক – agentive (case)

কর্ম – patient

কর্মপ্রক্রিয়া – procedure

কর্মপ্রক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ – procedural step

কর্মপ্রক্রিয়ামূলক বাগর্থবিদ্যা – procedural semantics

কর্মসংহিতা – code of action

কাব্যার্থ – poetic meaning

কারক ব্যাকরণ – case grammar

কারণিক – causal

কারণিক সম্পর্ক – causal relation

কার্য – function

কার্য (ক্রিয়া) – action (verb)

কার্য বাঁধক – action tier

কার্যক – operant

কার্যক সাপেক্ষীকরণ – operant conditioning

কার্যমূলক সংজ্ঞা – operational definition

কালিক – temporal

কৃতিসাধক – performative

কৃতিসাধক ক্রিয়া – performative verb

কৃতিসাধক চিহ্নক – performative marker

কৃতিসাধক তত্ত্ব – performative theory

কৃতিসাধন – performance

কৃত্রিম ভাষা – artificial language

কেন্দ্রবিন্দু গ্রন্থি – pivot node

কেন্দ্রীয় এলাকা – pivotal region

কৌশল – technique

কৌশলগত জ্ঞান – technical knowledge

কৌশলগতভাবে – technically

কৌশলের নীতিসূত্র – maxim of manner

ক্রমকালিক – diachronic

ক্রমবিন্যস্ত – ordered

ক্রমিক – gradable

ক্রিয়াবয়ব – aspect

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাসাধক – exercitive

ক্ষেত্রতত্ত্ব – field theory

গঠক – constituent

গঠন – construction

গঠনচিত্র – phrase marker

গভীর বাগর্থবিদ্যা – deep semantics

গভীর বাগর্থিক সংগঠন (প্রকল্প) – deep semantic structure (hypothesis)

গভীর সংগঠন – deep structure

গভীর যোগাযোগ – phatic communion

গতিশীল বাগর্থবিদ্যা – dynamic semantics

গন্তব্য – goal

গুণ – attribute

গুণের নীতিসূত্র – maxim of quality

গ্রন্থি – node

ঘটনা (ক্রিয়া) – event (verb)

ঘটনামূলক – eventive

ঘোষণাকর্ম – declarative

ঘোষতা – voicing

চক্রক – circular

চক্রক স্তরক্রম – cyclic hierarchy

চক্রকতা – circularity

চল – variable

চিত্র – diagram

চিত্রার্থ – pictorial meaning

চিন্তাসাধক – expositive

চিহ্নব্যবহার – notation

চিহ্নব্যবহার প্রচল – notational convention

চৈতন্যবাদ – mentalism

ছেলে – male

জটিল প্রতীক – complex symbol

জানা – knowing

জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলী – kinship terminology

জ্ঞান – cognition

জ্ঞানাত্মক অর্থ – cognitive meaning

জ্ঞানাত্মক বাগর্থাবদ্যা – cognitive semantics

জ্ঞানাত্মক মনোবিজ্ঞান – cognitive psychology

ঝাপসা – fuzzy

ঝাপসা অর্থ – fuzzy meaning

ঝাপসা শ্রেণী – fuzzy category

ঝাপসাভাব – fuzziness

তত্ত্বায়ন – theorisation

তরজমা – version

থেটা-ভূমিকা – theta(θ)-role

দার্শনিক বাগর্থবিদ্যা – philosophical semantics

দৃঢ় ইঙ্গিত – strict implication

দৃষ্টান্ত – token

দৃষ্টান্তপ্রদর্শক সংজ্ঞা – ostensive definition

দৃষ্টান্তস্থানীয় – typical

দ্যোতনা – connotation

দ্যোতনামূলক – onnotative

দ্যোতনামূলক অর্থ – connotative meaning

দ্বিকোটিক – binary

দ্বিবাচক (প্রকাশ) – deictic (expression)

দ্বিস্থানিক বিধেয়ন – two place predication

দ্ব্যর্থক – ambiguous

দ্ব্যর্থকতা – ambiguity

ধনাত্মক বাগর্থিক মূল্য – positive semantical value

ধারণা – concept

ধারণাগত – conceptual

ধারণাগত অঞ্চল – conceptual domain

ধারণাগত নির্ভরশীলতা তত্ত্ব – conceptual dependency theory

Dhaka University Institutional Repository

ধারণাগত সংগঠন প্রকল্প – conceptual structure hypothesis

ধারণামূলক ভূমিকা – notional role

ধ্রুবক – constant

ধ্বনিক সারসত্তা – phonic substance

ধ্বনিতত্ত্ব – phonology

ধ্বনিতাত্ত্বিক – phonological

ধ্বনিবিজ্ঞান – phonetics

ধ্বনিবৈজ্ঞানিক – phonetic

ধ্বনিমূল – phoneme

ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনা – phonemic representation

নাম – name

নামকরণ – naming

নামকরণ তত্ত্ব – naming theory

নালা – channel

নিমিত্ত / করণ কারক – instrumental (case)

নিম্নাক্ষর – subscript

নিরুক্তবিদ্যা, ব্যুৎপত্তি – etymology

নিরপেক্ষ কারক – neutral (case)

নির্দিষ্ট বর্ণনা – definite description

নির্দেশকর্ম – directive

নিয়ন্ত্রক নিয়ম – regulative rule

নিয়ন্ত্রণবাদ – determinism

নীতিসূত্র – maxim

ন্যায় অনুমান – syllogism

ন্যায় অনুমানমূলক – syllogistic

পদ – term

পদার্থমূলক ইঙ্গিত – material implication

পদ্ধতি – method

পরিধি – scope

পরিধি (নেতিবাচকতার/পরিমাপনের) – scope (of negation/quantification)

পরিধি দ্ব্যর্থকতা – scope ambiguity

পরিপূরক – complementary

পরিপূরকতা – complementarity

পরিবাঙ্‌মূলক কর্ম – perlocutionary act

পরিমানের নীতিসূত্র – maxim of quantity

পরিমাপন –quantification

পরিশৃঙ্খলা – schema

পরিশৃঙ্খলিত করা – schematise

পরিস্থিতির প্রসঙ্গ – context of situation

পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম – indirect speech act

পর্যবেক্ষণসম্ভব – observabale

পাণ্ডুলিপি – script

পাণ্ডুলিপি তত্ত্ব – script theory

পারস্পরিক – syntagmatic

পার্শ্বিক – lateral

পুনরাবৃত্তিমূলক – recursive

পুনর্ব্যাখ্যা নিয়ম – reinterpretation rule (RR)

পূর্বধারণা – presupposition

পূর্বধারণা ব্যর্থতা – presupposition failure

পূর্বধারণামূলক – presuppositional

পৌনপুনিকতা – redundancy

পৌনপুনিকতা তত্ত্ব – redundancy theory

প্রকল্প – hypothesis

প্রকার – type

প্রকাশ – expression

প্রকাশকর্ম – expressive

প্রকাশন – reference

প্রকাশনাত্মক – referential

প্রকাশমূলক অর্থ – expressive meaning

প্রকাশমূলক নিয়ম – expressive rule

প্রকাশ্য কৃতিসাধক – explicit performative

প্রক্ষেপন নিয়ম – projection rule

Dhaka University Institutional Repository

প্রগঠন – formulation

প্রগঠন করা – formulate

প্রগণনমূলক বাগর্থবিদ্যা – computational semantics

প্রচল – convention

প্রচলনির্ভর – conventional

প্রচলনির্ভর ইঙ্গিতার্থ – conventional implicature

প্রচলনির্ভর প্রতীক – conventional symbol

প্রজ্ঞা – wisdom

প্রজ্ঞাপন – entailment

প্রজ্ঞাপিত করা – entail

প্রতিক্রিয়া – reaction

প্রতিনাম – antonym

প্রতিনামিতা – antonymy

প্রতিনামীয় – antonymous

প্রতিনিধিত্বকর্ম – representative

প্রতিফলিত অর্থ – reflected meaning

প্রতিবর্ত – reflex

প্রতিবিম্বতা – reflexivity

প্রতিবেদক সংজ্ঞা – reportive definition

প্রতিবেশ – setting

প্রতিমূর্তি – icon

প্রতিরূপক – synecdoche

প্রতিসম – symmetrical

প্রতিসম সম্পর্ক – symmetrical relation

প্রতীক – symbol

প্রতীকবাদ – symbolism

প্রতীকায়িত করা – symbolise

প্রত্যক্ষ বক্তব্যকর্ম – direct speech act

প্রবর্তক সংজ্ঞা – stipulative definition

প্রভাবিত – affected

প্রভাবিত কারক – affective (case)

প্রভেদক – distinguisher

প্রমিত তত্ত্ব – standard theory

প্রযোজক কারক – factitive (case)

প্রয়োগ তত্ত্ব – use theory

প্রয়োগবিদ্যা – pragmatics

প্রয়োগাত্মক – pragmatic

প্রয়োগাত্মক পূর্বধারণা – pragmatic presupposition

প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদ্যা – pragmatic semantics

প্ররোচনামূলক সংজ্ঞা – persuasive definition

প্রসঙ্গ – context

প্রসঙ্গ তত্ত্ব – context theory

প্রস্তুতিমূলক নিয়ম – preparatory rule

প্রাকৃতিক বাগর্থিক অধিভাষা – natural semantic metalanguage

প্রাকৃতিক ভাষা – natural language

প্রান্ত – terminus (termini)

প্রান্তিক গ্রন্থি – terminal node

প্রাপক – recipient

প্রাপ্তবয়স্ক – adult

প্রাসঙ্গিকতার নীতিসূত্র – maxim of relevance

ফলদ – resultant

ফলভোগী (কারক) – benefactive (case)

ফাঁপা প্রতীক – dummy

বংশরেখা – lineality

বক্তব্য ঘটনা – speech event

বক্তব্যকর্ম – speech act

বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব – speech act theory

বক্তব্যকর্ম বাগর্থবিদ্যা – speech act semantics

বক্তব্যপ্রদানকারী – addressor

বক্তব্যশ্রবনকারী – addressee

Dhaka University Institutional Repository

বচন – proposition

বন্ধন – link

বর্ণনামূলক (অর্থ) – descriptive (meaning)

বস্তু – object

বস্তুভাষা – objective (case)

বহিষ্প্রভাবক – external causer

বহির্দ্যোতনা – extension

বহির্ভূক্তিমূলক – exclusive

বাকসাধক– constative

বাক্য – sentence

বাকতত্ত্ব – syntax

বাক্যতত্ত্ববিদ – syntacticist

বাক্যতাত্ত্বিক / বাক্যিক – syntactic

বাক্যতাত্ত্বিক চিহ্নক – syntactic marker

বাক্যার্থ – sentence meaning

বাক্যান্তর – paraphrase

বাক্যিকতাবাদ – syntacticism

বাক্সচিত্র – box diagram

বাগর্থবিদ – semanticist

বাগর্থবিদ্যা – semantics

বাগর্থিক – semantic

বাগর্থিক অঞ্চল – semantic domain

বাগর্থিক অন্তরক – semantic differential

বাগর্থিক আদিম – semantic primitive

বাগর্থিক আপেক্ষিকতা – semantic relativity

বাগর্থিক আলোচনা – semantic study

বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া – semantic procedure

বাগর্থিক ক্ষেত্র – semantic field

বাগর্থিক গণক – semantic calculator

বাগর্থিক চিহ্নক – semantic marker

বাগর্থিক জ্ঞান (তত্ত্ব) – semantic knowledge (theory)

বাগর্থিক পরমাণু – semantic atom

বাগর্থিক পরিবহন (তত্ত্ব) – semantical vehicle (theory)

বাগর্থিক পূর্বধারণা – semantic presupposition

বাগর্থিক প্রকোষ্ঠ – semantic module

বাগর্থিক বাস্তববাদ – semantic realism

বাগর্থিক বিশ্লেষণ – semantic analysis

বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য – semantic feature

বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ – semantic feature analysis

বাগর্থিক ভূমিকা – semantic role

বাগর্থিক মূল্যায়ক – semantic evaluator

বাগর্থিক সংগঠন – semantic structure

বাগর্থিক সার্বজনীন – semantic universal

বাগর্থিক সার্বজনীনতা – semantic universality

বাগর্থিকতাবাদ – semanticism

বাঙমূলক কার্যক – verbal operant

বাঙমূলক কর্ম – locutionary act

বাচনিক বিষয় নিয়ম – propositional content rule

বাচনিক যুক্তিবিদ্যা/কলন – propositional logic / calculus

বাচ্যার্থ – denotation

বাচ্যার্থ তত্ত্ব – denotational theory

বাঁধক – tier

বাণী – message

বাস্তবিক প্রসঙ্গ – actual context

বিখন্ডীভবন – decomposition

বিচ্যুতি – deviation

বিধিনিষেধ – taboo

বিধেয় – predicate

বিধেয় উত্তোলন – predicate raising

Dhaka University Institutional Repository

বিধেয় কলন/যুক্তিবিদ্যা – predicate calculus / logic

বিধেয়ক – predicator

বিধেয়মূলক – predicative

বিপ্রতীপ – converse

বিপরীতক্রিয়ামূলক – counteractive

বিপরীতপ্রান্তিক – antipodal

বিবৃতি – statement

বিমূর্ত – abstract

বিযুক্তি – disjunction

বিরচনামূলক বাগর্থবিদ্যা – compositional semantics

বিরোধপ্রান্তিক – orthogonal

বিরোধাভাস – paradox

বিরোধিতা – opposition

বিশ্বজনীন ব্যাকরণ – universal grammar

বিষয়বস্তু – theme

বিষয়বস্তুগত – thematic

বিষয়বস্তুগত বাঁধক – thematic tier

বিষয়বস্তু গ্রন্থি – theme node

বিষয়মূল – topic

বিসংকেত – assign

বৃক্ষচিত্র – tree diagram

বৃত্তচিত্র – circle diagram

বৃত্তি নির্দেশক কৌশল – function indicating device

বৃত্তিগত বাঁধক – functional tier

বৃত্তিমূলক অভিক্রম – functional approach

বৈজ্ঞানিক / বিজ্ঞানসম্মত – scientific

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা – scientific definition

বৈপরীত্য – oppositeness

বৈশিষ্ট্য – feature

বৈশিষ্ট্যরূপ – stereotype

বোঝা – understanding

ব্যক্তিএকক – individual

ব্যক্তিগতক বিরোধিতা – privative opposition

ব্যক্তিনিষ্ঠ – subjective

ব্যস্তানুপাতিক – inverse

ব্যাকরণিক বাগর্থবিদ্যা – grammatical semantics

ব্যাকরণিক ভূমিকা – grammatical role

ব্যাখ্যক – interpretant

ব্যাখ্যামূলক – interpretive

ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যা – interpretive semantics

ব্যাজোক্তি – irony

ভাব – idea

ভাবনাবাদী তত্ত্ব – ideational theory

ভাববাচকতা – modality

ভাবাবেগ – emotion

ভাষা অনুষদ – language faculty

ভাষা সম্প্রদায় – language community

ভাষাতত্ত্ব / ভাষাবিজ্ঞান – linguistics

ভাষাবিজ্ঞানী – linguist

ভাষিক – linguistic

ভাষিক উদ্ভাবনা – linguistic innovation

ভাষিক প্রসঙ্গ – linguistic context

ভাষিক রক্ষণশীলতা – linguistic conservatism

ভিত্তি – base

ভেদরূপ – variation

ভোক্তা – beneficiary

ভৌত প্রসঙ্গ – physical context

মধ্যবর্তিতা প্রক্রিয়া – mediation process

মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – psychological context

মনোবৃত্তি – disposition

মনোভাষাবিজ্ঞানী – psycholinguist

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য – comment
মহাবক্তব্য কর্ম – macrospeech act
মান – norm
মানব – human
মানসচিত্র – image
মানসচিত্র তত্ত্ব – image theory
মাপনরেখা – scale
মিথক্রিয়া – interaction
মিথক্রিয়ামূলক – interactive
মীড় – pitch
মুদ্রণবিদ্যক – typographical
মূর্ত – concrete
মূলনীতি – principle
মূল্যায়ন – evaluation
মেয়ে – female
মেরুত্ব – polarity
মেরুমূলক – polar
মৌন – tacit
মৌলিক ত্রিভুজ – basic triangle
মৌলিক স্তর – basic level
যথেচ্ছ – arbitrary
যন্ত্রপ্রক্রিয়া – mechanism
যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি – mechanist view
যুক্তি – argument
যুক্তিবিদ্যা – logic
যোগাযোগ – communication
যোগ্যতা – competence
যোজনী – valency
যৌক্তিক ইতিবাচকতাবাদ – logical positivism
যৌক্তিক চালক – logical operator
যৌক্তিক পূর্বধারণা – logical presupposition
যৌক্তিক বাক্যতত্ত্ব – logical syntax
যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যা – logical semantics
যৌগিক পরিবর্তন – composite change
যৌগিক বচন – compound proposition
যৌক্তিক ভাষা – logical language
যৌক্তিক সংযোজক – logical connective
রায়সাধক – verdictive
রূপ – form
রূপক – metaphor
রূপকগত প্রসারণ – metaphorical extension
রূপতত্ত্ব – morphology
রূপধ্বনিমূলীয় রূপান্তর – morphophonemic transformation
রূপমূল – morpheme
রূপমূলগত – morphological
রূপমূলীয় উপস্থাপনা – morphemic representation
রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যা – transformational semantics
রূপায়ন – formalism / formalisation
রূপায়ন করা – formalise
রেখাবদ্ধকরণ – linearisation
রৌপিক – formal
রৌপিক বাগর্থবিদ্যা – formal semantics
রৌপিক ভাষা দর্শন – formal language philosophy
রৌপিকভাবে – formally
লক্ষণার্থ – designation
লিখনতত্ত্ব – orthography
লিপিমূলীয় উপস্থাপনা – graphemic representation
লেখচিত্র – graph
লেখচিত্রীয় সারসত্তা – graphic substance
শঙ্করশব্দ – hybrid

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ – lexeme/word

শব্দকোষ – lexicon

শব্দগত প্রসঙ্গ – verbal context

শব্দগুচ্ছ সংগঠন – phrase structure

শব্দতত্ত্ব – lexicology

শব্দভান্ডার – vocabulary

শব্দার্থ – word meaning

শাখাবিভক্তি (নিয়ম) – branching (rule)

শাব্দরূপমূলীয় রূপান্তর – lexomorphemic transformation

শাব্দলিপিমূলীয় রূপান্তর – lexographemic transformation

শাব্দিক উপকরণ – lexical item

শাব্দিক উপস্থাপনা – lexemic representation

শাব্দিক ক্ষেত্র – lexical field

শাব্দিক পাঠ – lexical reading

শাব্দিক প্রবিষ্টকরণ – lexical insertion

শাব্দিক বাগর্থবিদ্যা – lexical semantics

শৃঙ্খলা – discipline

শৈলি – style

শৈলিগত – stylistic

শ্রেণী – category

শ্রেণীপ্রতীক – category symbol

শ্রেণীবিন্যাস – taxonomy

শ্রেণীমূলক উপউপাদান – categorial subcomponent

সংকেত – sign

সংকেত সংগঠন (তত্ত্ব) – sign structure (theory)

সংকেতক – signifier/significant

সংকেতনা – signal

সংকেতবদ্ধ করা – encode

সংকেতবিজ্ঞান – semiotics / semiology

সংকেতযান – sign vehicle

সংকেতরূপ – code

সংকেতায়ন ত্রিভূজ – triangle of signification

সংকেতিত – signified/signifie

সংকোচন – narrowing

সংগঠন – structure

সংগঠনবাদ – structuralism

সংঘটক নিয়ম – constitutive rule

সংজ্ঞা – definition

সংযুক্তি – conjunction

সংশ্রয় – system

সকর্মক ক্রিয়া – transitive verb

সঙ্গতিবিধি – selectional(al) restriction

সঞ্চারমূলক সম্পর্ক – transitive relation

সঞ্জননবাদ – generativism

সঞ্জননী – generative

সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা – generative semantics

সত্যমূল্য – truth value

সত্যমূল্য ব্যবধান – truth value gap

সত্যশর্ত – truth condition

সত্যশর্তমূলক – truth contitional

সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যা – truth conditional semantics

সত্যসারণী – truth table

সন্তোষমূলক – satisfactive

সন্দর্ভ – discourse

সন্দর্ভতত্ত্ব – textcourse

সমকালিক – synchronic

সমগ্রনাম – holonym

সমতা সম্পর্ক – congruence relation

সমতুল্যতা – equivalence

Dhaka University Institutional Repository

সমনাম – homonym

সমনামিতা – homonymy

সমনামীয় – homonymous

সমবর্তী হওয়া – coincide

সময়ের স্থানীকরণ – spatialisation of time

সমরূপ আরোপন – substitution of equivalents

সমানাধিকারক – equipollent

সমানাধিকারক বিরোধিতা – equipollent opposition

সম্পর্কমূলক উপাদান – relational component

সম্পূর্ণ সহনামিতা – complete synonymy

সম্প্রদান কারক – dative (case)

সম্প্রসারণ – widening

সম্বন্ধপদ – possessive

সম্বোধনমূলক – vocative

সম্ভাব্য পৃথিবী বাগর্থবিদ্যা – possible world semantics

সম্ভাব্য প্রসঙ্গ – possible context

সরল বচন – simple proposition

সরলোক্তি – litotes

সহঅংশনাম – comeronym

সহউপনাম – cohyponym

সহগ – coordinate

সহনাম – synonym

সহনামিতা – synonymy

সহনামীয় – synonymous

সহযোগিতা নীতি – cooperative principle

সহাবস্থান – collocation

সহাবস্থানিক – collocative

সাংকেতিক – semiotic

সাংকেতিক ত্রিভুজ – semiotic triangle

সাংগঠনিক – structural

সাংশ্লেতনিক – synaesthetic

সাধারণ ভাষা দর্শন – ordinary language philosophy

সাধারণীকৃত গঠনচিত্র – generalised phrase marker

সাধিত্র – instrument

সাপেক্ষীকরণ – conditioning

সামগ্রিক সহনামিতা – total synonymy

সামীপ্য – contiguity

সাযুজ্য – similarity

সাড়া – response

সারসত্তা – substance

সারাত্মক – substantial

সার্বজনীন – universal

সার্বজনীন দৃষ্টান্তীকরণ – universal instantiation

সার্বজনীন পরিমাপক – universal quantifier

সার্বজনীন প্রতীক – universal symbol

সুখশর্ত – felicity condition

সুভাষণ – enphemism

সূচক – index

সৃজনশীলতা – creativity

সেট – set

সেটতত্ত্ব – set theory

স্তর – level

স্তরক্রম – hierarchy

স্তরক্রমিক – hierarchical

স্তরীভবনগত অর্থ – stratificational meaning

স্থান / স্থানবাচক / স্থানিক – locative

স্থানবাচক অর্থ – locative meaning

স্থানান্তর – transfer

স্থানিকতাবাদ – localism

স্থানিকতাবাদী প্রকল্প – localist hypothesis

Dhaka University Institutional Repository

স্পর্শদোষ – contamination

স্বকীয় নাম – proper name

স্বতঃসিদ্ধ – axiom

স্বত্বমূলক সম্পর্ক – possessional relation

স্ববিরোধ – contradiction

স্ববিরোধী – contradictory

স্বরভঙ্গি – intonation

স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য – distinctive feature

স্বীকার্য – postulate

Dhaka University Institutional Repository

♥সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
বাগর্থবিদ্যা কি ?	১
অর্থের অর্থ	৩
অর্থ ও নির্দেশন	৮
সংজ্ঞা, বাচ্যার্থ, দ্যোতনা, লক্ষণার্থ, বহির্দ্যোতনা, অন্তর্দ্যোতনা, নাম	১০
প্রয়োগ ও উল্লেখ	১৭
প্রকার ও দৃষ্টান্ত	১৭
শব্দার্থ ও বাক্যার্থ	১৮
বাক্য, বচন ও উক্তি	২০
নিরক্তবিদ্যা, শব্দতত্ত্ব ও অভিধানবিদ্যা	২৩
ভাষাবিজ্ঞান ও বাগর্থবিদ্যা	২৫
সংকেতবিজ্ঞান ও বাগর্থবিদ্যা	২৭
আধুনিক বাগর্থবিদ্যা এবং তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি প্রসঙ্গ	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যা	৩৪
শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা	৩৪
শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ	৩৭
শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া	৪১

তৃতীয় অধ্যায়

সাংগঠনিক বাগর্থবিদ্যা	৪৮
ঔপাদানিক বিশ্লেষণ	৪৮
বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ	৫০
বিয়ারভিশের তত্ত্ব	৫২
বাগর্থিক ক্ষেত্র	৫৫
ট্রিয়ায়ের তত্ত্ব	৬১
মাতোরের তত্ত্ব	৬২
আচরণবাদী তত্ত্ব	৬৪
অর্থ সম্পর্কসমূহ	৭০
সহনামিতা	৭০

♥ এখানে পৃষ্ঠানম্বর বাংলায় হলেও ভিতরে পৃষ্ঠানম্বর ইংরেজীতে দেয়া হয়েছে কম্পিউটারে বাংলা ইন্টারফেসে সমস্যার কারণে । এজন্য লেখক দুঃখিত ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনামিতা ৭২
উপনামিতা ৭৫
অংশনামিতা ৭৬
বাগর্থিক ভূমিকা ৭৯
স্থানিকতাবাদ ৮৫

চতুর্থ অধ্যায়

যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যা ৮৯
নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব ৮৯
বিধেয় কলন ৯১
বাচনিক যুক্তিবিদ্যা ৯৮
অর্থ স্বীকার্য ১০৪
সত্যশর্ত ১০৮
বাগর্থিক পরিবহন তত্ত্ব ১১১
বাগর্থিক জ্ঞান তত্ত্ব ১১২

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যা ১১৮
মানসচিত্র তত্ত্ব ১১৮
আদর্শরূপ তত্ত্ব ১২০
বাগর্থিক অন্তরক ১২৪
বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া ১২৬
পান্ডুলিপি তত্ত্ব ১২৭
ধারণাগত সংগঠন প্রকল্প ১৩০
বাগর্থিক আপেক্ষিকতা বনাম বাগর্থিক সার্বজনীনতা ১৩২
সংকেত সংগঠন তত্ত্ব ১৩৫
অস্পষ্টতা ১৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যা ১৪৩
রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যার পটভূমি ১৪৩
ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যা ১৪৪
ক্যাট্জ ও ফোডরের তত্ত্ব ১৪৪
ভাইনরাইখের তত্ত্ব ১৫২
সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা ১৫৫
ম্যাকলের তত্ত্ব ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ল্যাকফ, রস ও অন্যান্য ১৫৭
হাচিন্‌সের মডেল ১৬১
লীচের প্রস্তাবনা ১৬৪

সপ্তম অধ্যায়

প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদ্যা ১৭০
প্রয়োগ তত্ত্ব ১৭০
প্রসঙ্গ তত্ত্ব ১৭২
কৃতিসাধক তত্ত্ব ১৭৬
বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব ১৭৯
ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব ১৮৬
পূর্বধারণা ও প্রজ্ঞাপন ১৯১

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার ১৯৬
তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন ১৯৬
বাগর্থবিদ্যার অতিসাম্প্রতিক অবস্থা ২০০
শেষকথা ২০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ।।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকৃত রঘুবংশের এ ছত্রদ্বয়ের অনুবাদ করেছেন এভাবে ঃ

বাক্য আর অর্থ সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে
বাগর্থসিদ্ধির তরে বন্দনা করিনু নতশিরে ।।

ভাষা ও অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে প্রাচীন কবি আরাধ্য শিবপার্বতীর যুগল মূর্তিকে বাগর্থের সাথে তুলনা করেছিলেন । বস্তুতঃ বাক ও অর্থের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যামান । অর্থ ছাড়া বাক্ নিষ্প্রাণ ও বাক্ ছাড়া অর্থ অস্তিত্বহীন । এ যেন দেহ-আত্মা সম্পর্ক । বাক্ ও অর্থের সম্পর্ক নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণ চিন্তিত হয়েছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন তাদের স্ফোটবাদী তত্ত্ব, যা আজও গভীর গবেষণার বিষয় (দ্রষ্টব্য ঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৭৭ ঃ ৩৫-৪০) । **স্ফোটবাদ** অনুসারে অর্থ অথবা পরমার্থ শব্দের মাধ্যমে পরিস্ফুট বা অভিব্যক্ত হয় যেমনভাবে সূর্য তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে আলোকরশ্মির মাধ্যমে । যাহোক, প্রাচীন ভারতে বাগর্থের যে চর্চা শুরু হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারেনি, তা রূপ নিয়েছে অধিবিদ্যায় । ভাষা ও অর্থের সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার প্রয়াস সাম্প্রতিক কালের ঘটনা । আমরা এখন যাকে বাগর্থবিদ্যা বলছি তা নিতান্তই আধুনিক অর্থে । নীচে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করবো ।

ভূমিকা অধ্যায়ে আমরা বাগর্থবিদ্যা সম্পর্কে একটি পরিচিতিমূলক সাধারণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো । এখানে বাগর্থবিদ্যা সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাবলী আলোচিত হবে । আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো বাগর্থবিদ্যা কি, অর্থের বৈচিত্র্য, অর্থ আলোচনার সমস্যাবলী, অন্যান্য শৃঙ্খলার সাথে এর সম্পর্ক ইত্যাদি ।

বাগর্থবিদ্যা কি?

বাগর্থবিদ্যা ভাষার অর্থসংক্রান্ত আলোচনা । জ্ঞানের যে শাখায় পদ্ধতিগতভাবে অর্থের পুঙ্খনাপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বাগর্থবিদ্যা বলে । লক্ষ্যণীয়, এখানে বলা হয়েছে *জ্ঞানের যে শাখা* কিন্তু পরিস্কার করে বলা হয়নি কোন্ শাখা । বস্তুতঃ বাগর্থবিদ্যা কি দর্শন, ভাষাতত্ত্ব না মনোবিজ্ঞানের শাখা তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে । তদুপরি বাগর্থবিদ্যার উপর যুক্তিশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, গণিত, তথ্যবিজ্ঞান, কম্পিউটারবিজ্ঞান এদের দাবিও নেহায়েত কম নয় । অর্থ বিশ্লেষণের জটিলতার একটি বড় কারণ হলো এর বহু শৃঙ্খলাগত চরিত্র – অনেক শৃঙ্খলার জ্ঞান এসে বাগর্থবিদ্যায় মিলিত হয়েছে । বাগর্থবিদ্যার সাথে অন্যান্য শৃঙ্খলার সম্পর্ক পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

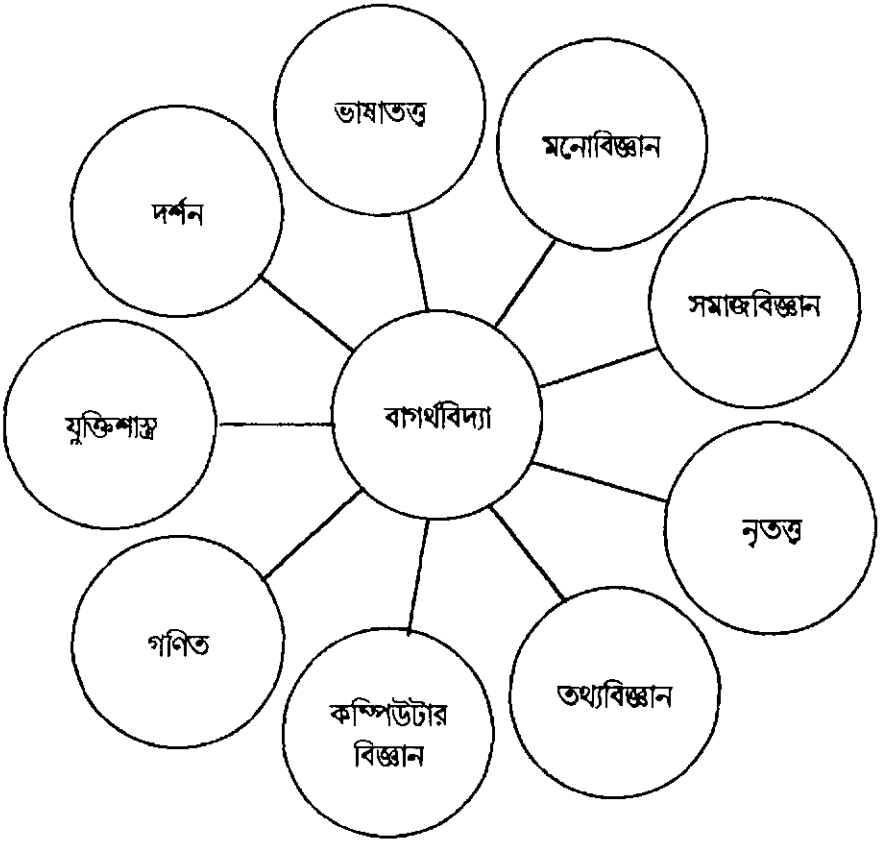

বাগর্থবিদ্যার সাথে অন্যান্য শৃঙ্খলার সম্পর্ক

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থের স্বরূপ সন্ধান করা যেতে পারে এবং তার কোনটিই অন্যগুলির তুলনায় কম বৈধ নয় । তবে আমাদের বিবেচনায় বাগর্থবিদ্যা ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা এবং সেজন্য অর্থকে ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করা উচিত । বাগর্থবিদ্যা (বাক+অর্থ+বিদ্যা) -এর জন্য অন্য পরিভাষাও রয়েছে, যেমন নিরুক্তবিদ্যা, শব্দার্থবিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব, অর্থবিজ্ঞান, বাগর্থতত্ত্ব ইত্যাদি । তবে পারিভাষিক গাম্ভীর্য, শ্রুতিমধুরতা, অদ্ব্যর্থকতা ও ঐতিহ্য বিবেচনায় বাগর্থবিদ্যা শব্দটিকে আমাদের কাছে অন্যান্যগুলির তুলনায় অধিক শক্তিমান মনে হয়েছে । তাই আলোচ্য শাস্ত্রকে এ নামে অভিহিত করার প্রচেষ্টা গৃহীত হতে পারে । বাগর্থবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ **Semantics** এবং এরও রয়েছে বিভিন্ন নাম, যেমন - Semiotics, Semiology, Semalogy, Sematology, Semasiology, Rhematology ইত্যাদি । তবে Semantics শব্দটিই অধিক প্রচলিত এবং শাস্ত্রটির নাম হিসাবে সাধারণভাবে গৃহীত । Semantics শব্দটি এসেছে গ্রীক বিশেষ্য Sema (চিহ্ন) এবং গ্রীক ক্রিয়া Semaino (চিহ্নিত করা) থেকে । তাই ব্যুৎপত্তিগতভাবে Semantics এর মানে হলো চিহ্নশাস্ত্র । কিন্তু বর্তমানে the study of meaning বা the science of meaning অর্থে Semantics এর ব্যবহার সর্বজনগ্রাহ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থের অর্থ

অর্থ অর্থ করো কেন অর্থে কেবল বাঁধন হয়
সেই পরমের অর্থ খোঁজো যেই অর্থে সাধন হয় ।

মরমি কবির এ কথাগুলো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হলেও এতে অর্থের বহুরূপী চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । বাংলা ভাষায় *অর্থ* শব্দটি অনেকার্থক । বাগর্থিক তত্ত্বালোচনা করতে গেলে অর্থের নানাবিধ অর্থ সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং এর কোন্ অর্থটি প্রাসঙ্গিক ও কোন্‌টি অপ্রাসঙ্গিক সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন । যখন আমরা বলি *অর্থ কি* তখন আমাদের বুঝতে হবে আমরা কোন্ অর্থের কথা বলছি, নতুবা অনর্থ সৃষ্টি হবে । আমি যদি একজনকে *অর্থবই* আনতে বলি আর সে ব্যাংকের চেকবই নিয়ে আসে তাহলে তার কোন ভুল না থাকা সত্ত্বেও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে । রমাপ্রসাদ দাস (১৯৯৫ ঃ ৩৩-৩৭) অর্থের পনেরো রকম অর্থের কথা বলেছেন । এগুলো নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. অর্থ = জ্ঞাপক হেতু । উদাহরণ ঃ ওখানে ধোঁয়া আছে – একথার অর্থ ওখানে আগুন আছে ।
২. অর্থ = কারক হেতু বা কারণ । উদাহরণ ঃ হঠাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অর্থ কি ?
৩. অর্থ = কার্য । উদাহরণ ঃ এখন যুদ্ধ বাঁধার অর্থ হল বিশ্বধ্বংস ।
৪. অর্থ = তাৎপর্য । উদাহরণ ঃ জীবনের অর্থ কি ?
৫. অর্থ = প্রসক্তি । উদাহরণ ঃ বেঁচে থাকার অর্থই হল কেবল দুঃখ ভোগ করা ।
৬. অর্থ = অভিপ্রায় । উদাহরণ ঃ তুমি এ কাজ করবে বললে - একথার অর্থ কি ?
৭. অর্থ = উদ্দেশ্য । উদাহরণ ঃ এতে কি তোমার অর্থসিদ্ধি হবে ?
৮. অর্থ = ব্যাখ্যা । উদাহরণ ঃ তোমার এরূপ আচরণের অর্থ কি ?
৯. অর্থ = মানে (আক্ষরিক) । উদাহরণ ঃ *প্রভাকর* অর্থ সূর্য ।
১০. অর্থ = জ্ঞেয় বস্তু । উদাহরণ ঃ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান হয় তার নাম প্রত্যক্ষ ।
১১. অর্থ = সত্য । উদাহরণ ঃ তুমি যথার্থ বলেছ হে ।
১২. অর্থ = বিষয় । উদাহরণ ঃ ঈশ্বর জগন্নাথ, তার হাতে সর্ব অর্থ ।
১৩. অর্থ = ধন বা বিত্ত । উদাহরণ ঃ প্রজার অর্থ রাজায় কাড়ে ।
১৪. অর্থ = টাকা বা মুদ্রা । উদাহরণ ঃ এ বাড়িটি নির্মানে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন ।
১৫. অর্থ = আকাঙ্খা । উদাহরণ ঃ আমি তোমার শুভার্থী ।

ইংরেজীতে mean ও meaning-এর রয়েছে নানা অর্থ । বিশেষণ হিসাবে mean এর রয়েছে মোটামুটি সাতটি, ক্রিয়াপদ হিসাবে চারটি ও বিশেষ্যপদ হিসাবে দুটি অর্থ • । যথা ঃ

1. He is very mean with his money. (ungenerous)
2. Don't be so mean to her. (unkind)
3. That's a mean dog; be careful it doesn't bite you. (bad tempered)

• সূত্র : *Longman Dictionary of Contemporary English*. New Edition, 1987.

Dhaka University Institutional Repository

4. He is a man of mean birth. (of low social position)
5. I don't like to drive through those mean streets. (poor-looking)
6. She makes a mean chicken stew. (*in American slang*. very good)
7. Running ten miles is no mean labour. (insignificant)
8. What does this French word mean? (to represent / express)
9. I mean to go tomorrow. (to intend)
10. Missing the train means waiting. (to be a sign of)
11. Her work means a lot to her. (to be of importance to the stated degree)
12. You're meant to take your shoes off when you enter a temple. (to have to)
13. The mean of 7, 9 and 14 is 10. (average)
14. It's a question of finding the mean between too lenient treatment and too severe punishment (a way of behaviour in the middle position)

আবার বিশেষ্যপদ হিসাবে meaning এর রয়েছে তিনটি এবং বিশেষণপদ হিসাবে একটি অর্থ । যথা ঃ

1. One word can have several meanings. (that which one is intended to understand)
2. I can't quite grasp the meaning of these figures. (importance or value)
3. He wore a look full of meaning. (a hidden aim or intention)
4. Your meaning book puzzles me. (giving an affect of important thought)

কাজেই বহুঅর্থকতার কারণে অর্থ, mean বা meaning অনেক ভুলবোঝাবুঝির উৎস হতে পারে । স্পষ্টতঃই অর্থের সব অর্থ বা meaning এর সব meaning বাগর্থবিদের কাছে আগ্রহের বিষয় হবে না । কেবল ভাষা সম্পৃক্ত অর্থ বা meaning -ই তাকে আগ্রহী করে তুলবে । এই ভাষাসম্পৃক্ত অর্থ নিয়ে সি. কে. অগডেন ও আই. এ. রিচার্ড্স একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন এবং ১৯২৩ সালে তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন The Meaning of Meaning নামক পুস্তকে । তারা কম করে হলেও অর্থের ষোলটি অর্থ লিপিবদ্ধ করেন । তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

a. an intrinsic property
b. a unique unanalysable relation to other thing
c. the other words annexed to a word in the dictionary
d. the connotation of a word
e. an event intended
f. emotion aroused by anything
g. that to which the user of a symbol actually refers
h. that to which the interpreter of a symbol refers

Dhaka University Institutional Repository

চার্ল্‌স সি. ফ্রাইজ (১৯৭১ ঃ১০৪-১০৫) অগডেন ও রিচার্ডসের মতো অনুরূপ এক গবেষণায় অর্থের এগারটি অর্থ উদঘাটন করেন। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

1. the denotation of a name
2. the connotation of a symbol
3. the implication of a concept
4. the neuro-muscular and grandular reaction produced by anything
5. the place of anything in a system
6. the practical consequence of anything
7. the usefulness of anything
8. that to which the interpreter of a symbol does refer
9. that to which the interpreter of a symbol ought to be referring
10. that to which the user of a symbol wants the interpreter to infer
11. any object of consciousness whatever

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অর্থের এ অর্থগুলো এসেছে বিভিন্ন তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির নির্যাসরূপে। বিভিন্ন তাত্ত্বিক তাদের তত্ত্বগত প্রয়োজনে অর্থকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। জেফ্রি লীচ (১৯৮১ ঃ ৯-২৩) অর্থের সাতটি শ্রেণী নির্ধারণ করেন এবং বলেন যে ভাষা সম্পৃক্ত যে কোন অর্থ এর একটিতে পড়বে। লীচের সপ্তপ্রকার নিম্নরূপ ঃ

(ক) **ধারণাগত অর্থ** ঃ ধারণাগত অর্থ ভাষার কেন্দ্রীয় অর্থ যাকে ঘিরে ভাষিক যোগাযোগ আবর্তিত হয়। এটি ভাষার যৌক্তিক, জ্ঞানীয় বা বাচ্যিক উপাদান যা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও গণস্বীকৃত। ধারণাগত অর্থের রয়েছে নিজস্ব সংগঠন যার ফলে একে বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতরে এনে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। যেমন, *নারী* শব্দের ধারণাগত অর্থ হতে পারে *প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে মানুষ*।

(খ) **দ্যোতিত অর্থ** ঃ ধারণাগত অর্থের বাইরে ভাষার মাধ্যমে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশিত হয় ভাব-ইঙ্গিত রূপে তাকে দ্যোতিত অর্থ বলা হয়। দ্যোতিত অর্থ স্থান ও পাত্র সাপেক্ষ, যার ফলে তার একরূপতা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। যেমন চীনে *সমাজতন্ত্র* শব্দটি যেভাবে বিবেচিত ও মূল্যায়িত হবে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেভাবে হবে না। একজন কৃষকের *রাজনীতির* ধারণা ব্যবসায়ী কিংবা মামলার রাজনৈতিক ধারণা থেকে ভিন্ন। *বিবাহ* শব্দটি উচ্চারণ করলে একেক জনের একেক রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে বিবাহিতের কাছে একরকম, অবিবাহিতের কাছে আরেক রকম; পুরুষের কাছে একরকম, যুবকের কাছে এক রকম এবং বৃদ্ধের কাছে আরেক রকম। কারো কাছে বিবাহ পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন, কারো কাছে এটি অবাধ যৌনতার সামাজিক স্বীকৃতি, কারো কাছে একটি ছেলে একটি মেয়ের স্বপ্ন, কারো কাছে সংসারের অনাকাঙ্ক্ষিত নিগড়, আবার কারো কাছে আবেগের পাখায় ভর করে মুক্ত আকাশে বিচরণ। ধারণাগত ও দ্যোতিত – ভাষার উভয় অর্থই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধারণাগত অর্থ বহির্মুখী, আর দ্যোতিত অর্থ অন্তর্মুখী; একটি যদি হয় প্রবাহমান নদী অন্যটি অন্তঃসলীলার ফল্গুধারা। ধারণাগত অর্থ যেন পাড়াবেড়ানো দুষ্ট ছেলেটি যাকে সবসময় দেখা যায় আর দ্যোতিত অর্থ যেন গাঁয়ের শান্তসুবোধ অন্তপুরবাসিনী লাজুক মেয়েটি যাকে কদাচিৎ দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সামাজিক অর্থ ঃ যে কোন ভাষিক যোগাযোগ কোন না কোন সামাজিক পরিস্থিতির ভিতর সংঘটিত হয় । ভাষার যে অর্থ সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিতবহ তাকে সামাজিক অর্থ বলে । শৈলির বিভিন্ন মাত্রা ও স্তরে সামাজিক অর্থ উপস্থাপিত হয় । এজন্য একে আমরা **শৈলিগত অর্থ**ও বলতে পারি । যেমন কারো কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ থেকে আমরা বুঝতে পারি সে কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে, সে কোন সামাজিক স্তর বা পেশার লোক । শৈলীগত অর্থের মধ্যে সামাজিক স্তরের ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আমরা বাংলা ভাষায় *আপনি, তুমি* ও তুই -এর পার্থক্যের কথা উল্লেখ করতে পারি; *আপনি* সম্মানার্থে, তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্যে ও *তুমি* সমমর্যাদায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । ডঃ রাজীব হুমায়ুনের মতে, বাংলা সর্বনামের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে নিহিত আছে বাঙালী সমাজের স্তরীভবনের পরিচয় । তিনি দেখেয়েছেন *আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা* ব্যবহৃত হয় ধনী (এবং বয়স্ক) প্রসঙ্গে, *তুমি, তোমরা* ব্যবহৃত হয় মধ্যবিত্ত (এবং সমবয়সী) প্রসঙ্গে এবং তুই, *তোরা, সে, তারা* ব্যবহৃত হয় নিম্নবিত্ত (এবং কমবয়সী প্রসঙ্গে) । তিনি বলেন, ''সর্বনামের এ ব্যবহার থেকে বেঝা যায়, সমাজে কমপক্ষে তিনটি শ্রেণী আছে এবং এতগুলো সর্বনাম থাকার মূলে সমাজের শ্রেণীবিভক্তি ।''(হুমায়ুন ঃ ১৯৯৩ ঃ ৩২) আমরা এই বিশেষ সামাজিক অর্থের নাম দিতে পারি **স্তরীভবনগত অর্থ** ।

(গ) আনুভূতিক অর্থ ঃ ভাষার মাধ্যমে বক্তার অনুভূতি এবং শ্রোতা ও বক্তব্য বিষয়ের প্রতি তার মনোবাব প্রাকাশিত হতে পারে । এ ধরনের অর্থকে বলা হয় আনুভূতিক অর্থ । আনুভূতিক অর্থের কোন স্বাধীন সত্তা নেই । এটি নির্ভর করে ধারণাগত বা দ্যোতিত অর্থের উপর । বক্তার বাচনভঙ্গি বা স্বরভঙ্গি থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে বক্তার অনুভূতির ধরন । কোন পথিক যখন পুলিশকে দেখে বলে *ঠোলা* তখন বোঝা যায় সে তার প্রতি বিদ্রূপ করছে । কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে *মাগি* তখন তাতে ক্রোধ ঝরে পড়ে । যখন কাউকে *দেবতার* সাথে তুলনা করা হয়ে তখন তার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হয় ।

(ঙ) প্রতিফলিত অর্থ ঃ ভাষা যখন একটি বিশেষ তাৎপর্যকে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ কোন শব্দের প্রতি মানুষ যখন এমন মনোভাব পোষণ করে যা অন্য শব্দ থেকে প্রাপ্ত তখন তাকে প্রতিফলিত অর্থ বলে । প্রতিফলিত অর্থ ভাষার একটি গৌণার্থ এবং এটি নির্ভর করে ধারণাগত অর্থের বিচ্যুতির উপর । শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম রয়েছে বলে হিন্দুরা এবং আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম বয়েছে বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে । এরকম একেকটি নামে একেক গুণের প্রতীক । যেমন আল্লাহর একটি নাম *রাজ্জাক* (যিনি রিজিক বা আহার দান করেন) । এখন এই নামটি উচ্চারণ করলে কারো মনে যদি নায়ক রাজ্জাকের অভিনয়ের চিত্র ভেসে উঠে তাহলে এটিই হবে ঐ শব্দের প্রতিফলিত অর্থ । *তরণী* শব্দের সাধারণ অর্থ *নৌকা* । কিন্তু যদি এই শব্দটি শুনে কেউ ভবনদী পারাপারের কথা চিন্তা করে তবে বলতে হবে শব্দটিতে প্রচলিত আটপোরে অর্থের বদলে আধ্যাত্মিক অর্থ প্রতিফলিত হয়েছে । কাজী নজরুল ইসলামের খেয়াপারের তরণী থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর,
কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারিগান – লা শরীক আল্লাহ্ ।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) **সহাবস্থানিক অর্থ** ঃ ভাষার কোন কোন শব্দের মধ্যে বিশেষ বিশেষ শব্দের সাথে যুথবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । এ ধরনের প্রবণতা থেকে সৃষ্টি হয় সহাবস্থানিক অর্থ । সহাবস্থানিক অর্থ নিতান্তই শব্দের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য । বাংলায় *ভুঁইফোঁড়* (যা ভুই ফুঁড়ে ওঠে) শব্দটি *বজ্জাত* শব্দের এবং *হাতুড়ে* (যে হাতড়ায়) শব্দটি *ডাক্তার* শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সহাবস্থানগত কারণে তাদের মূলগত অর্থ লোপ পেয়ে ভিন্নরকম অর্থ দাঁড়িয়েছে । এখন *ভুইফোঁড়* বললেই হঠাৎ ধণীদের বোঝায় এবং *হাতুড়ে* বললেই অশিক্ষিত চিকিৎসক বুঝায় । সব শব্দ সব শব্দের সাথে সহাবস্থান করে না । যেমন, Colourless green ideas sleep furiously -এ বাক্যটি সহাবস্থানিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে অসমঞ্জস বলে বিবেচিত হবে । green -এর সাথে grass সহাবস্থান করতে পারে, কিন্তু idea নয় এবং colourless এর সাথে liquid সহাবস্থান করতে পারে, কিন্তু idea নয় । তদুপরি যা colourless তা green হতে পারে না অথবা যা green তা colourless হতে পারে না । একইভাবে sleep এর সাথে furiously-ও বেমানান (Stock & Widdowson 1974:122)।

(ছ) **বিষয়বস্তুগত অর্থ** ঃ ভাষাব্যবহারকারীরা তাদের বক্তব্য বিষয়কে বিশেষভাবে বিন্যাস করেন ও বিশেষ জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন বা জোর দেন । এরকম অর্থকে বলে বিষয়বস্তুগত অর্থ । বিষয়বস্তুগত অর্থ সাধারণত একই বাক্যের বিভিন্নরকম ব্যাকরণগত গঠনের ব্যাপার । যেমন ঃ

মাস্তানরা পিটিয়েছে *মিঠুকে* ।
মিঠুকে পিটিয়েছে *মাস্তানরা* ।
মাস্তানরা মিঠুকে *পিটিয়েছে* ।

প্রায় একইরকম মনে হলেও উপরের বাক্য তিনটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে । প্রথমটি জোর দেয় কাকে পিটিয়েছে তার উপর, দ্বিতীয়টি জোর দেয় কারা পিটিয়েছে তার উপর এবং তৃতীয়টি জোর দেয় কি করেছে তার উপর ।

লীচ দ্যোতিত, সামাজিক, আনুভূতিক, প্রতিফলিত ও সহাবস্থানিক এই পাঁচ রকমের অর্থকে একত্রে বলেছেন **আনুষঙ্গিক অর্থ** কারণ এগুলোর সবই কোন না কোনভাবে মন বা চিন্তার অনুষঙ্গগুণে প্রাপ্ত । লীচ আরো দু'ধরনের অর্থের কথা বলেছেন, যথা - **অভিপ্রেত** ও **ব্যাখ্যাত অর্থ** । বক্তার মনে যে অর্থ থাকে তাকে অভিপ্রেত অর্থ এবং শ্রোতা সেটি যেভাবে উপলব্ধি করেন তাকে ব্যাখ্যাত অর্থ বলে । মজার ব্যাপার হলো অভিপ্রেত ও ব্যাখ্যাত অর্থ একই বাণীর দ্বৈত প্রকাশ হলেও তারা প্রায়ই সমাপতিত হয় না ।

উইডোসন (১৯৯০) এবং লুইস (১৯৯৩) -এর মতে, ভাষার অর্থ আবিস্কৃত হয় বক্তা ও শ্রোতার জ্ঞানের মিথক্রিয়ার ফলে । বক্তা যা বলেন শ্রোতা একটি নির্দিষ্ট ভাষিক ও পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে তার অর্থ উদ্ধার করেন । তারা এ ধরনের অর্থের নাম দেন **আলাপিত অর্থ** । প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদদের জন্য এই আলাপিত অর্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

এবার কিছুটা আঁচ করা যায় অর্থ বিষয়টি কত গভীর, ব্যাপক ও জটিল । কাজেই *অর্থ কি?* আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সহজ প্রশ্ন মনে হলেও আদতে এটি জগতের সবচেয়ে জটিল প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি । এর উত্তরের সন্ধানও তাই জগতের কঠিনতম বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোর মধ্যে একটি । দার্শনিক, ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, যুক্তিবিদ, সমাজবিজ্ঞনী, নৃতত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ, তথ্যবিজ্ঞানী ও কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের অজস্র তত্ত্বালোচনার পরও অর্থের স্বরূপ পুরোপুরি আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি । শেষ পর্যন্ত মনে হয় অর্থ বুঝি সেই মরমি কবির পরমার্থের

Dhaka University Institutional Repository

মতো অধরা থেকে যাবে – যাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যায় ।

অর্থ ও নির্দেশন

অর্থ ও নির্দেশনের পার্থক্যটি বাগর্থবিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরা দুটি ভিন্ন সমস্যার ইঙ্গিত দেয় । যখন আমরা অর্থের কথা বলি তখন আমরা ভাষার আভ্যন্তরীণ সম্পর্কসমূহের কথা বলি ; কিন্তু যখন আমরা নির্দেশনের কথা বলি তখন আমরা বলি ভাষার সাথে বাইরের জগতের সম্পর্কের কথা । অর্থ ও প্রকাশনকে আমরা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করতে পারি (Hurford & Heasley 1983 অনুসরণে) ঃ

অর্থ ঃ কোন ভাষায় বাগর্থিক সম্পর্কসমূহের সংশ্রয়ে একটি শব্দের যে স্থান তাকে অর্থ বলে ।[●]

নির্দেশন ঃ যে প্রক্রিয়ায় একজন বক্তা কোন শব্দের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে নির্দেশন বলে ।[●]

কাজেই অর্থ হল ভাষিক উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আর নির্দেশন হল ভাষিক উপাদানের সাথে অভাষিক উপাদানের সম্পর্ক । অর্থ যেখানে ভাষার আভ্যন্তরীণ ভুবনে সীমাবদ্ধ থাকে, নির্দেশন সেখানে ভাষাকে অতিক্রম করে চলে যায় বহির্ভুবনে । এজন্য অর্থ আকর্ষণ করেছে বিশেষভাবে ভাষাবিজ্ঞানীদের এবং নির্দেশন আকর্ষণ করেছে বিশেষভাবে দার্শনিকদের এবং বাগর্থবিদ্যায় এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে দুটি বিশাল অভিক্রমের, যার একদিকে রয়েছে *ভাষাবৈজ্ঞানিক বাগর্থবিদ্যা* অন্যদিকে *দার্শনিক বাগর্থবিদ্যা* । বাগর্থবিদ্যার কাজ একদিকে জাগতিক বাস্তবতার নিরিখে ভাষাবিশ্লেষণ অন্যদিকে অর্থ সম্পর্কসমূহের ভিত্তিতে ভাষার ব্যাখ্যা । উদাহরণের সাহায্যে অর্থ ও নির্দেশনকে ব্যাখ্যা করা যায় । বাংলায় *যুবতী* বলতে আমরা বুঝি বিশেষ বয়সসীমার বিশেষ লিঙ্গের মানুষ । কিন্তু আমরা এর অর্থ বের করতে গিয়ে দেখবো এর রয়েছে অন্যান্য অনেক শব্দের সাথে সম্পর্ক । যেমন যে যুবতী তার *যৌবন* আছে ; সে *যুবক, বালিকা বা বৃদ্ধা* নয় ; *বিবাহিত* হলে সে কারো *স্ত্রী* অর্থাৎ তার *স্বামী* আছে ; তার পক্ষে *মা* হওয়া সম্ভব, কিন্তু *বাবা* হওয়া সম্ভব নয় ইত্যাদি । এভাবে দেখা যায় ভাষার কোন শব্দই বিচ্ছিন্ন নয়, প্রতিটি শব্দই ভাষা সংশ্রয়ের অন্যান্য শব্দের সাথে নানারূপ সম্পর্কে বিজড়িত । এটিই হল অর্থের বিষয় । অন্যদিকে আমরা যদি এ বাক্যটির কথা ধরি – *আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে,* এখানে দেখবো *আমার সন্তান* বলতে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হচ্ছে এবং *দুধ* ও *ভাত* বলতে পৃথিবীর কোন বস্তুদ্বয়কে বোঝানো হচ্ছে । এটি হল নির্দেশন । যে ভাষিক উপাদান দিয়ে পৃথিবীর কোন কিছু নির্দেশিত হয় তাকে বলে **নির্দেশী প্রকাশ** এবং ভাষিক উপাদান পৃথিবীর যে জিনিস নির্দেশ করে তাকে বলে **নির্দেশিত** । আলোচ্য উদাহরণে *আমার সন্তান, দুধ, ভাত* হল নির্দেশী প্রকাশ এবং পৃথিবীতে

● "The sense of an expression is its place in a system of semantic relationships with other expressions in the language." James R. Hurford & Brendan Heasley 1983, *Semantics: a coursebook,* p.28

● "By means of reference a speaker indicates which things in the world (including persons) are being talked about." ibid. p.25

Dhaka University Institutional Repository

আমার সন্তান বলে পরিচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এবং দুধ ও ভাত নামক বস্তুসমূহ হল নির্দেশিত । কাজেই পারিভাষিক কৌশলে বলতে গেলে নির্দেশন হল নির্দেশী প্রকাশ ও নির্দেশিতের মধ্যে সম্পর্ক ।

আমরা শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অর্থ ও নির্দেশনের কথা বলেছি, একইভাবে আমরা বাক্যের অর্থ ও নির্দেশনের কথাও বলতে পারি । যেমন *যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মরিবার হল তার সাধ* – এ বাক্য কোন জাগতিক অবস্থা বা ঘটনার কথা নির্দেশ করে যেখানে হয়ত শেষ রাত্রির নিস্তব্ধ মায়াবী পরিবেশে কোন বেদনাবিধুর তরুণী আত্মহননের কথা চিন্তা করছে । অনুরূপভাবে আমরা নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যফুলের অর্থের কথা বলতে পারিঃ

(১) বাংলাদেশের রাজধানী কি *ঢাকা* – প্রশ্ন করেন টিনির ছোট কাকা ।

(২) ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল ।

(৩) গাছের ছাঁয়া ছটফটিয়ে এদিক ওদিক চায় ।

(৪) ক. খালেদা অপরূপ সুন্দরী ।
খ. কেউ খালেদার সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারবে না ।

(৫) ক. জন্মই আমার আজন্ম পাপ ।
খ. জন্মই আমার আজন্ম পুণ্য ।

(৬) ক. ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ।
খ. ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে পাখি ।

(৭) ক. রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগত স্বপ্ন নয় ।
খ. রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগত বাস্তব ।

(৮) ক. অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার ।
খ. বিধাতা কাউকে কাউকে অলৌকিক আনন্দের ভার দিয়ে থাকেন ।

(৯) ক. রাত্র পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী ?
খ. দিনের আলোতে দুঃখের অবসান হবে ।

উপরের বাক্য বা বাক্য ফুলগুলো যথাক্রমে (১) দ্ব্যর্থকতা (২) স্ববিরোধিতা, (৩) অসামঞ্জস্য, (৪) সহনামিতা, (৫) প্রতিনামিতা, (৬) উপনামিতা, (৭) প্রজ্ঞাপন, (৮) পূর্বধারণা, ও (৯) ইঙ্গিতার্থ -এর দৃষ্টান্ত । এগুলো সবই বিভিন্ন ধরনের অর্থ সম্পর্ক । এগুলো আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো । এখন শুধু সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে দ্ব্যর্থকতা হলো একই প্রকাশের দুটি অর্থ, স্ববিরোধিতা হলো একই প্রকাশের দুটি পরস্পরবিরোধী অর্থ, অসামঞ্জস্য হলো অর্থের বিরোধজনিত জটিলতা, সহনামিতা হলো দুটি প্রকাশের একই অর্থ, প্রতিনামিতা হলো দুটি প্রকাশের বিপরীত অর্থ, উপনামিতা হলো দুটি প্রকাশের অর্থের অন্তর্ভূক্তি, প্রজ্ঞাপন হলো একটি প্রকাশ থেকে আরেকটি প্রকাশের অনুমান, পূর্বধারণা হলো কথোপকথনে বক্তা-শ্রোতার সাধারণ জ্ঞান এবং ইঙ্গিতার্থ হলো এক কথার মাধ্যমে অন্য কথা বোঝানো ।

Dhaka University Institutional Repository

সংজ্ঞা, বাচ্যার্থ, দ্যোতনা, লক্ষণার্থ, বহির্দ্যোতনা, অন্তর্দ্যোতনা, নাম

সংজ্ঞা, বাচ্যার্থ, দ্যোতনা, লক্ষণার্থ, বহির্দ্যোতনা, অন্তর্দ্যোতনা, নাম এগুলো বাগর্থবিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত পদ । এগুলো অনেক সময় একে অপরকে অধিক্রমন ও অপসারণ করে ব্যবহৃত হয় বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে । তাই পদগুলোর সাথে সম্পর্কিত ধারণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । নীচে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।

সংজ্ঞা ঃ সংজ্ঞার মানে হলো যা দিয়ে চেনা যায় বা জানা যায় । যার সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সংজ্ঞা থেকে আমরা তার পরিচয় পাবো এবং তাকে সনাক্ত করতে পারবো । এজন্য কোন শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণার সংজ্ঞা দিতে হলে শব্দটির সমনাম বা সমঅর্থবিশিষ্ট শব্দসমষ্টি উল্লেখ করতে হয় । যেমন *ত্রিভুজ* -এর সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি – *তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র* বা *ত্রিভুজ হলো তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র* । লক্ষ্যণীয়, *সংজ্ঞা* পদটি দ্ব্যর্থক । এটি বাক্যের বিধেয়ও বোঝায় (প্রথম উদাহরণ), আবার সমগ্র বাক্যও বোঝায় (দ্বিতীয় উদাহরণ) । এই দ্ব্যর্থকতার নিরসন হতে পারে যদি আমরা প্রথমটিকে সংজ্ঞা ও দ্বিতীয়টিকে সংজ্ঞা বাক্য হিসাবে চিহ্নিত করি । সংজ্ঞাবাক্যের তিনটি অংশ – উদ্দেশ্য, বিধেয় ও সংযোজক (definiendum, definiens & copula) । যেমন ঃ

উদ্দেশ্য	সংযোজক	বিধেয়
ত্রিভুজ	হলো	তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র
triangle	is	a three-sided plane figure

যুক্তিবিদ্যার সংযোজককে =Df এই চিহ্ন দ্বারা সূচিত করা হয় । ফলে সংজ্ঞাবাক্যের রূপটি দাঁড়ায় ঃ

ত্রিভুজ = Df তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র
triangle = Df a three-sided plane figure

সংজ্ঞাকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে সংজ্ঞার শ্রেণীবিভাগ হতে পারে । রমাপ্রসাদ দাস (১৯৯৫ ঃ ১৩৭-১৪৮) নয় ধরনের সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন । এগুলো হলো ঃ

(ক) **জাতিবিভেদকবর্ণিত সংজ্ঞা** ঃ এখানে জাতিধর্ম ও বিভেদক উল্লেখ করা হয় । যথা ঃ
মানুষ = Df বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী

(খ) **প্রয়োগবর্ণিত সংজ্ঞা** ঃ এখানে পদটির প্রয়োগ দেখানো হয় । যেমন *অস্তিত্ব* -এর সংজ্ঞা ঃ
ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে = Df এমন একটা বস্তু আছে যাতে সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তি, পরমকরুণা, অসীমতা প্রভৃতি বর্তমান ।

(গ) **কারণিক সংজ্ঞা** ঃ এখানে কোন কিছুর কারণ উল্লেখ করা হয় । যথা ঃ
স্বপ্ন হলো অবচেতন মনের চিন্তাভাবনা ।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) **প্রতিবেদক সংজ্ঞা** ঃ আমরা যেসব সংজ্ঞা সাধারণত উল্লেখ করি সেগুলি প্রতিবেদক সংজ্ঞা । এ সংজ্ঞা সাধারণত অভিধান বা বর্ণনামূলক গ্রন্থ থেকে আমরা সংগ্রহ করি । যেমন আলোচ্য সংজ্ঞাটি আমরা রমাপ্রসাদের বই থেকে সংগ্রহ করেছি । কাজেই এটি প্রতিবেদক সংজ্ঞা ।

(ঙ) **প্রবর্তক সংজ্ঞা** ঃ কোন পদ কি অর্থে ব্যবহৃত হবে তা যখন প্রস্তাব বা উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে প্রবর্তক সংজ্ঞা বলে । গবেষনামূলক তাত্ত্বিক আলোচনায় হামেশাই এ ধরনের সংজ্ঞার সাক্ষাত মিলে ।

(চ) **সার সংজ্ঞা** ঃ যে সংজ্ঞার কোন বস্তুর সার (essence) উল্লেখ করা হয় তাকে বলে সার সংজ্ঞা । যেমন ঃ
মানুষের মন হলো আকাশের রঙের মতো যা ক্ষণে ক্ষণে বদলায় ।

(ছ) **বাচ্যার্থবর্তিত সংজ্ঞা** ঃ এখানে পদটির বাচ্যার্থ উল্লেখ করা হয় । যেমন ঃ
মানুষ বলতে বোঝায় রাম, রহিম, যদু, বদু এরকম পদার্থ ।

(জ) **প্রণোদক সংজ্ঞা** ঃ যখন কোন পদের জ্ঞানীয় অর্থ পরিবর্তন করে নতুনভাবে তার সংজ্ঞা দেয়া হয় তখন তাকে প্রণোদক সংজ্ঞা বলে । যেমন *সংস্কৃতি* শব্দের মূল অর্থ গান বাজনা ইত্যাদি শিল্পকলা, কিন্তু বর্তমানে এটি মার্জিত আচরণ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । এখন সংস্কৃতিবান বললে শিল্পকলার সাথে যুক্ত লোকের গুণকে বোঝায় না, বোঝায় মার্জিত ভদ্রলোকের গুণকে ।

(ঝ) **দৃষ্টান্ত প্রদর্শক সংজ্ঞা** ঃ এক্ষেত্রে নিছক ভাষায় সংজ্ঞায়িত না করে সংজ্ঞেয় প্রত্যয়ের কোন দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি আরর্ষন করা হয় । যেমন, আকাশ-এর সংজ্ঞা দিতে আমি শূন্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারি ।

আনাতোল রাপোপোর্ট (১৯৭৭ ঃ ১৮) আরো এক ধরনের সংজ্ঞার কথা বলেন, তা হলো **কার্যমূলক সংজ্ঞা** । কার্যমূলক সংজ্ঞায় কোন বিষয়ের কার্য বর্ণনা করা হয় । যেমন হিসাবযন্ত্রের সংজ্ঞা দেয়া হয় এভাবে ঃ যে যন্ত্র হিসাব করতে পারদর্শী তা-ই হিসাবযন্ত্র । শাস্ত্রজ্ঞরা ধর্মের সংজ্ঞায় বলেন ঃ যা (মানুষকে) ধারণ করে তা-ই ধর্ম (উল্লেখ্য, ধর্ম শব্দটি এসেছে সংস্কৃত *ধৃ* ধাতু থেকে যার অর্থ ধারণ) । প্রথাগতভাবে ব্যকরণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয় তাও কি কার্যমূলক নয় ? ব্যাকরণের সংজ্ঞায় বলা হয় ঃ যে শাস্ত্র আমাদের ভাষার নিয়ম কানুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর সঠিক ব্যবহারের জ্ঞান প্রদান করে তাকে ব্যাকরণ বলে ।

এগুলোর সাথে আমরা আরো এক প্রকার সংজ্ঞা যোগ করতে পারি, তা হলো **বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা** । এ সংজ্ঞায় কোন পদনির্দেশিত বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ দেয়া হয় (জ্যাকসন ১৯৮৮ ঃ ৬১) । যেমন বলা যায় লবন হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড বা

Salt =Df NaCl

তবে এর সীমাবদ্ধতা হলো এভাবে কিছু কিছু মূর্ত বস্তুর সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হলেও কোন বিমূর্ত বস্তুর সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয় ।

বাচ্যার্থ ঃ কোন শব্দ যে যে বস্তুর বেলায় প্রযোজ্য তার প্রত্যেকটি হলো শব্দটির বাচ্যার্থ । যেমন মানুষ এর বাচ্যার্থ হলো রিপন, দুলাল, রমা, তমা, পল, পিটার প্রমূখ । দার্শনিক এর বাচ্যার্থ হলো শঙ্কর, রামানুজ, সক্রেটিস, প্লেটো, মিল, হিউম, রাসেল প্রমূখ । আমরা নির্দেশনের আলোচনায় দেখেছি নির্দেশিত হলো নির্দেশী প্রকাশ কর্তৃক চিহ্নিত জাগতিক পদার্থ । কাজেই বাচ্যার্থ নির্দেশিতের সমার্থক । রমাপ্রসাদের মতে, বাচ্যার্থ হলো

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি বা বিশেষ, জাতি বা শ্রেণী নয় । যেমন *পাখির* বাচ্যার্থ হতে পারে এই পাখিটি, ঐ পাখিটি বা সেই পাখিটি, কিন্তু কাক, কোকিল, শালিক নয় (কারণ এগুলো পাখির শ্রেণী) । তেমনি *বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর* বাচ্যার্থ হলো শেখ হাসিনা নামক বিশেষ ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কর্ণধার । *বিনয় বর্মনের* বাচ্যার্থ হলো বিনয় বর্মন নামের সেই লোক যে এখন এই অভিসন্দর্ভটি লিখছে । সব শব্দের বাচ্যার্থ নেই বা সব শব্দের বাচ্যার্থ স্পষ্ট নয় । যেমন *ভূত, পরশপাথর, মৃতসঞ্জীবনী* এদের বাচ্যার্থ কি হবে তা বোঝা কষ্টকর । বিভিন্ন শব্দের মধ্যে স্বকীয় নাম ও নির্দিষ্ট বর্ণনার বাচ্যার্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট । আমাদের উদাহরণে *বিনয় বর্মন* স্বকীয় নাম ও *বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী* নির্দিষ্ট বর্ণনা । জন লিয়ন্স (1977: 206) বাচ্যার্থ বলতে শব্দ ও বস্তুর সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ প্রকাশনকে বুঝিয়েছেন এবং আমরা যাকে বাচ্যার্থ বলছি তিনি তাকে বলেছেন denotatum (বহুবচন denotata) ।

দ্যোতনা ঃ আমরা অর্থের অর্থ আলোচনায় নীচের সপ্তপ্রকারে দ্যোতিত অর্থের সামান্য আভাস পেয়েছি । এখানে সমস্যাটি আমরা পুনরুস্থাপন করবো । কোন শব্দের দ্যোতনা হলো অনুষঙ্গসূত্রে শব্দটি যেসব ধর্ম বোঝায় সেসব ধর্ম । এটি শব্দটির কেন্দ্রীয় বা মূল অর্থের অতিরিক্ত অংশ । যেমন *রাজাকার* ও *দালাল* শব্দের মূল অর্থ যথাক্রমে স্বেচ্ছাসেবক ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী, কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবতায় এগুলো এখন বাংলাদেশে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় । তাই কেউ আর রাজাকার বা দালাল হতে চায় না । ম্যাকিয়াভেলি বলেছিলেন, *রাজা হবে যুগপৎ শৃগাল ও সিংহ* । এখানে *শৃগাল* এর দ্যোতনা হলো কূটবুদ্ধি ও *সিংহ* এর দ্যোতনা হলো বিক্রম । স্পষ্টতই শব্দের দ্যোতনা ব্যক্তিভেদে, গোষ্ঠীভেদে বা সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয় । যেমন *গোমাংস* শব্দটি শুনলে একজন মুসলমানের জিভে লালা ঝরবে কিন্তু একজন হিন্দু জিভ কাটবে । একইভাবে *শুয়োরের মাংস* খাওয়ার কথা শুনলে একজন খৃষ্টান হয়তো আবেগাপ্লুত হয়ে বলবে – আহা ! অন্যদিকে একজন মুসলমান ঘৃণাভরে বলবে – আসতাকফেরুল্লা ! আগুনে যার ঘরবাড়ি পুড়েছে তার কাছে আগুনের দ্যোতনা যেমন, যে কারো ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে তার কাছে তেমন নয় । আবার যে আগুন দিয়ে মড়া পোড়ায় তার কাছে এর দ্যোতনা এক রকম, যে আগুনে মাংস পুড়িয়ে কাবাব বানায় তার কাছে এক রকম এবং যে আগুন দিয়ে খেলা দেখায় তার কাছে আরেক রকম । কারো কাছে আগুন উষ্ণতার প্রতীক, আবার কারো কাছে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক । সাধারণ ভাষার প্রায় সব শব্দেরই কমবেশি দ্যোতনা আছে । কেবল পারিভাষিক শব্দের দ্যোতনা নেই, কেননা এর তা থাকতে নেই । রমাপ্রসাদ দাস (১৯৯৫ ঃ ১০৫-১১৫) শব্দের দ্যোতনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন - *চিত্রার্থ, কাব্যার্থ* ও *আবেগার্থ* ।

কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টি শ্রোতার মনে যে চিত্র বা ছবি ফুটিয়ে তোলে তাই হলো **চিত্রার্থ** । যেমন *তিতা* শব্দটি শুনলে কারো মনে নিমগাছের ছবি এবং *মিষ্টি* শব্দটি শুনলে ময়রার দোকানের ছবি ভেসে উঠতে পারে । কবিতার চিত্রকল্পও চিত্রার্থ । যেমন ঃ

আমার পূর্ব বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

এই কাব্যাংশটি শুনে অন্ধকার, তমাল গাছ, ঘনপাতা, সন্ধ্যা, সরোবর, কালোমেঘ প্রভৃতির সম্মিলনে এক মাধুর্যময় ছবি পাঠকের মনে ভেসে উঠতে পারে ।

কাব্যার্থ হলো কবিতার রসাস্বাদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ । এটি একান্তভাবেই কাব্যগুণ, যেটি কোন কাব্যের বাক্যান্তরিত গদ্য থেকে পাওয়া যায় না । যেমন ঃ

আজিকে প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ ।

এই পদ্যটিকে যদি আমরা গদ্যে রূপ দেই তাহলে এমন হবে ঃ

> আজ সকালে সূর্যের আলো কিভাবে প্রাণের ভিতরে পৌছালো, সকাল বেলার পাখির গান কিভাবে গুহার অন্ধকারে পৌছালো, এতদিন পরে কেন যেন প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ।

কিন্তু এই গদ্যাংশের মধ্যে কি সেই কাব্যের রস পাওয়া গেল ? অতুলপ্রসাদ গুপ্ত তার *কাব্য জিজ্ঞাসা* গ্রন্থে কাব্যরস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেন যে কাব্যের আস্বাদ তখনই হয় যখন ধ্বনি[৩] কাব্যপ্রেমিক চিত্তে আনন্দময় সম্বিতের ধারায় রসে পরিণত হয় । কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন, "Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility." বস্তুতঃ যার মধ্যে শুভ্রশান্ত সৌম্যকান্ত আবেগের অপার উচ্ছাস নেই কবিই হোক পাঠকই হোক, সে কোনদিন রসের নাগাল পায় না । কাব্যরস তাই সুলভ নয় এবং সেই অর্থে সরস কাব্যও বিরল । গুপ্ত (১৯৭৩ ঃ ২৭) বলেন, "মনে যতো ভাব উদ্গত হয়, তাই যদি কাব্য হতো, তবে আজ বাংলাদেশের যে সব হিন্দু মুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হতো ।"

আবেগার্থ হলো কোন শব্দকে ঘিরে অনুকুল বা প্রতিকূল অনুভবের উদ্ভাসন বা অনুরঞ্জন । এটি আমাদের পূর্বালোচিত আনুভূতিক অর্থের (লীচের সপ্তপ্রকারের চতুর্থটি) সমতুল্য । কাউকে যদি বলা হয় *তোমার মনে জিলাপীর প্যাঁচ* তাহলে মিষ্টান্ন দ্রব্যের উপমা সত্ত্বেও সে নাখোশ হয় কারণ বাক্যটির অর্থ আবেগাত্মকভাবে কূটিলতার সাথে সম্পৃক্ত । একইভাবে কোন মেয়েকে *মাল* বললে সে অপমান বোধ করতে পারে কারণ শব্দটি বক্তার মনের অশালীন আবেগ থেকে উদ্ভুত । অনেক সমাজে এরকম রীতিই আছে যে মেয়েদের সাথে কথা বলতে হবে নরম সুরে মিঠাবোলে – এমন শব্দ প্রয়োগে যা ইতিবাচক আবেগার্থ প্রকাশ করে । এ প্রসঙ্গে জন্ ই ডনোভ্যানের একটি মজার কবিতা আছে Semantics শিরোনামে ।

Call a woman a kitten, but never a cat
You can call her a mouse, cannot call her a rat
Call a woman a chicken, but never a hen
Or you surely will not be her caller again.

---

[৩] অতুলপ্রসাদ গুপ্ত *ধ্বনি* বলতে শব্দোচ্চারণ বা শব্দের ভৌত রূপকে বোঝাননি, ধ্বনি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন শব্দের অর্থকে ।

Dhaka University Institutional Repository

You can call her a duck, cannot call her a goose
You can call her a deer, but never a moose
You can call her a lamb, but never a sheep
economic she lives, but you can't call her cheap.

You can say she's a vision, can't say she's a sight
And no woman is skinny, she's slender and slight
If she should burn you up, say she sets you afire
And you'll always be welcome, you tricky old liar. [৩]

দ্যোতনা কেবল ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, এটি এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । হায়াকাওয়া (১৯৪৯ ঃ ১৩৭-১৩৮) লক্ষ্য করেন যে দ্যোতনাপূর্ণ ভাষা আবেগসঞ্চারক, তাই এটি সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী । যারা এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন হায়াকাওয়া তাদের রসিকতা করে বলেন বাকপ্রতারক, কারণ তারা শ্রোতাকে আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে বাস্তববোধ থেকে দূরে সরিয়ে নেন । তিনি বলেন, "বাকপ্রতারকের সঙ্গীতময় ধ্বনিতে সাপুড়ের বাঁশির সুরে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো আমরা দুলে উঠি ।" (Like snakes under the influence of a snake charmer's flute, we are swayed by the musical phrases of the verbal hypnotist.)

লক্ষণার্থ ঃ যে ধর্মসমষ্টি থাকার দরুণ কোন বস্তুতে কোন শব্দ প্রযোজ্য হয় তাকে বলে ঐ শব্দটির লক্ষণার্থ । যেমন *মানুষ* -এর লক্ষণার্থ হল প্রাণিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি, কারণ এ দুটি গুণ থাকার কারণে কোন কিছুকে আমরা মানুষ বলে গন্য করি । লক্ষণার্থ ও বাচ্যার্থের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে – প্রথমটি হলো সংখ্যা পরিমাপ, দ্বিতীয়টি হলো গুণপরিমাপ । দুটি শ্রেণীবাচক শব্দ যে শ্রেণী বোঝায় সে শ্রেণী দুটির মধ্যে যদি অন্তর্ভুক্তির সম্বন্ধ থাকে তাহলে শব্দদুটির লক্ষণার্থ ও বাচ্যার্থ তুলনা করে যা পাওয়া যায় তা একটা নিয়মের আকারে ব্যক্ত করা যায় (রমাপ্রসাদ দাস ১৯৯৫ ঃ ৯৫) ঃ

যে শব্দটির লক্ষণার্থ অধিকতর তার বাচ্যার্থ অপেক্ষাকৃত কম
যে শব্দটির বাচ্যার্থ অধিকতর তার লক্ষণার্থ অপেক্ষকৃত কম
যে শব্দটির লক্ষণার্থ অপেক্ষাকৃত কম তার বাচ্যার্থ অধিকতর
যে শব্দটির বাচ্যার্থ অপেক্ষাকৃত কম তার লক্ষণার্থ অধিকতর

নীচের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি পরিস্কার করা যায় ঃ

শব্দ	লক্ষণার্থ	বাচ্যার্থ
প্রাণী	প্রাণিত্ব	প্রত্যেক সৎ মানুষ + অসৎ মানুষ + অন্য প্রাণী
মানুষ	প্রাণিত্ব + বুদ্ধিবৃত্তি	প্রত্যেক সৎ মানুষ + অসৎ মানুষ
সৎ মানুষ	প্রাণিত্ব + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা	প্রত্যেক সৎ মানুষ

[৩] কবিতাটি নেয়া হয়েছে Edward B. Jenkinson (1967), *What Is Language*, p. 30 থেকে ।

Dhaka University Institutional Repository

জন লিয়ন্স (১৯৭৭ ঃ ৫০-৫১) অর্থকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন – বর্ণনামূলক, সামাজিক ও প্রকাশমূলক এবং তিনি বর্ণনামূলক অর্থকে লক্ষণার্থের সাথে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন ।

বহির্দ্যোতনা ঃ বহির্দ্যোতনা পদটি নির্দেশনাত্মক ও সত্যশর্তমূলক তত্ত্বের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভূত হয়েছে । বাহ্যিক সংগঠনে এটি সাধারণত বিধেয়ের উপর প্রযোজ্য হয় । কোন বিধেয়ের বহির্দ্যোতনা বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বস্তুর সেটকে যার উপর বিধেয়টি সত্যিকারভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে । যেমন *ঘর* -এর বহির্দ্যোতনা হলো পৃথিবীর সমস্ত ঘরের একটি সেট, *কুকুর* -এর বহির্দ্যোতনা হলো প্রথিবীর সমস্ত কুকুরের একটি সেট এবং *লাল* এর বহির্দ্যোতনা হলো পৃথিবীর সমস্ত লাল বস্তুর একটি সেট । কাজেই দেখা যায় আমরা নির্দেশিত ও বাচ্যার্থকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছি তাতে বহির্দ্যোতনা তাদের অনুরূপ বলে প্রতিভাত হয় । তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, বহির্দ্যোতনার তাত্ত্বিক গুরুত্ব ভিন্ন । বিধেয়ের বহির্দ্যোতনা সময়সাপেক্ষ । যখন আমরা *জীবিত* -এর বহির্দ্যোতনার কথা বলি তখন আমরা বলার মুহূর্তে যত জীবিত মানুষ আছে তাদের কথা বলি । কাজেই *জীবিত* শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হলে ভিন্ন ভিন্ন সেটকে বোঝাবে (Hurdford & Heasley 1993: 81) ।

অন্তর্দ্যোতনা ঃ অন্তর্দ্যোতনা বহির্দ্যোতনার সাথে বৈপরীত্য প্রকাশ করে । জন লিয়ন্স বহির্দ্যোতনা ও অন্তর্দ্যোতনার সংজ্ঞা দেন এভাবে ঃ "একটি পদের বহির্দ্যোতনা বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বস্তুকে যার উপর পদটি সঠিকভাবে প্রযোজ্য ।" এবং "একটি পদের অন্তর্দ্যোতনা বলতে বোঝায় সেই সমস্ত আবশ্যিক গুণাবলীর সেটকে যা পদটির প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করে ।"● বিধেয় কলনের সাহায্য নিয়ে (চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা) বলা যায় যে ক যদি কুকুরের সেট হয় এবং খ যদি তার গুণাবলী (কুকুরত্ব) হয় তাহলে ঃ

x (খx = x ∈ ক) ''যার মধ্যে কুকুরত্ব আছে তা-ই কুকুর ।''

এটিই হল কুকুরের অন্তর্দ্যোতক সংজ্ঞা । আমরা লক্ষ্য করে থাকবো অন্তর্দ্যোতনা আমাদের পূর্বালোচিত লক্ষণার্থের মতো হলেও এর তাত্ত্বিক গুরুত্ব ভিন্ন । আমরা পরে দেখবো যে ফ্রেজ ও অন্যান্য দার্শনিকগন একটি উক্তির বহির্দ্যোতনাকে এর সত্যশর্ত বলে ধরে নিয়েছেন এবং অন্তর্দ্যোতনাকে বলেছেন উক্তিটির অর্থ । যে যুক্তিবিদ্যা অন্তর্দ্যোতনাকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতর এনে ভাষার অর্থকে রৌপিকভাবে ব্যাখার প্রয়াস পায় তাকে বলে **অন্তর্দ্যোতক যুক্তিবিদ্যা** ।

নাম ঃ নাম হলো কোনকিছুকে ডাকার উপায় । ভাষার শব্দসমূহ এক অর্থে কোন না কোন কিছুর নাম । যেমন *আবদুল, রমেশ* বিশেষ ব্যক্তিসমূহের নাম ; *গরু, ঘোড়া* বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর নাম ; *দৌড়ানো, সাঁতরানো* বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মের নাম । ভাষা আয়ত্তকরণের জন্য নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশুরা নামকরণের মাধ্যমে অনেক শব্দ শিখে থাকে । অনেকে মনে করেন যে ভাষার উৎপত্তিই হয়েছে নামকরণের মধ্য দিয়ে । জন লিয়ন্স (১৯৭৭ ঃ ২১৬) মনে করেন নামের রয়েছে দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্য – নির্দেশনাত্মক ও সম্বোধনমূলক । প্রথম ক্ষেত্রে নাম দিয়ে কোন কিছু নির্দেশ করা হয় এবং নামটি বক্তা বা শ্রোতাকে বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর

● "By the extension of a term is meant the class of the things to which it is correctly applied." "The intention of a term is the set of essential properties which determines the applicability of the term." John Lyons (1977), ***Semantics***, pp. 158-159.

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাম দিয়ে কাউকে সম্বোধন করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যা ভাষিক যোগাযোগকে ত্বরান্বিত ও সুচারু করে । শুধু ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণা নয়, আমরা নামেরও নামকরণ করতে পারি । যেমন আমরা *বিল ক্লিনটন* নামটির নাম রাখতে পারি *চিনু* । এখন *চিনু* বললে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নামক ব্যক্তিকে বোঝাবে না, বোঝাবে *বিল ক্লিনটন* নামটিকে । স্বকীয় নামের অর্থ আছে কিনা তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে । জন লিয়ন্স মনে করেন স্বকীয় নামের কোন অর্থ নেই, তবে তাদের নির্দেশন আছে । সে হিসাবে *জলি, পলি, মলি,* কোন অর্থ প্রকাশ করে না, তবে বাস্তব জগতের বিশেষ ব্যক্তি সমূহকে নির্দেশ করে ।

শেক্সপীয়ার বলেছিলেন, "নামে কিবা আসে যায় ? গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাতে তার গন্ধের তারতম্য হবে না ।" বাস্তবে মানুষের কাছে নামের গুরুত্ব সমধিক ; নাম নিয়ে মানব সমাজে রয়েছে নানা সংস্কার । ব্যাপারটি বাগর্থবিদ্যার চেয়ে বরং নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয় হলেও এখানে লৌকিক নামকরণ নিয়ে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না । অপত্যস্নেহে অন্ধ হয়ে পিতামাতা তাদের কানা ছেলের নাম রাখতে পারেন *পদ্মলোচন* ; কোন অশুভ প্রভাব যাতে ছেলেমেয়েকে স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য তারা নাম রাখেন *মরণ/মরণী, ফালান/ফালালী, পচা, তিতুরাম* ইত্যাদি; যাতে আর সন্তান না হয় সেই কামনায় (বিশেষ করে পূর্বের সমাজে যেখানে কৃত্রিমভাবে জন্মনিরোধের ব্যবস্থা ছিল না কিংবা থাকলেও তাতে জনগনের অনাস্থা ও অবিশ্বাস ছিল) নাম রাখেন *আন্নাকালী* (আর না কালী), *ক্ষান্তমনি, থাকমনি, ইতি* ইত্যাদি । কেউ-ই তার সন্তানের দুঃখ চায় না, চায় না কালিমাযুক্ত জীবন । তাই কোন হিন্দু পিতামাতাকে তাদের মেয়ের নাম *সীতা* ও ছেলের নাম *রাবন* রাখতে যায় না (এখানে পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্যণীয়) । সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের কামনায় পিতামাতা তাদের সন্তানের নাম রাখেন *রাজা, বাদশা, সম্রাট* । ইতিহাস মানুষকে প্রভাবিত করে । ইতিহাসের কুখ্যাত চরিত্রকে মানুষ এড়িয়ে চলতে চায়, সেজন্য আমাদের দেশের কোন মুসলমান সম্ভবত তার সন্তানের নাম রাখবে না *সীমার, মীরজাফর বা এজিদ* । সুন্দর নাম মানুষের মনকে আকর্ষণ করে যেমনভাবে সুন্দর রঙ আকর্ষণ করে মানুষের চোখকে । এজন্য সাহিত্যিকরা তাদের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-নাটকের একটি শিল্পময় সুন্দর নামের জন্য হন্যে হন ; একইভাবে চিত্রনির্মাতারা তাদের ছায়াছবির, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের, বাড়িওয়ালারা তাদের ভবনের নামকরণে একটি হৃদয়গ্রাহী শব্দের প্রয়াসী হন । তবে কিভাবে একটি নাম মনোহারিত্ব অর্জন করে তা এক বিরাট রহস্য । এটিও ভালোভাবে বোঝা যায় না ঠিক ধ্বনির কোন্ গুণ থাকার কারণে অথবা ধ্বনিসমূহের কিরকম বিন্যাসে একটি শব্দ শ্রুতিমধুর ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠে । রবীন্দ্রনাথও এ নিয়ে ভাবিত হয়েছেন এবং মনে হয় কিছুটা বিভ্রান্তও হয়েছেন । নামকে তিনি ইতিহাসের নিরিখে বিচার করতে গিয়ে হয়ে উঠেছেন নষ্টালজিক ঃ

> সেই প্রাচীন ভারতখন্ডটুকুর নদী-গিরি নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর । অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা সিপ্রা বেত্রবতী । নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে । সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে । এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী ।

মেঘদূতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির যথার্থতা বিচার করবেন নামতত্ত্ববিদেরা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ ও উল্লেখ

বাগর্থবিদ্যার আলোচনায় কিছু মৌলিক বিভ্রান্তি এড়াতে হলে প্রয়োগ ও উল্লেখের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক। কেউ বলতে পারেন ঃ

অঞ্জলি লহো মোর সঙ্গীতে।

আবার –

অঞ্জলি একটি বাংলা শব্দ।

এ দুটি বাক্যের *অঞ্জলি* শব্দে পার্থক্য আছে। আধুনিক পরিভাষায় বলতে হবে প্রথমটিতে শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং দ্বিতয়ীটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা উল্লেখ করি কোন বস্তু বা ব্যাপার, কখনো কখনো কোন শব্দ ও বাক্য, কিন্তু প্রয়োগ করি এদের নাম। এ পার্থক্য বোঝানোর জন্য আমরা উল্লেখের বেলায় ছাপা বা লেখার বিশেষ কৌশল অবলম্বন করি। যেমন আমরা উল্লিখিত অংশকে উদ্ধৃতিচিহ্নের ভিতর রাখতে পারি অথবা বাঁকা হরফ ব্যবহার করতে পারি। নীচের বাক্যদুটির দিকে তাকানো যাক ঃ

বিলাসী মরেও অমর হয়ে রইল।
"বিলাসী মরেও অমর হয়ে রইল।"

প্রথমটিতে বিলাসী নামের কোন মেয়ে সম্পর্কে একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটি প্রয়োগের উদাহরণ। দ্বিতীয়টিকে আমরা প্রথম বাক্যের নাম মনে করতে পারি যেটি বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন, উদ্ধৃতিকারী বলতে পারেন "বিলাসী মরেও অমর হয়ে রইল" বাক্যটি শরৎচন্দ্রের লেখা নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এটি উল্লেখের উদাহরণ। প্রয়োগ ও উল্লেখের পার্থক্য থেকে একটি মজার ব্যাপার বেরিয়ে আসে, তা হলো শব্দ বা বাক্য নিজ গুণে নিজেকেই নির্দেশ করতে পারে। জন লিয়ন্স (১৯৭৭ ঃ ৫) ভাষার এই গুণটিকে বলেছেন **প্রতিবিম্বতা**।

প্রকার ও দৃষ্টান্ত

আমেরিকান দার্শনিক সি. এস. পিয়ার্স সর্বপ্রথম প্রকার ও দৃষ্টান্তের পার্থক্যের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পার্থক্যটি বোঝার জন্য আমরা নীচের গানের কথাগুলোর দিকে তাকাতে পারি ঃ

মেঘ কালো আঁধার কালো
আর কলঙ্ক যে কালো
যে কালিতে বিনোদিনী হারালো তার কুল
তার চেয়ে কালো কণ্যা তোমার মাথার চুল।

Dhaka University Institutional Repository

যদি প্রশ্ন করা হয় উপরের চারটি ছত্রে কয়টি শব্দ আছে তাহলে সমস্যায় পড়তে হবে । এক হিসাবে ওখানে ২১টি শব্দ আছে আরেক হিসাবে আছে ১৬টি । প্রথম ক্ষেত্রে কাগজের পৃষ্ঠায় ফাঁকাস্থান দ্বারা বিভক্ত প্রতিটি অক্ষরপুঞ্জকে শব্দ বলে ধরে নেয়া হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রূপমূলগত সাদৃশ্যকে বিবেচনায় আনা হয়েছে । প্রথম ক্ষেত্রে গণনা করা হয়েছে যাকে বলা হয় *মুদ্রনবিদ্যক বা ধ্বনিতাত্ত্বিক শব্দ* এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গণনা করা হয়েছে যাকে বলা হয় *রূপতাত্ত্বিক শব্দ* । প্রথম ক্ষেত্রে *কালো* শব্দটি চারবার, *তার* শব্দটি দুইবার এবং *যে* শব্দটি দুইবার করে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেগুলো একবার করে গণনা করা হয়েছে । আমরা পারিভাষিক কৃচ্ছতা এনে বলতে পারি উপরের উদাহরণে ১৬টি প্রকার ও ২১ টি দৃষ্টান্ত আছে এবং একটি প্রকার চারবার ও দুইটি প্রকার দুইবার করে আবির্ভূত হয়েছে দৃষ্টান্তরূপে । মাঝে মাঝে ভাষায় প্রকার ও দৃষ্টান্ত সংখ্যা সমান হতে পারে । এরকম হয় যখন প্রকার একবারের বেশি আবির্ভূত হয় না । এরূপ অবস্থাকে বলা হয় **প্রকার-দৃষ্টান্ত সারূপ্য** । যেমন নীচের উদাহরণে প্রকার-দৃষ্টান্ত সারূপ্য ঘটেছে ঃ

রাজার পদ চর্ম আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে ।'

শব্দার্থ ও বাক্যার্থ

মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ অপ্সরী
দূরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয় ;
তোমার অবেদ্য গানে অব্যক্তির সতর্ক প্রহরী
বিমুগ্ধ নিদ্রায় লোটে, মুক্তি পায় অনির্বচনীয় ।
তোমার আকাশবাণী জলেস্থলে, পর্বতে, কাননে
আনন্দে, ব্যথায়, রসে, রূপসীর পার্থিব আননে ।।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শব্দকে তুলনা করেছিলেন অপ্সরীর সঙ্গে, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এর সর্বত্রবিস্তারী রূপ । বস্তুতঃ শব্দ বড় দাপুটে জিনিস । তবে এই দাপট অবশ্যই এর অর্থের জন্য । শব্দার্থের মাধ্যমে মানুষের মনের ভাব প্রকাশিত হয়, 'মুক্তি পায় অনির্বচনীয়' । কবির কল্পনা নয়, আমরা এখানে দেখবো বাগর্থবিদগণ শব্দকে কিভাবে দেখেছেন, কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এর অর্থ । শব্দের অর্থ সংক্রান্ত আলোচনাকে বলা হয় **শাব্দিক বাগর্থবিদ্যা** । শব্দের অর্থ নির্ণয় খুব সহজ কাজ নয় । অর্থের তারল্য ও অনির্ধারণযোগ্যতাই এর প্রদান কারণ । একটি শব্দের অর্থকে মৌলিক ধারণায় ভেঙ্গে ফেলা যেতে পারে এবং ঐ মৌলিক ধারণাসমূহকে আমরা বলতে পারি **অর্থমূল** বা **বাগর্থিক পরমাণু** (Hofmann 1993: 226)। যেমন ঃ

শব্দ	বাগর্থিক পরমাণু
পুরুষ	পুংলিঙ্গ + প্রাপ্তবয়স্ক
মহিলা	স্ত্রীলিঙ্গ + প্রাপ্তবয়স্ক

Dhaka University Institutional Repository

বালক	পুংলিঙ্গ + অপ্রাপ্তবয়স্ক
বালিকা	স্ত্রীলিঙ্গ + অপ্রাপ্তবয়স্ক
নপুংসক	পুংলিঙ্গ + প্রাপ্তবয়স্ক + পুরুষত্বহীনতা
বেশ্যা	স্ত্রীলিঙ্গ + প্রাপ্তবয়স্ক + বেশ্যাবৃত্তি
বন্ধ্যা	স্ত্রীলিঙ্গ + প্রাপ্তবয়স্ক + বিবাহিত + সন্তানহীনতা
মৃতবৎস্যা	স্ত্রীলিঙ্গ + প্রাপ্তবয়স্ক + বিবাহিত + মৃতসন্তান

এভাবে শব্দের অর্থ নির্ণয়ে আমরা যা করছি তা মূলতঃ অন্য শব্দের সাথে তুলনা । একটি শব্দ সংশ্রয়ের অন্যান্য শব্দের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করে আমরা তাকে বলে **অনুস্থাপনিক সম্পর্ক** । উপরের দৃষ্টান্তে ছয়টি শব্দ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরস্পরের সাথে অনুস্থাপনগত সম্পর্কে আবদ্ধ । একটি বিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ বের করা প্রায়ই মুশকিলের কাজ । শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হয় এর বাক্যে ব্যবহারে । একটি শব্দ বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করে আমরা তাকে বলি **পারস্পরিক সম্পর্ক** । যেমন ঃ

জল পড়ে, পাতা নড়ে ।

এ বাক্যটিতে *জল* -এর সাথে *পড়া* ও *পাতা* -র সাথে *নড়া* -র সম্পর্ক রয়েছে । আমরা বুঝতে পারি যে এখানে *পড়া* মানে *পঠন* (যেমন - বই পড়া), *পরিধান* (যেমন - কাপড় পড়া) কিংবা *মন্ত্রোচ্চারণ* (যেমন- পানিপড়া) নয়, এর অর্থ হলো *পতন* । তেমনি এখানে *পাতা* মানে বিশেষ্য বাচক *বইয়ের কাগজ* বা ক্রিয়াবাচক *স্থাপন করা* (যেমন- ফাঁদ পাতা) নয়, এর অর্থ *গাছের পাতা* । বাক্যের অর্থ সংক্রান্ত আলোচনাকে বলে **ব্যাকরনিক বাগর্থবিদ্যা** । বাক্যের অর্থ কেবলমাত্র তার শব্দের অর্থগুলোর উপর নির্ভর করে না, শব্দগুলোর বিন্যাসের উপরও নির্ভর করে । বাক্যের অর্থ যদি কেবল শব্দগুলোর অর্থের দ্বারা নির্ণীত হতো তাহলে নীচের বাক্য দুটোর অর্থ হতো একই ঃ

রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি ।
কাঙালের হস্ত করে সমস্ত রাজার ধন চুরি ।

কিংবা নীচের শব্দ গুলোর বিন্যাস অর্থপূর্ণ হতো ঃ

শুনে একলা না তবে আসে যদি চল তোর রে ডাক কেউ ।

এখানে অর্থপূর্ণ শব্দগুলো একটি অর্থহীন বাক্য সৃষ্টি করেছে কারণ তারা ব্যাকরণের নিয়ম মেনে বিন্যস্ত হয়নি, যেমনটা হয়েছে নীচে ঃ

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে ।●

শব্দার্থ ও বাক্যার্থের সম্পর্ককে আমরা নিম্নলিখিত সহজ সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি ঃ

বাক্যার্থ = শব্দার্থ + ব্যাকরণিক নিয়মাবলী

● আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বেচ্ছাকৃত নিয়ম ভঙ্গের ব্যাপারটি উপেক্ষা করতে পারি । ব্যাকরণগতভাবে *তোর* এর সাথে *চলো* কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তা সঙ্গীতের তাল-লয় ঠিক রাখার জন্য জরুরী ।

Dhaka University Institutional Repository

আর. এইচ. রবিন্স (১৯৮০ ঃ ১৭) বলেন, "সাধারণভাবে বলতে গেলে শব্দ হচ্ছে সুবিধাজনক একক যার অর্থ বিবৃত করা হয় এবং এটা মনে করা দোষের নয় যে শব্দ অর্থপ্রাপ্ত হয় বাক্যে প্রয়োগের মাধ্যমে। অধিকাংশ বাক্যই একাধিক শব্দযোগে গঠিত, তবে বাক্যের অর্থকে বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলোর অর্থের যোগফল মনে করা যায় না।"[৪]

সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যায় (বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে) শব্দ ও বাক্যের এ সম্পর্ক একটি মূলনীতির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়, যথা ঃ

"কোন প্রকাশের অর্থ হলো তার অংশগুলোর অপেক্ষক।"[৫]

দার্শনিক গটলব ফ্রেজের নামানুসারে এর নাম হয়েছে **বিরচনামূলকতার ফ্রেজীয় নীতি**। বস্তুতঃ শব্দার্থ ও বাক্যার্থের প্রকৃতি ও সম্পর্ক নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য তত্ত্ব। তবে এসব তত্ত্বের সাথে একটি আভিমুখিক সমস্যা প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত। সমস্যাটি হলো ভাষিক তত্ত্ব শব্দার্থ থেকে বিশ্লেষণ শুরু করে বাক্যার্থের দিকে যাবে নাকি বাক্যার্থ থেকে বিশ্লেষণ শুরু করে শব্দার্থের দিকে যাবে। আমাদের বিবেচনায় উভয় পদ্ধতিই নীতিগতভাবে বৈধ। কেম্পসন (১৯৭৭ ঃ ২৮) বলেন, "যদি শব্দার্থের স্বাধীন বৈশিষ্ট্যায়ন প্রদত্ত হয়, তবে বাক্যার্থকে শব্দার্থের অহরণরূপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে; আর যদি বাক্যার্থকে স্বাধীন বৈশিষ্ট্যায়ন প্রদত্ত হয় তবে শব্দার্থকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে বাক্যার্থে তার অবদানের মাধ্যমে।"[৬]

বাক্য, বচন ও উক্তি

বাগর্থবিদগণ বাক্য, বচন ও উক্তির মধ্যে পার্থক্য করেন। বাক্য ব্যাকরণিক একক, বচন যৌক্তিক একক এবং উক্তি প্রয়োগতাত্ত্বিক একক। ব্যাপারটিকে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ব্যাকরণের আলোচনায় বলা হয় বাক্য হলো শব্দযোগে গঠিত বৃহত্তম একক যার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন ঃ

আমি বই পড়ছি।
তুমি কোথায় যাচ্ছ ?
আমার কথা শোন।

---

[৪] "Words, therefore, are, in general, convenient units about which to state meanings, and no harm is done provided it is borne in mind that words have meanings by virtue of their employment in sentences, most of which contain more than one word, and that the meaning of a sentence is not to be thought of as a sort of summation of the meanings of its component words taken individually." R.H. Robins (1980). *General Linguistics: An Introductory Survey*. p.17

[৫] "The meaning of an expression is a function of the meaning of its parts." Ronnie Cann (1993), *Formal Semantics: An introduction*. p.3

[৬] "If the word meaning is given the independent characterisation, then the sentence meaning could be given a derivative characterisation in terms of word meaning; and if sentence meaning is given the independent characterisation then the meaning of words could be explained in terms of their contribution to sentence meaning." Kempson (1977), *Semantic Theory*, p.17

Dhaka University Institutional Repository

এগুলো দিয়ে বক্তার মনের ভাব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়, কাজেই এগুলো বাক্য । কিন্তু *আমি বই...*, *তুমি... কিংবা আমার কথা...* বললে তা দ্বারা বক্তার মনের ভাব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয় না, কাজেই এগুলো বাক্য বলে গণ্য হবে না । বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে বিশেষ্য (শব্দগুচ্ছ), ক্রিয়া (শব্দগুচ্ছ), বিশেষণ প্রভৃতি ক্যাটিগরি বা শ্রেণীর পদ পাওয়া যায় । যেমন *আমি বই পড়ছি* এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করে পাই বিশেষ্য *আমি* (প্রথাগতভাবে *আমি* সর্বনাম, সর্বনাম অবশ্য বিশেষ্যশ্রেণীভুক্ত), ক্রিয়া শব্দগুচ্ছ *বই পড়ছি* যা গঠিত একটি ক্রিয়া *পড়ছি* ও একটি বিশেষ্য বই সহযোগে । কাজেই এখানে একটি স্তরক্রম আছে এবং স্তরক্রমটিকে এভাবে দেখানো যায় ঃ

$$S(_{NP}\text{আমি }_{VP}(\text{পড়ছি }_{NP}(\text{বই})))$$

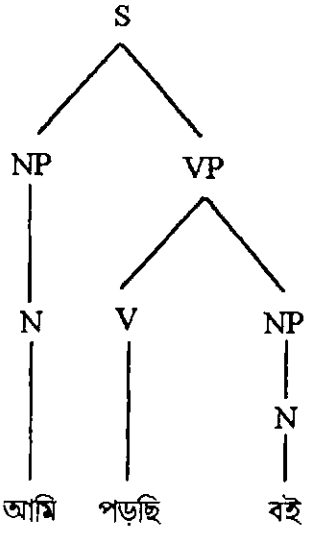

আমি পড়ছি বই থেকে কিভাবে *আমি বই পড়ছি* আসে তা রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের বিষয় ; এখানে তার আলোচনা আমাদের আয়ত্তের বাইরে ।

বচন ভাষার যৌক্তিক সংগঠন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় । এজন্য একে যুক্তিবাক্যও বলা হয় । বাক্যের মতো বচনেরও একটি আভ্যন্তরীণ সংগঠন রয়েছে । বচনকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় উদ্দেশ্য ও বিধেয় । যেমন *আমি বই পড়ছি* এটিকে যদি আমরা বচন ধরি তাহলে এখানে *আমি* হবে উদ্দেশ্য এবং *বই পড়ছি* হবে বিধেয় । এক বিশেষ ধরনের যৌক্তিক পদ্ধতি যাকে বলা হয় *বিধেয় কলন* (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), আমরা দেখবো তাতে বচনকে বিধেয়ক ও যুক্তিতে বিশ্লেষণ করা হয় । যেমন, *আমি বই পড়ছি* এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করা হবে এভাবে ঃ

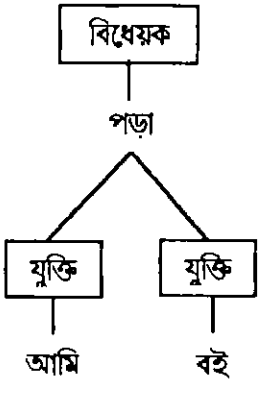

Dhaka University Institutional Repository

একই বচনের বিভিন্ন বাহ্যিক রূপ থাকতে পারে, অথবা ঘুরিয়ে বলা যায় বিভিন্ন বাক্যের অন্তর্ণিহিত বাচনিক রূপ অভিন্ন হতে পারে ।

বাক্যের সাথে বচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে । প্রথমত, বাক্য বর্ণনামূলক, প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাবাচক, ইচ্ছাসূচক ইত্যাকার হতে পারে, কিন্তু বচন কেবল বর্ণনামূলক হবে । যেমন নীচের চারটি বাক্য একটি মাত্র বচনের সাথে সম্পর্কিত ঃ

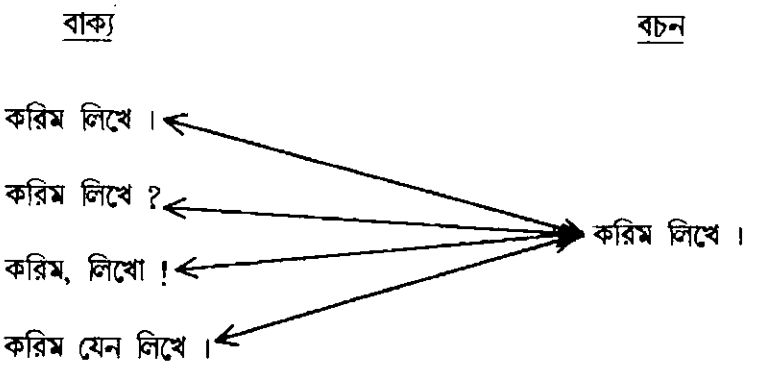

দ্বিতীয়ত, বচনের একটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি সত্যমিথ্যা গুণবিশিষ্ট হবে, অর্থাৎ এটি হয় সত্য হবে নতুবা মিথ্যা হবে । কিন্তু বাক্যের ক্ষেত্রে এটি সর্বদা প্রযোজ্য নয় । প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাবাচক, ইচ্ছাসূচক প্রভৃতি প্রকারের বাক্যের সাথে সত্যমিথ্যার প্রশ্নটি সরাসরি জড়িত নয় ।

উক্তিকে প্রয়োগতাত্ত্বিক উপাদান বলা হয় । অর্থাৎ কোন বাক্যের যখন বাস্তব প্রয়োগ ঘটে তখন তা হয় উক্তি । উক্তি ভাষার বাস্তবায়ন, বাক্য বা বচনের মতো এটি বিমূর্তায়ন নয় । উক্তিকে সাধারণত বিষয়মূল ও মন্তব্যে বিশ্লিষ্ট করা হয় । উক্তিতে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাহলো বিষয়মূল এবং বিষয়মূল সম্পর্কে যা বলা হয় তাহলো মন্তব্য । যেমন ঃ

বিষয়মূল	মন্তব্য
আমি	বই পড়ছি
তুমি	কোথায় যাচ্ছ
আমরা কথা	শোন

কথোপকথনে বিষয়মূলটিতে পুরনো তথ্য থাকে যা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে বা যা বক্তাশ্রোতা উভয়েরই জানা আছে । কথোপকথনে মন্তব্য নতুন তথ্য বহন করে বা প্রকাশ করে । এজন্য সাধারণভাবে কথা বলার সময় ঝোকটি মন্তব্যের কোথাও পতিত হয় । উক্তির কয়েকটি লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে । প্রথমত, প্রতিটি উক্তি কোন না কোন বিশেষ স্বরভঙ্গিতে উচ্চারিত হয় । কিন্তু বাক্য ও বচনের সাথে স্বরভঙ্গির সংশ্রব নেই । দ্বিতীয়ত, উক্তির মাঝে মাঝে বিরাম ও অর্থহীন ধ্বনি থাকতে পারে । যেমন ঃ গতকাল আমি _ ইম্ _ টাইটানিক দেখতে গিয়েছিলাম । তৃতীয়ত, উক্তিতে কিছু পৌনপুনিক ভাষিক উপাদান যেমন *বুঝলে, দেখো, ঠিক কিনা* ইত্যাদি থাকতে পারে যেগুলোর কোন সুস্পষ্ট অর্থ নেই । চতুর্থত, এমন অনেক উক্তি আছে যেগুলোকে কোনভাবে বাক্য বা বচন বলা যায় না । যেমন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক ঃ ইয়াহু !
খ ঃ কি ?
ক ঃ ডিং ডিং ডিং ডিং – আমি এখন কিং ।
খ ঃ ব্যাটা, ফাজিল ।
ক ঃ লটারী ।
থ ঃ ও, আচ্ছা !

এখানে ক ও খ-এর উক্তিগুলিকে কি বাক্য বা বচন বলা যাবে ?

তবে আমরা বাক্য, বচন ও উক্তির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারি । সাধারণতঃ বাক্যের ক্রিয়াশব্দগুচ্ছপূর্ব বিশেষ্য বচনে উদ্দেশ্য এবং উক্তিতে বিষয়মূল হিসাবে দেখা দেয় । একইভাবে বাক্যের ক্রিয়াশব্দগুচ্ছ সাধারণত বচনের বিধেয় এবং উক্তির মন্তব্য হিসাবে প্রতিভাত হয় । *আমি বই পড়ছি* এটি দিয়ে বাক্য, বচন ও উক্তির সম্পর্ককে স্পষ্ট করা যায় ঃ

	আমি	*বই পড়ছি*
ব্যাকরণ	বিশেষ্য	ক্রিয়াশব্দগুচ্ছ
যুক্তিবিদ্যা	উদ্দেশ্য	বিধেয়
প্রয়োগবিদ্যা	বিষয়মূল	মন্তব্য

নিরুক্তবিদ্যা, শব্দতত্ত্ব ও অভিধানবিদ্যা

বাগর্থবিদ্যার মতো নিরুক্তবিদ্যা, শব্দতত্ত্ব ও অভিধানবিদ্যা শব্দের অর্থ নিয়ে কারবার করে । তাই এদের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন ।

নিরুক্তবিদ্যা ঃ নিরুক্তবিদ্যা হচ্ছে শব্দের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা । শব্দের ইতিহাস অনুসন্ধানই নিরুক্তবিদ্যার কাজ । যেমন আমরা সবাই ছোট ছোট গোটা সদৃশ মিষ্টান্নদ্রব্য *বুরিন্দা* -র সাথে পরিচিত । কিন্তু এ শব্দটি এলো কোত্থেকে ? নিরুক্তবিদ্যা বলে এটি এসেছে সংস্কৃত *বিন্দু* থেকে । *বিন্দু* থেকে প্রথমে এসেছে *বুঁদ* (অর্থ *ফোঁটা*, যেমন আমরা পাই বুঁদবুঁদ), *বুঁদ* থেকে এসেছে *বুঁদিয়া* বা *বুঁদী*, এবং *বুঁদিয়া* বা *বুঁদী* রূপান্তরের মাধ্যমে প্রথমে *বোঁদে*, পরে *বুন্দা* এবং সবশেষে হয়েছে *বুরিন্দা* । *বুরিন্দা* -র উৎপত্তির ধারাটি নিম্নরূপে দেখানো যায় ঃ

বিন্দু → বুঁদ → বুঁদিয়া/বুঁদী → বোঁদে → বুন্দা → বুরিন্দা [৩]

কখন ও কিভাবে একটি শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টির পর থেকে শব্দটির ভাগ্যে কি ঘটেছে নিরুক্তবিদ্যা তা উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয় । অন্য কথায়, তার কাজ শব্দের ব্যুৎপত্তির ঠিকুজি রচনা করা । প্রাচীন ভারতের

[৩] সূত্র : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৮৫), *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি* পৃঃ ১৭৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাবিজ্ঞানীরা নিরুক্তবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বেদের বাণী বিশ্লেষণে যাস্ক লিখেছিলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ *নিরুক্ত* যা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার জন্য আজও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বৈয়াকরণদের প্রশংসা কুড়ায় (Lepschy 1994:31; Varshney 1993: 386)।

অভিধানবিদ্যা ঃ অভিধানবিদ্যা হচ্ছে শব্দ সংগ্রহ, বিন্যাস ও তাদের অর্থ বর্ণনার কাজ। হাওয়ার্ড জ্যাকসন (১৯৮৮ ঃ ২৩৯-২৫০) লক্ষ্য করেন যে অভিধানবিদ্যা তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ প্রথমত, এটি অভিধান সংকলনের মূলনীতিসমূহ বোঝাতে পারে ; দ্বিতীয়ত, এটি অভিধান সংকলনের প্রক্রিয়াকে বোঝাতে পারে ; তৃতীয়ত, এটি অভিধান সংকলনের পেশাকে বোঝাতে পারে। আমাদের কাছে তৃতীয়টির চেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয়াটির আবেদন বেশি। অভিধান সংকলনের কতগুলি ধাপ রয়েছে, যেমন প্রথমে ভাষার নমুনা সংগ্রহ করতে হয়, তারপর সেখান থেকে শব্দ বাছাই করতে হয়, শব্দগুলোকে অক্ষরক্রমে সাজাতে হয় এবং সবশেষে তাদের উচ্চারণ ও অর্থ লিপিবদ্ধ করতে হয়। নিরুক্তবিদ্যা যেখানে শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় করে, অভিধানবিদ্যা সেখানে শব্দের অর্থের বিবর্তন অনুসন্ধান করে। অভিধানবিদ্যা দেখায় ঐতিহাসিকভাবে একটি শব্দের অর্থের কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন ইংরেজী gig শব্দটির কথা ধরা যাক। ঐতিহাসিকভাবে এটি অন্ততঃ সতেরোবার অর্থ পরিবর্তন করেছে (Billard and Jenkinson 1967: 69-70)। The Oxford English Dictionary বিভিন্ন সময়ে শব্দটির অর্থের পরিবর্তন নথিভুক্ত করেছে। পরিবর্তনের ধারাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

মধ্যযুগীয় ইংরেজী — ঘোরে এমন কিছু
১৬৫১ — চাবুক ঘোরানো
১৬৯৩ — এদিক ওদিক নড়া
১৭২২ — মাছ মারার টেটাবিশেষ
১৭৭৭ — অদ্ভুত ব্যাপার
১৭৭৭ — আনন্দ বা উল্লাস
১৭৮০ — চপলা মেয়ে
১৭৮৯ — কাপড়কে নরম ও পশমী বানানো
১৭৯০ — হালকা চ্যাপটা নৌকাবিশেষ
১৭৯১ — এক ঘোড়ায় টানা হালকা দুই চাকার গাড়ি
১৮০৭ — উক্ত গাড়িতে ভ্রমন করা
১৮১৬ — টেটাজাতীয় বস্তু দিয়ে মাছ শিকার করা
১৮২১ — মজা বা কৌতুক
১৮৬৫ — এক ধরনের বাইচের নৌকা
১৮৭৫ — সামনে বা পিছনে যাওয়া
১৮৮১ — খনিতে কাজ করার কাঠের বাক্সবিশেষ
১৯০০ — বিদ্যালয়ে বা সেনাবাহিনীতে নিয়মের সামান্য লঙ্ঘন
বর্তমান — আধুনিক জনপ্রিয় গানের গায়ক বা গায়কদল বা তাদের পরিবেশনা

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান সংকলন নিঃসন্দেহে একটি আয়াসসাধ্য শিল্পকর্ম । স্যামুয়েল জনসন (Dictionary of the English Language), এ. এইচ. মুরে (Oxford English Dictoinary), টম ম্যাকআর্থার (Longman Lexicon of Contemporary English), প্যাট্রিক হ্যাঙ্কস (Collins English Dictionary), নোয়া ওয়েবস্টার (Webter's Dictionary) প্রমুখ পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ অভিধান সংকলক হিসাবে অমর হয়ে আছেন । বাংলা ভাষার ভূখন্ডে রাজশেখর বসু, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, আশুতোষ দেব প্রমুখ অভিধান সংকলন করে খ্যাতিমান হয়েছেন ।

শব্দতত্ত্ব ঃ শব্দতত্ত্ব হচ্ছে শব্দের অর্থ ও ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা । শব্দতত্ত্ব কি বাগর্থবিদ্যার শাখা নাকি বাগর্থবিদ্যা শব্দতত্ত্বের শাখা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । স্টিফেন উলম্যান (১৯৫৭) মনে করেন বাগর্থবিদ্যা শব্দতত্ত্বের অংশ । তিনি বলেন যে শব্দতত্ত্ব অর্থপূর্ণ একক তথা শব্দ ও শব্দগঠনকারী রূপমূল নিয়ে কারবার করে, ফলতঃ শব্দতত্ত্ব দুটি মৌলিক বিভাগ রূপতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে । কাজেই দেখা যায় উলম্যান এভাবে বাগর্থবিদ্যার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করেছেন – একে করে তুলেছেন শব্দতত্ত্বের অধীনস্থ । তদুপরি তিনি নিরুক্তবিদ্যাকেও অভিধানতত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করেছেন । উইট্রোড ডরোসজেউইস্কি শব্দতত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গেয়ে বলেছেন, শব্দতত্ত্ব হলো শব্দের অর্থ ও ব্যবহারের আলোচনা, শব্দভান্ডারের বিজ্ঞান ও অভিধান সংকলনের তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Howard Jackson 1988: 241) । শব্দতত্ত্বকে অভিধান সংকলনের ভিত্তি বলা হয়েছে কারণ শব্দতাত্ত্বিক সূত্র সমূহের প্রয়োগ হয় অভিধান প্রণয়ন ও সম্পাদনায় ।

ভাষাবিজ্ঞান ও বাগর্থবিদ্যা

ভাষাবিজ্ঞান ও বাগর্থবিদ্যা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ । অনেকেই মনে করেন বাগর্থবিদ্যা ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা এবং তদনুযায়ী তারা ভাষার বর্ণনায় অর্থকে অন্তর্ভূক্ত করেন । একসময় অবশ্য অনেকে মনে করতেন ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব এই তিনটি শাখার সমবায়ে ভাষাবিজ্ঞান গঠিত এবং এতে বাগর্থবিদ্যার কোন স্থান নেই । স্টিফেন উলম্যান বলেন, "ভাষা-সংশ্রয়ের মধ্যে অর্থের ভূমিকা এতোই মূলগত যে অর্থের পর্যেষণাকে অবশ্যই ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলির অন্যতম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে । কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ সংহতি কখনোই আমাদের অধিগত হবে না যতোদিন আমরা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের প্রথাগত ত্রিপাক্ষিক সঙ্কল্পনাকে আঁকড়ে থাকবো ।"[৩] উলম্যানের মতে, ভাষাকে তিনদিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে, অর্থগত দিক থেকে ও সম্পর্কগত দিক থেকে । এজন্য ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি শাখা হওয়া উচিত ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব । শব্দতত্ত্বের দুটি উপশাখা ঃ শাব্দিক রূপতত্ত্ব ও শাব্দিক বাগর্থবিদ্যা এবং বাক্যতত্ত্বেরও দুটি উপশাখা ঃ বাক্যিক রূপতত্ত্ব ও বাক্যিক বাগর্থবিদ্যা । এই বিভাজনের উপর যদি আমরা কালমাত্রা প্রয়োগ করি তাহলে পুরো ভাষাবিজ্ঞানের চেহারাটি দাঁড়াবে এরকম ঃ

---

[৩] স্টিফেন উলম্যান (১৯৫৭), *শব্দার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র* । অনুবাদ ঃ জাহাঙ্গীর তারেক (১৯৯৩), পৃঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

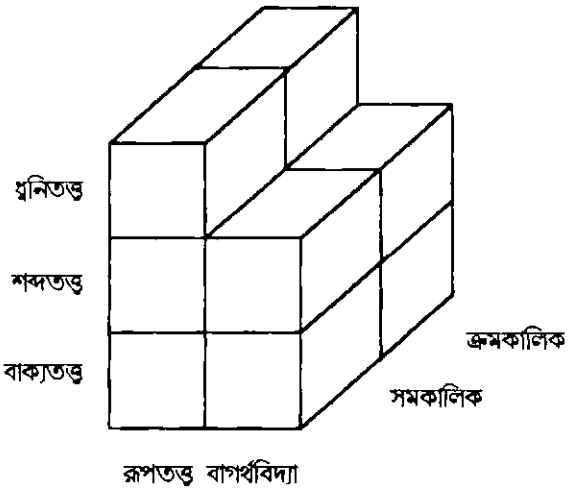

ভাষাবিজ্ঞানের ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনা

(Ullmann 1957: 39)

উলম্যানের মডেলকে আমরা যথার্থ মনে করতে পারি না । তিনি বাগর্থবিদ্যাকে শব্দতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের অংশবিশেষ রূপে চিত্রিত করেছেন যার ফলে বাগর্থবিদ্যার স্বাতন্ত্র্যিক মর্যাদা অবলুপ্ত হয়েছে । এটি কাঙ্ক্ষিত নয় । আমাদের প্রস্তাবনায় ভাষা পাঁচটি স্তরে বিশ্লেষিত হতে পারে ঃ ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক, সান্দর্ভিক ও বাগর্থিক । ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরে আলোচিত হবে ধ্বনির ভৌত ও বৃত্তিগত দিক, রূপতাত্ত্বিক স্তরে আলোচিত হবে শব্দের গঠন প্রণালী, বাক্যতাত্ত্বিক স্তরে আলোচিত হবে বাক্যের গঠন প্রণালী, সান্দর্ভিক স্তরে আলোচিত হবে সন্দর্ভের গঠন প্রণালী এবং বাগর্থিক স্তরে আলোচিত হবে অর্থ । বাগর্থবিদ্যাকে অর্থ আলোচনায় অন্যান্য শাখার উপর নির্ভর করতে হবে না । ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো বাগর্থবিদ্যার রয়েছে নিজস্ব এককসমূহ যা দিয়ে তা ভাষার অর্থ বিশ্লেষণ করবে । গ্রীনবার্গ (১৯৭১ ঃ ৫৩) এরকম নয়টি এককের কথা উল্লেখ করেন । এগুলো হলো – ১. রূপমূল অর্থ, ২. সাধিত শব্দার্থ, ৩. বাগধারা অর্থ, ৪. পরিস্থিতিপ্রসঙ্গ অর্থ, ৫. ভাষাপ্রসঙ্গ অর্থ, ৬. প্রাথমিক অর্থ একক (১-৩ একত্রে), ৭. শব্দগুচ্ছ অর্থ একক, ৮. বাক্যার্থ, এবং ৯. জাতিবাচক অর্থ (যেমন, *ছেলে* -এর অর্থ) । স্তরগত বিবেচনায় বাগর্থবিদ্যা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন । কালিক মাত্রাকে আপাতত বিবেচনার বাইরে রেখে আমরা আমাদের প্রস্তাবনাকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি ঃ

বিশ্লেষণের স্তর	*বিশ্লেষণের বিষয়*	*বিশ্লেষণের একক*	*শাস্ত্র*
ধ্বনিতাত্ত্বিক	ধ্বনির গঠন ও বৃত্তি	ধ্বনিমূল	ধ্বনিবিজ্ঞান/ধ্বনিতত্ত্ব
রূপতাত্ত্বিক	শব্দের সংগঠন	রূপমূল	রূপতত্ত্ব
বাক্যতাত্ত্বিক	বাক্যের সংগঠন	বাক্য	বাকফ্রতত্ত্ব
সান্দর্ভিক	অতিবাহ্যিক কাঠামো	অতিবাক্য	সন্দর্ভতত্ত্ব (প্রস্তাবিত)●
বাগর্থিক	অর্থের প্রকৃতি	অর্থমূল	বাগর্থবিদ্যা

● আমরা সন্দর্ভতত্ত্বের ইংরেজী প্রতিশব্দ বলেছি textcourse যা text+course সমন্বয়ে গঠিত একটি শঙ্করশব্দ । সন্দর্ভতত্ত্বে আলোচিত হবে বিভিন্ন genre -এর সংগঠন, যেমন সাধারণ কথোপকথন, শ্রেণীকক্ষের কথোপকথন, বক্তৃতা এবং সাহিত্য যেমন গল্প কবিতা প্রবন্ধের সংগঠন, cohesion, coherence ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই আমাদের প্রস্তাবিত মডেলে বাগর্থবিদ্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং এর কাজ শব্দতত্ত্ব বা বাকতত্ত্বের লেজুরবৃত্তি নয় । আমরা আমাদের মডেলকে নিম্নরূপ লেখচিত্রে প্রকাশ করতে পারি যা দেখতে অনেকটা মাকড়সার জালের মতো (আমরা এখানে ইংরেজী পদগুলো ব্যবহার করেছি পাঠকের সুবিধার্থে) ঃ

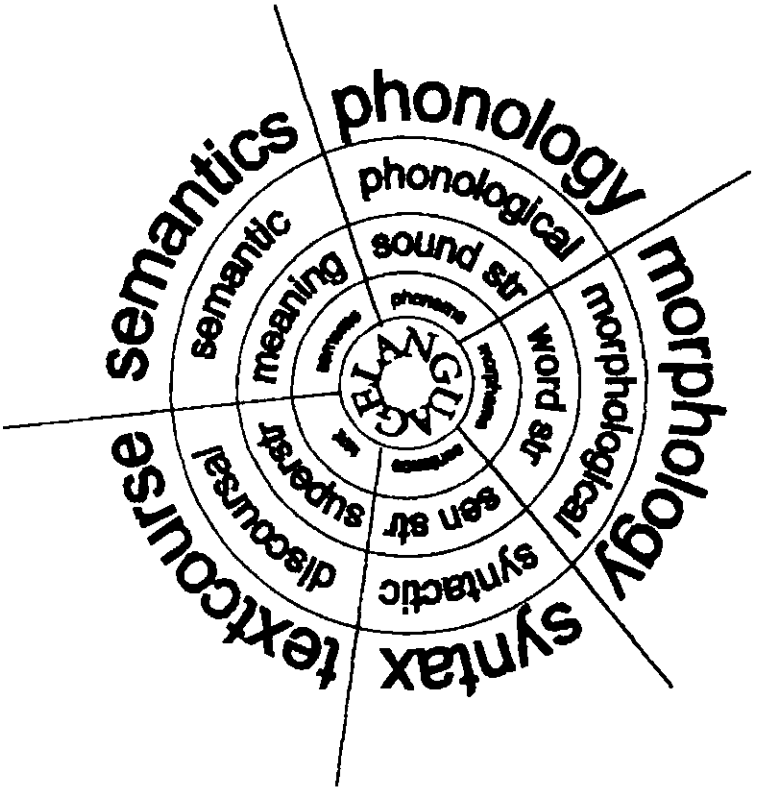

ভাষাবিজ্ঞানের লেখচিত্রীয় উপস্থাপনা

সংকেতবিজ্ঞান ও বাগর্থবিদ্যা

সংকেতবিজ্ঞান একটি ব্যাপক পরিসর শাস্ত্র ; এতে আলোচিত হয় সংকেত আদানপ্রদানের ক্রিয়াকৌশল । মানুষের ভাষিক যোগাযোগ সম্পন্ন হয় তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে । তথ্য আদানপ্রদানের প্রক্রিয়াটি এরকম ঃ প্রথমে বক্তা তার মনের ভাবকে বা বাণীকে ভাষায় সংকেতবদ্ধ করেন, তারপর তিনি তা উচ্চারণের মাধ্যমে ধ্বনিতরঙ্গে রূপান্তরিত করেন, সেই ধ্বনিতরঙ্গ শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছলে তিনি তার পাঠোদ্ধার করেন । প্রক্রিয়াটি এভাবে দেখানো যায় ঃ

বাণী → সংকেতবদ্ধকরণ → ধ্বনিতরঙ্গ → পাঠোদ্ধার → বাণী
বক্তা শ্রোতা

Dhaka University Institutional Repository

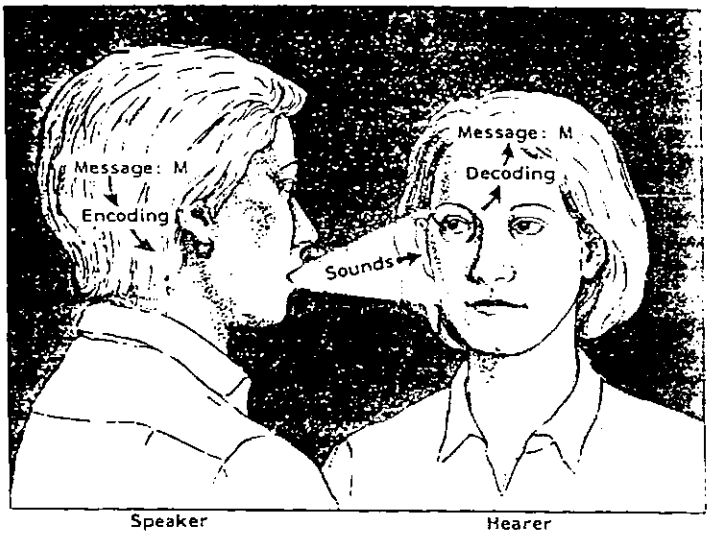

(আকমাজিয়্যান ১৯৯৫ ঃ ৩৪৬)

কিন্তু একজন ভাষাব্যবহারকরী শব্দের অর্থকে কিভাবে উপলব্ধি করে ? এ প্রশ্নের উত্তরে ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুর বলেন যে ভাষা ব্যবহারকারীর মনে থাকে ধারণা ও ধ্বনিমূর্তির সমন্বয়ে গঠিত **সংকেত** এবং এ সংকেতই তাকে শব্দের অর্থ উপলব্ধিতে সাহয্য করে । তিনি বস্তুর ধারণাকে বলেন **সংকেতিত** এবং ধারণা নির্দেশকারী ধ্বনিসমষ্টিকে বলেন **সংকেতক** । ভাষাব্যবহারকারী যখন সংকেতক ও সংকেতিতের মধ্যে সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন করেন তখনই তার মধ্যে কোন শব্দের অর্থের উপলব্ধি হয় । সোস্যুরের সংকেতের ধারণাকে নিম্নরূপে দেখানো যায় ঃ

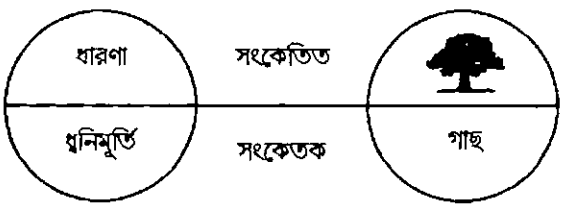

ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুরের সংকেত

এখানে একটি জিনিস পরিস্কার যে সোস্যুরের সংকেত জাগতিক বস্তু থেকে দূরে । তিনি শব্দের সাথে ধারণার সম্পর্কের কথা বলেন, কিন্তু ধারণা কিভাবে জাগতিক বস্তুর সাথে সম্পর্কিত সেকথা বলেন না । ফলে তার সংকেতের ধারণা অপূর্ণাঙ্গ এবং তা শব্দের অর্থকে যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না । অর্থকে যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করতে হলে জাগতিক বস্তুর সাথে ধারণার এবং ধারণার সাথে শব্দের সম্পর্ক দেখাতে হবে । ঠিক এই কাজটিই করতে সক্ষম হয়েছিলেন অগডেন ও বিচার্ডস । তারা দেখান যে জাগতিক বস্তু সরাসরি ধারণার সাথে এবং ধারণা সরাসরি ভাষিক প্রতীকের সাথে কারণিক সূত্রে যুক্ত, তবে ভাষিক প্রতীক ও জাগতিক বস্তুর সাথে কোন সরাসরি যোগাযোগ নেই । তারা ব্যাপারটিকে একটি *মৌলিক ত্রিভুজে* প্রদর্শন করেন যাকে পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞানীরা **সাংকেতিক ত্রিভুজ** বা **সংকেতায়নের ত্রিভুজ** নামে অভিহিত করেন । এটি নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

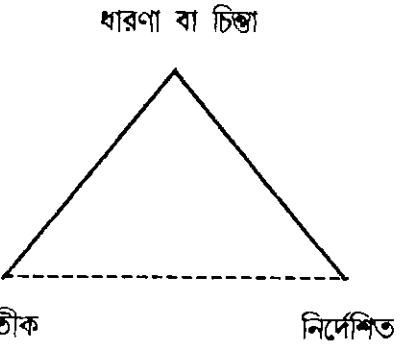

অগডেন ও রিচার্ডসের মৌলিক ত্রিভূজ

অগডেন ও রিচার্ডসের মতবাদ *আচরণবাদী ধারণার* (বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে) উপর প্রতিষ্ঠিত । এতে মনস্তাত্ত্বিক সত্তা তথা ধারণা বা চিন্তার ব্যাপারটি যা প্রতীক ও নির্দেশিতের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ তা স্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত নয় । এতে বলা হয়েছে ভাষাব্যবহারকারীর মধ্যে চিন্তার উদয় হয় বাহ্যিক নিয়ামকের প্রভাবে, কিন্তু বাস্তবে বাহ্যিক নিয়ামকের প্রভাব আমাদের চিন্তায় সর্বদা উপস্থিত নয় । যাহোক, নানারূপ দুর্বলতা সত্ত্বেও অগডেন ও রিচার্ডসের মতবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরে, তা হলো ভাষা, চিন্তা ও জগত পরস্পরসম্পর্কিত ।

সংকেতবিজ্ঞান এভাবেই সংকেত বা প্রতীকের ধারণার মাধ্যমে অর্থ বিশ্লেষনের প্রয়াস পায় । কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সংকেতবিজ্ঞান কিভাবে আমাদের প্রস্তাবিত বাগর্থবিদ্যার সাথে যুক্ত ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমরা এরিখ ফ্রম (১৯৭৭ ঃ ৫৬-৬৩)-এর প্রতীকের ধারণা ও শ্রেণীবিভাগের সাথে পরিচিত হবো । তার মতে প্রতীক হলো এমন কিছু যা অন্য কিছুকে নির্দেশ (আমরা বলবো প্রতীকায়িত) করে । প্রতীক তিন শ্রেণীর ঃ সার্বজনীন, আকস্মিক ও প্রচলনির্ভর । সার্বজনীন প্রতীক হলো সেগুলো যাদের সাথে প্রতীকায়িতের একটি আন্তর সম্পর্ক বিদ্যমান । যেমন কান্না দুঃখের প্রতীক, হাসি সুখদ অনুভবের প্রতীক । এই প্রতীকগুলি সার্বজনীন, কারণ এগুলো সর্বত্র সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আকস্মিক প্রতীক হলো সেগুলো যাদের সাথে প্রতীকায়িত অনির্ধারিত সম্পর্কে আবদ্ধ । যেমন কারো কাছে ট্রাক ঘাতকের প্রতীক হতে পারে, কারণ তার ছেলে হয়ত ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে, আবার কারো কাছে এটি আশীর্বাদের প্রতীক হতে পারে কারণ এটি হয়ত তার শত্রুকে খতম করেছে । সবশেষে, প্রচলনির্ভর প্রতীক হলো সেগুলো যাদের সাথে প্রতীকায়িত প্রথাগত সূত্রে সম্পর্কিত । যেমন *বক* (ব-অ-ক) বললে আমরা এক ধরনের সাদা পাখিকে বুঝে থাকি । কিন্তু এর তো অন্য নামও হতে পারতো যেমন *লুতু, বিদৎ, সারেগামা* ইত্যাদি । তা হওয়া অসম্ভব ছিল না অথবা তাতে দোষেরও কিছু হতো না । কিন্তু অন্য কিছু না বলে কেন আমরা ঐ বিশেষ সাদা পাখিকে বক বলে ডাকি তার কারণটি প্রথাগত । প্রথাই ঠিক করে দিয়েছে আমরা কাকে কি নামে ডাকবো । এক্ষেত্রে প্রতীক ও প্রতীকায়িতের মধ্যে কোন আবশিক যোগাযোগ নেই । এদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে বলা যায়, সোস্যুরের ভাষায়, *যথেচ্ছ* । মানুষের ভাষা প্রচলনির্ভর প্রতীকের সমষ্টি যাদের বিশ্লেষণ ভাষাবিজ্ঞনের কাজ, অন্যজাতীয় প্রতীকসমূহের আলোচনা তার আওতাভুক্ত নয় । কাজেই সংকেতবিজ্ঞান যদি সমস্ত সংকেত বা প্রতীকের আলোচনা হয় আর ভাষাবিজ্ঞান যদি হয় বিশেষ ধরনের সংকেত বা প্রতীকের আলোচনা, তবে ভাষাবিজ্ঞান সংকেতবিজ্ঞানের একটি

Dhaka University Institutional Repository

শাখা । আবার যদি বাগর্থবিদ্যা ভাষাবিজ্ঞানের অংশ হয় তবে তা সংকেতবিজ্ঞানের শাখা নয়, একটি উপশাখা । ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যস্থতায় সংকেতবিজ্ঞান ও বাগর্থবিদ্যার সম্পর্কটি নিম্নরূপে দেখানো যায় ঃ

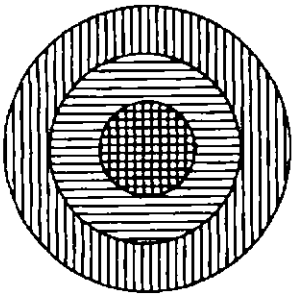

সংকেতবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও বাগর্থবিদ্যা

এখানে উলম্ব রেখাবিশিষ্ট বিশাল বৃত্তটি হলো সংকেতবিজ্ঞান, আনুভূমিক রেখাবিশিষ্ট মধ্যম বৃত্তটি ভাষাবিজ্ঞান এবং বর্গাকৃতি ঘরবিশিষ্ট ছোট বৃত্তটি বাগর্থবিজ্ঞান ।

আধুনিক বাগর্থবিদ্যা এবং তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি প্রসঙ্গ

আমরা *আধুনিক বাগর্থবিদ্যা ঃ তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি* শীর্ষক অভিসন্দর্ভের ভূমিকাংশের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, অথচ এখনো বলা হয়নি আধুনিক বাগর্থবিদ্যা বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি এবং এটি কিভাবে অনাধুনিক বা ঐতিহ্যবাহী বাগর্থবিদ্যার সাথে পার্থক্য সূচিত করে । বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুর[●] ভাষাবিজ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন – ক্রমকালিক ও সমকালিক । তিনি ঘোষণা করেছিলেন ক্রমকালিক নয়, সমকালিক মাত্রায় ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে সেই বিশ্লেষণ হয় বিজ্ঞানসম্মত । সেদিন থেকেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে এবং সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয় । সোস্যুরের বিভাজন সাধারণভাবে ভাষাবিজ্ঞানকে এবং বিশেষভাবে বাগর্থবিদ্যাকে প্রভাবিত করেছিল । সোস্যুরের ঘোষণায় বাগর্থবিদ্যাও আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেছিল এবং প্রচুর সন্দেহ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আধুনিক হওয়ার পথে পা বাড়িয়েছিল । কাজেই বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অনৈতিহাসিক ধারায় বাগর্থবিদ্যার যে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে **আধুনিক বাগর্থবিদ্যা** বলতে আমরা তাকেই বুঝবো । বিংশ শতাব্দীর সূচনাকেই আমরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী বাগর্থবিদ্যার বিভাজন রেখারূপে ধরে নিবো । ঐতিহাসিক পথ পরিত্যাগ করে বাগর্থবিদ্যা প্রথমে প্রবেশ করে সংগঠনবাদের চৌহদ্দিতে আচরণবাদের বলয়ে, কিন্তু এতে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই হয়েছে বেশি । আচরণবাদের ছত্রছায়ায় সংগঠনবাদ বাগর্থবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করার বদলে

[●] ফের্দিনঁ দ্য সোস্যুর নিজে কোন বই লিখে যাননি । তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ Course in General Linguistics (Cours de linguistique générale) প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর ১৯১৬ সালে । ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষকতাকালীন সময়ে প্রদত্ত তার প্রভাষণ থেকে ছাত্ররা যে নোট সংগ্রহ করেন বইটি তারই সম্পাদিত রূপ ।

Dhaka University Institutional Repository

করেছে রিক্ত, সুগঠিত করার বদলে করেছে পঙ্গু, শোভিত করার বদলে করেছে শ্রীহীন। বাগর্থবিদ্যা সেদিন এমন কানাগলিতে আটকে পড়েছিল যে তাকে অনেকে অবাঞ্ছিত ও পরিত্যাক্ত ঘোষণা করেছিল। এই কঠিন অবস্থা থেকে বাগর্থবিদ্যাকে মুক্তি এনে দেয় সঞ্জননবাদ। মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি এই শতাব্দীর মাঝামাঝি ঘোষনা করেন যে ভাষার সামগ্রিক সংগঠনে বাগর্থিক সংগঠনের একটি স্থান রয়েছে এবং সেই সংগঠনের স্বরূপ সন্ধান বাগর্থবিদদের কাজ। এরপর থেকে সঞ্জননী বাগর্থবিদগণ নানারকম তত্ত্ব দিয়ে বাগর্থবিদ্যাকে করে তোলেন প্রাণবন্ত ও মুখরিত। অন্যদিকে একদল দার্শনিক, যাদের মধ্যে ফ্রেজ, কারন্যাপ, টার্সকি, কোয়াইন, ডেভিডসন, মনটেগের নাম উল্লেখযোগ্য, দর্শনের সমস্যা সুরাহার প্রয়াসে ভাষার অর্থের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন। বাগর্থবিদ্যা আজ সত্যিকার অর্থে তাদের অবদানে ধন্য। আর একদল মনোবিজ্ঞানী অর্থের মানসিক রূপটি কেমন তা জানার প্রয়াসে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটন করেন। এখানেই শেষ নয়। সাধারণ ভাষা দর্শনের পথ ধরে ভিটগেনস্টাইন, অস্টিন, সার্ল, গ্রাইস প্রমুখ দার্শনিকগণ অর্থকে যোগাযোগের সমস্যারূপে চিহ্নিত করেন এবং তাদের প্রয়োগবাদী মতবাদের মাধ্যমে বাগর্থবিদ্যার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন। এভাবেই নানাবৃত্তে পাক খেয়ে বর্তমানে বাগর্থবিদ্যা তার স্বর্ণযুগে এসে পৌঁছেছে। আমরা বর্তমান অভিসন্দর্ভে এসবই আলোচন করবো যতদূর সম্ভব বর্ণনায় সারল্য বজায় রেখে। ভূমিকা ও উপসংহার বাদ দিলে অভিসন্দর্ভটিকে আমরা সহজে উপলব্ধ ছয়টি বৃহৎ অভিক্রম অনুসারে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছি ঃ (ক) ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যা, (খ) সাংগঠনিক বাগর্থবিদ্যা (গ) যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যা, (ঘ) জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যা (ঙ) রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যা এবং (চ) প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদ্যা। প্রথম ভাগটি যদিও আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী আধুনিক বাগর্থবিদ্যায় পড়ে না, তথাপি এটি যেহেতু অন্যান্য ধারার পূর্বগামী এবং অন্যান্য ধারার বিকাশে বিরুদ্ধ নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে সেজন্য আমরা সংক্ষেপে এর আলোচনা করবো যাতে পাঠক এর সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করতে পারেন এবং অন্যান্য ধারার সাথে এর মূলগত পার্থক্য তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যান্য বিভাগের ব্যাপারে আপত্তির কিছু নেই, এরা তাদের নিজগুণে আধুনিক বাগর্থবিদ্যায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য।

এবার তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি প্রসঙ্গে আসা যাক। তত্ত্বায়ন সমস্যার বিস্তারিত পরিচয় দেয়া এক কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ তত্ত্ব গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পরিকাঠামোর ভিতর। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, বিশ্লেষণ প্রণালী আলাদা। একেক তত্ত্ব নীতিগতভাবে একেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন সত্যশর্তমূলক কোন তত্ত্বের দৃষ্টি বাক্যের সত্যাসত্যের উপর নিবদ্ধ থাকে বলে তা যোগাযোগের সমস্যাকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আবার কোন প্রয়োগবাদী তত্ত্বের দৃষ্টি যোগাযোগের নিয়মনীতির উপর কেন্দ্রীভূত থাকে বলে তা ভাষা ও জগতের সম্পর্ককে পর্যাপ্তরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কাজেই যখন কোন তত্ত্ব আলোচনা করা হয় তখন সেই তত্ত্বের সমস্যাবলী আলোচনা করা সুবিধাজনক। আমরাও তাই করবো। তবে সব বাগর্থিক তত্ত্বই সাধারণভাবে কতকগুলি সম্যার সম্মুখীন হয়। আমরা এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি ঃ

প্রথমত, অর্থ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির। এর রয়েছে নানা অর্থ। একজন তাত্ত্বিক কোন্ অর্থ নিয়ে আলোচনা করবেন তা নির্ধারণ করা অনেক সময় কষ্টকর। আবার এক তত্ত্বে সমস্ত অর্থ আলোচনা করাও দুরূহ।

দ্বিতীয়ত, শব্দের যেমন অর্থ রয়েছে তেমনি অর্থ রয়েছে বাক্যের, বচনের, উক্তির ও সন্দর্ভের। বাগর্থবিদ এর যে কোনটির অর্থ বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে তাকে অন্যান্য ভাষিক উপাদানের অর্থের সাথে তার বিশ্লেষ্য উপাদানের অর্থের সম্পর্ক দেখাতে হবে যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল কর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, অর্থের সাথে মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়া, বিশেষতঃ স্নায়ুগত প্রক্রিয়াটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু মনোবিজ্ঞান এসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখনো সুনিশ্চিত উক্তি করার পর্যায়ে পৌঁছেনি বলে অর্থ সম্পর্কে কোন বিবৃত্তিও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থেকে যায়।

চতুর্থত, ভাষা ও জগতের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে এটি নিশ্চিত, কিন্তু জাগতিক পরিবেশ ভাষাকে কিভাবে ও কতটুকু প্রভাবিত করে এবং ভাষা মানুষের জাগতিক দৃষ্টিকে কিভাবে ও কতটুকু প্রভাবিত করে তা আজও রহস্যে ঢাকা ও বিতর্কের বিষয়। এ ব্যাপারে সাপির হোয়র্প প্রকল্প এবং প্রকল্পকেন্দ্রিক তর্কানুশীলন উল্লেখযোগ্য। এ অবস্থায় যে কোন বাগর্থিক তত্ত্ব অস্বস্তি বোধ করবে।

পঞ্চমত, বাগর্থিক তত্ত্বায়নের এখন পর্যন্ত কোন শক্তিশালী অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তত্ত্ব নির্মানের সময় বাগর্থবিদগণ তাদের গভীর অভিনিবেশ, উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে থাকেন যার ফলে চরিত্রগতভাবে তা হয়ে ওঠে ব্যক্তিনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠ বিবেচনার অভান এখনো বিষয়টির বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায়।

তত্ত্বায়নের সমস্যার ব্যাপারে আমরা প্রথমে যে কথাগুলো বলেছি তা মূলনীতির বেলায়ও প্রযোজ্য। একেক তত্ত্ব একেক মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই মূলনীতির আলোচনা তত্ত্বগুলোর আলোচনার সাথে হওয়া উচিত। আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হবে না। তত্ত্বালোচনর সময় আমরা প্রয়োজন অনুসারে কোন তত্ত্ব যে মুলনীতির উপর ভিত্তিশীল তা উল্লেখ করবো। কিন্তু যেখানে তাত্ত্বিক কাঠামোতেই মূলনীতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত, সেখানে তা অনুল্লেখ্য থাকতে পারে। আমরা এখানে একটি সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ করবো যেগুলি সব বাগর্থিক তত্ত্বকে মেনে চলা উচিত। আমাদের প্রস্তাবিত মূলনীতি সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) ভাষার অবেকরকম অর্থ রয়েছে। বাগর্থিক তত্ত্বকে স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করতে হবে যে কোন্ বা কোন্ কোন্ অর্থ নিয়ে এটি আলোচনা করছে। যে তত্ত্ব যতো বেশি অর্থ ব্যাখা করতে পারে সে তত্ত্ব ততো বেশি শক্তিশালী বলে গণ্য হবে।

(২) অর্থ শব্দ, বাক্য ও সন্দর্ভ পর্যায়ে অবস্থান করে। এদের যে কোনটির অর্থ বিশ্লেষণের সময় বাগর্থিক তত্ত্বকে অন্যান্যগুলির অর্থের সাথে তার সম্পর্ক দেখাতে হবে। যে তত্ত্ব যতোবেশি ভাষিক উপাদানের অর্থ বিশ্লেষণে সক্ষম সে তত্ত্ব ততো বেশি সন্তোষজনক বলে গণ্য হবে।

(৩) বাগর্থিক তত্ত্বকে অভিজ্ঞতামূলকভাবে যাচাইযোগ্য হতে হবে। যে তত্ত্বের যাচাইযোগ্যতা কম সেটি দুর্বল তত্ত্ব।

(৪) বাগর্থিক তত্ত্বের নিজেকে সাংগঠনিকভাবে সুসংহত হতে হবে এবং তাকে আত্মবিরোধী হলে চলবে না।

(৫) দ্ব্যর্থকতা, বিরোধাভাস, অসামঞ্জস্য, সহনামিতা, প্রতিনামতা, উপনামিতা, প্রজ্ঞাপন, পূর্বধারণা, ইঙ্গিতার্থ এসব অর্থসম্পর্কসমূহ বিশ্লেষণে বাগর্থিক তত্ত্বকে পারঙ্গম হতে হবে। কম অর্থ সম্পর্ক বিশ্লেষণে সক্ষম তত্ত্ব অপূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হবে।

(৬) বাগর্থিক তত্ত্বকে ভাষা ও তার অর্থের সাথে জাগতিক ঘটনার সম্বন্ধ প্রদর্শন করতে হবে।

(৭) মানুষের ভাষিক আচরণের পরিব্যাপ্তি সমুদ্রতুল্য। যে বাগর্থিক তত্ত্ব যতোবেশি বাস্তবিক ভাষিক আচরণের সাথে খাপ খায় সে তত্ত্ব ততো বেশি গ্রহণযোগ্য।

(৮) একটি ভালো বাগর্থিক তত্ত্ব প্রচলিত তত্ত্বসমূহের দোষত্রুটি মুক্ত থাকে এবং অন্যান্য প্রতিযোগী তত্ত্বের তুলনায় তার সুবিধা প্রমান করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই নীতিমালাকে তত্ত্বের সুগঠিততার শর্ত বলা যেতে পারে । আমরা এই নীতিমালার আলোকে যে কোন বাগর্থিক তত্ত্বের সবলতা-দুর্বলতা বিচার করতে পারি এবং তার প্রেক্ষিতে তত্ত্বটির সফলতা-ব্যর্থতা পরিমাপ করতে পারি । প্রসঙ্গটি আমরা উপসংহারে পুনরুত্থাপন করবো ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যা

সময়ের স্রোতে শব্দার্থের যে পরিবর্তন ঘটে তার আলোচনা ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যার বিষয় । ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যা শব্দ ও তার অর্থের ইতিহাস অনুসন্ধান করে । এটি তাই শব্দার্থের ক্রমকালিক বিশ্লেষণ এবং সে অর্থে নিরুক্তবিদ্যার সমতুল্য । বাগর্থবিদ্যা বলতে একসময় লোক ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যাকেই বুঝতো । কিন্তু কালক্রমে বাগর্থবিদ্যা ক্রমকালিক অনুস্থাপন ত্যাগ করে সমকালিক অনুস্থাপনে প্রবেশ করেছে । ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যার মূল্য এখন কমে এসেছে এবং এটি নিরুক্তবিদ, শব্দতাত্ত্বিক ও অভিধান সংকলক ছাড়া অন্য কাউকে খুব একটা আকর্ষণ করে না । আমরা এ অধ্যায়ে শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা, কারণ ও প্রক্রিয়া আলোচনা করবো ।

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

অর্থ অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির । হামেশাই এটি পরিবর্তিত হয় (যেমন বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করে)। তবে কালিক অবস্থানে এর পরিবর্তন খুব দ্রুত নয়, বরং ধীর । অর্থের কিরকম পরিবর্তন ঘটবে তা আগে থেকে হিসাব করে বলা যায় না । *সময়* থেকে *ইক* প্রত্যয় যোগে গঠিত *সাময়িক* শব্দের অর্থ হয়েছে *স্বল্প সময়ের*, কিন্তু *কাল* থেকে *ইক* প্রত্যয় যোগে গঠিত *কালিক* শব্দের অর্থ *স্বল্প সময়ের* হয়নি । অর্থের পরিবর্তন ঘটে তার নিজস্ব নিয়মে, নিজস্ব ধারায় । আমরা শব্দার্থ পরিবর্তনের সাতটি ধারা খুঁজে পাই ঃ (১) **সম্প্রসারণ**, (২) **সংকোচন**, (৩) **উন্নতি**, (৪) **অবনতি**, (৫) **স্পর্শদোষ**, (৬) **স্থানান্তর** এবং (৭) **আরোপন** । নীচে উদাহরণের সাহায্যে এগুলো ব্যাখা করা হলো ।

সম্প্রসারণ ঃ একটি শব্দ আদিতে যে অর্থ প্রকাশ করতো পরবর্তীতে সেটি যদি তার চেয়ে অধিক অর্থ প্রকাশ করে, তবে বুঝতে হবে সেখানে অর্থের সম্প্রসারণ ঘটেছে । নীচে অর্থ সম্প্রসারণের কতগুলি বাংলা ও ইংরেজী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো ঃ

শব্দ	পূর্বের অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
কপাল	মুখমন্ডলের অংশবিশেষ	মুখমন্ডলের অংশবিশেষ / অদৃষ্ট
এঁঠো	মাখা বা ঘাটা	মাখা বা ঘাটা / যে অঙ্গ দিয়ে মাখা বা ঘাটা হয় / যে পাত্রে রেখে মাখা বা ঘাটা হয়
অসুখ	সুখের অভাব	সুখের অভাব / রোগ
অমানুষ	যা মানুষ নয়	যা মানুষ নয় / নির্দয় ব্যক্তি
thing[•]	আলোচনা	আলোচনাসহ যে কোন মূর্ত ও বিমূর্ত জিনিস
lovely	ভালবাসার যোগ্য (ব্যক্তি)	যে কোন প্রীতিকর ব্যক্তি বা বস্তু

[•] Manindra Nath Sinha, (1993), *A Handbook of English Philology*, p.79

Dhaka University Institutional Repository

butcher	কসাই	কসাই / যে কোন পাষন্ড ব্যক্তি
carry	গাড়িতে করে বহন করা	বহন করা

সংকোচন ঃ একটি শব্দ আদিতে যে অর্থ প্রকাশ করতো পরবর্তীতে সেটি যদি তার চেয়ে কম অর্থ প্রকাশ করে, তবে বুঝতে হবে সেখানে অর্থের সংকোচন ঘটেছে । নীচে অর্থ সংকোচনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো ঃ

শব্দ	পূর্বের অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
অন্ন	খাদ্য	ভাত (এক ধরনের খাদ্য)
মৃগ	পশু	হরিণ (এক ধরনের পশু)
শ্যাম্পু●	অঙ্গসংবাহন বা গাত্রমর্দন / সাবান বা অনুরূপ যৌতিবস্তু সহযোগে মাথা বা কেশ প্রক্ষালন	বিশেষ তরল পদার্থ দ্বারা মাথা বা কেশ যৌতকরণ
পইতা	পবিত্র (দ্রব্য)	ব্রাহ্মণের উপবীত
meat	খাদ্য	মাংস
doctor	যে কোন শাস্ত্রের পন্ডিত ব্যক্তি	ডাক্তারী শাস্ত্রজ্ঞ বা চিকিৎসক
girl	বালক বা বালিকা	বালিকা
undertaker	যে কোন কাজের উদ্যোগী ব্যক্তি	ডোম

উন্নতি ঃ কোন শব্দ যখন পূর্বের নিরপেক্ষ বা নেতিবাচক অর্থের বদলে নতুন ইতিবাচক অর্থ গ্রহণ করে তখন তার অর্থের উন্নতি ঘটে । যেমন ঃ

শব্দ	পূর্বের অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
সাহস	চুরি/ডাকাতি	নির্ভীকতা
জনক	জননক্রিয়ায় অংগ্রহণকারী	পিতা
nice	খুঁতখুঁতে	সুন্দর
pretty	বিরক্তিকর	সুন্দর
fame	বর্ণনা (ভালো বা মন্দ)	খ্যাতি
sturdy	কর্কশ	শক্তপোক্ত
knight	বালক	*নাইট* উপাবিধারী ব্যক্তি
martyr	নিহত	শহীদ

● দ্রষ্টব্য ঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৮৫), *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি*, পৃঃ ১১৬-১২২ । লেখকের মতে শব্দটি বুৎপত্তিগতভাবে ইংরেজী নয় । শব্দটি এসেছে হয় হিন্দি *চাপনা* ক্রিয়ার অনুজ্ঞা পদ *চাঁপো* থেকে অথবা সংস্কৃত *সংবাহ* থেকে ।

Dhaka University Institutional Repository

অবনতি ঃ কোন শব্দ যখন পূর্বের নিরপেক্ষ বা ইতিবাচক অর্থের বদলে নতুন নেতিবাচক অর্থ গ্রহণ করে তখন তার অর্থের অবনতি ঘটে । যেমন ঃ

শব্দ	পূর্বের অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
নাগর	নাগরিক	লম্পটপ্রেমিক
প্রেত	আত্মা	ভূত
sensual	ইন্দ্রিয়মূলক	যৌনমূলক
vice	ত্রুটি	পাপ
silly	আশীর্বাদপ্রাপ্ত / সুখী	বোকা
knave	ছেলে	দুষ্ট ছেলে
base	উচ্চবংশীয়	অনৈতিক
minion	প্রেমাস্পদ	চাকর

স্পর্শদোষ ঃ অন্য শব্দের প্রভাবে বা উচ্চারণ দোষে শব্দ ও তার অর্থের যে অযাচিত পরিবর্তন ঘটে তাকে স্পর্শদোষ বলে । মদখোরকে মাতাল বলা হয় । সে অনুযায়ী চা-খোরকে অনেকে ঠাট্টা করে *চাতাল* বলে থাকেন । কাঠমিস্ত্রীরা কাঠের জোড়াকে বলে থাকেন *রিপিট,* অথচ শব্দটি ইংরেজী rivet । সিগন্যাল (signal) -কে *সিঙ্গেল* (single!) এবং রিক্সা (rickshaw)-কে *রিস্কা* বললেও স্পর্শদোষ ঘটে । আমেরিকার *হলিউডের* নামানুসারে বম্বে, টালিগঞ্জ ও ঢাকা চিত্রজগতের নাম হয়েছে যথাক্রমে *বলিউড, টালিউড* ও *ঢালিউড* । ইংরেজীতে যাকে স্পুনারিজম বলা হয় তা-ও এক ধরনের স্পর্শদোষ । স্পুনারিজমের প্রভাবে *এক কাপ চা* হয়ে যেতে পারে *এক চাপ কা* ।

স্থানান্তর ঃ কোনরূপ সাদৃশ্য বা সান্নিধ্যের কারণে এক শব্দে যখন আরেক শব্দের অর্থ প্রযুক্ত হয় তখন তাকে স্থানান্তর বলে । যেমন ইংরেজীতে tongue অর্থ জিহবা, কিন্তু জিহবা দ্বারা ভাষা উচ্চারিত হয় বলে tongue বললে এখন ভাষাও বোঝায় । *বিছা* এক ধরনের লম্বাটে পত্রভোজী কীট, কিন্তু দেখতে এর মতো বলে মেয়েদের কোমরে বাধার অলংকার বিশেষের নাম হয়েছে বিছা ।

আরোপন ঃ একটি শব্দ যখন অন্য শব্দকে দখল করে নেয় অর্থাৎ এক শব্দের অর্থ যখন অন্য শব্দের উপর আরোপ করা হয়, তখন তাকে আরোপন বলে । যেমন *মাস্তান* শব্দের মূল অর্থ খোদাপ্রেমিক কিন্তু এখন তার উপর নতুন অর্থ আরোপ করা হয়েছে *গুন্ডা* বা *সন্ত্রাসী* (মাস্তানি আর কাকে বলে !) । *বুজরুকি* শব্দটি এসেছে ফারসী *বুজর্গ* শব্দ থেকে যার অর্থ মুরুব্বী, কিন্তু এখন *বুজরুকি* বললে আমরা *ভন্ডামিকে* বুঝি (ঐতিহাসিক ভন্ডামি !) । *হঠাৎ* সংস্কৃতে বুঝায় *অবিমৃশ্যকারিতাবশত,* আর বাংলায় আমরা তাকে ব্যবহার করি *অকস্মাৎ* অর্থে ।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা যেমন বিচিত্র, শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণও তেমনি বহুমুখী । আমরা শব্দার্থ পরিবর্তনের মোটামুটি নয়টি কারণ খুঁজে পাই ঃ (১) কালপ্রভাব, (২) সামজিক পরিবেশ, (৩) সৌজন্য ও শিষ্টাচার, (৪) অন্ধসংস্কার, (৫) ভাবাবেগ, (৬) অনবধানতা, (৭) সৃজনশীলতা, (৮) অস্পষ্টতা এবং (৯) আলংকারিক প্রয়োগ । নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।

কালপ্রভাব ঃ সময় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপর তার চলার ছাপ রেখে যায় । শব্দ এবং অর্থও তার বাইরে নয় । সময় চলে যায়, সময়ের সাথে অনেক শব্দও হারিয়ে যায় অতীতের গর্ভে কিন্তু থেকে যায় তার চিহ্ন পথের ধুলির মতো । মমতাজ হারিয়ে যায়, তবু কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাজমহল । আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে পারি ঃ

একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন গৌবব ধনমান ।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ বাসনা ।

কড়ির প্রচলন না থাকলেও এখনো আমরা বলি *টাকাকড়ি, পয়সাকড়ি* । আমরা সবাই নিজেদের স্বার্থ ষোল আনা চাই, কিন্তু *আনা* কি আর এখনো আছে ? পৃথিবীর সব শব্দের পরিবর্তনই কালে সম্পাদিত হয় । কালকে তাই আমরা অর্থ পরিবর্তনের কারণ রূপে চিহ্নিত করলেও এটি আসলে অর্থ পরিবর্তনের একটি অনুঘটক । সরাসরি এটি পরিবর্তন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না, তবে এর উপস্থিতিতে পরিবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ।

সামাজিক পরিবেশ ঃ সামজিক পরিবেশ অর্থ পরিবর্তনের কারণ হিসাবে কাজ করতে পারে । আমাদের সমাজে বিবাহিত নর-নারী *বাবা-মা* বলতে শুধু জনকজননীকে বোঝেন না, শ্বশুর-শ্বাশুরীকেও বোঝেন এবং অনেকে সে অনুযায়ী সম্বোধন করেন । বিদায়ের সময় আমরা কখনোই বলিনা *যাও* বরং বলি *আসো* । অঞ্চল প্রভারে অর্থের পরিবর্তন হয় । মান বাংলায় *টোকানো* বলতে কোনকিছু কুড়ানো বুঝায়, কিন্তু নোয়াখালী অঞ্চলে এটি কাউকে খোঁজা অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

সৌজন্য ও শিষ্টাচার ঃ সৌজন্য ও শিষ্টাচারবশতঃ শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে । কাউকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর সময় বাড়িতে পোলাও-কোর্মার আয়োজন হলেও আমরা বলি *ডালভাত রান্না হয়েছে* এবং একগাদা ভাতকেও আমরা *চারটা ভাত* বলতে কুণ্ঠাবোধ করি না । বিশাল অট্টালিকায় বাস করলেও এবং পায়ের ধুলি না থাকলেও আমরা বলি *আমার কুটিরে পদধুলি দেবেন* । ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দেয়ার ইচ্ছা থাকলে আমরা সৌজন্য সহকারে বলি *মাফ করো* । বৈষ্ণবীয় বিনয়ের কথা আমরা অবগত আছি । বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর *দাসানুদাস*, গুরুর *চরনামৃত* তাদের কাছে *পরম প্রসাদ* । মুসলমানী আদবকায়দাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তাদের কাছে অন্যের বাড়ি *দৌলতখানা* কিন্তু নিজের বাড়ি *গরীবখানা* । তারা বক্তা হিসাবে *আরজি* করেন, কিন্তু শ্রোতা হিসাবে *ফরমাশ* করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধসংস্কার ঃ অন্ধসংস্কার হেতু অর্থের নানারূপ পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছুকে বোঝানোর জন্য প্রচলিত শব্দটি ছাড়া অন্য শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে । যেমন সন্ধ্যার পর *ধুপ* বলা যাবে না, দোকানীর কাছে গিয়ে বলতে হয় *ধোঁয়া* । রাত্রি কালে অনেকে *সাপ* বলেন না, *লতা* বলেন । ভয়বশতঃ সুন্দরবনের লোকেরা *বাঘকে শেয়াল* বলে, আবার অন্যত্র বলে *দক্ষিণ রায়* । বসন্ত রোগ হলে হিন্দুরা বলে *মায়ের দয়া হয়েছে* এবং সধবা হিন্দুনারী শাঁখা খুলে রাখেন না, *ঠান্ডা করে রাখেন* । ঘরে চাল না থাকলে কেউই বলেন না *চাল নেই* বলেন *চাল বাড়ন্ত* । *ভাঁড়ে মা ভবানী* কথাটি মনে হয় এই সংস্কার থেকেই এসেছে । বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শব্দ প্রয়োগের নিষেধকে ইংরেজীতে বলা হয় taboo । সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন আমেরিকায় ট্যাবুর কারণে cock এর পরিবর্তে প্রচলিত হয়েছে rooster ●।

ভাবাবেগ ঃ মানুষের আবেগ বা ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস থেকেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে । ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাবের আতিশয্য থাকলে মানুষ উচ্ছ্বাসপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করে । যেমন *মারাত্মক খেলোয়ার, অসম্ভব কথা, অদ্ভুত ছবি, ভীষণ মেধাবী, ভয়ংকর সমস্যা, ফাটাফাটি অবস্থা* প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে শব্দের সহাবস্থান ব্যাকরণিক দৃষ্টিতে সন্দেহজনক হলেও আবেগের উচ্ছ্বাসে সেগুলো উৎরে যায় । আমরা বলি *দারুন রান্না হয়েছে, দারুন খাওয়া হলো;* কিন্তু রান্না ও খাওয়া কিভাবে দারুন হয় তা বোধগম্য নয় । *খোদার কসম; মা-কালীর দিব্যি* কিংবা *পিটিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো* প্রভৃতি কথায় আক্ষরিক অর্থের চেয়ে আবেগাত্মক অর্থটাই প্রধান হয়ে উঠে । প্রেমের বুলি যে ভাবাবেগের বিরাট উৎস্য তা কে না জানে ঃ

তোমার আমার জীবন বীণা এক তারেতে বাঁধা
তুমি আমার কৃষ্ণ ওগো, আমি তোমার রাধা ।

অনবধানতা ঃ অসাবধানতা কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ শব্দের নানারকম অপপ্রয়োগ ঘটে এবং অনেক অপপ্রয়োগ কালক্রমে নিয়মবদ্ধ প্রয়োগে পরিণত হয় । বাংলা ভাষায় *সুতরাং, তথাচ, হঠাৎ* প্রভৃতি শব্দ এসেছে সংস্কৃত থেকে অপপ্রয়োগের পথ ধরে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না আমার তাকে *নাস্তিক* বলি । কিন্তু এর আসল অর্থ ছিল *যে দেশাচার মানে না* । আগে *পাষন্ড* বলতে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোঝাত, কিন্তু এখন পাষন্ড বলতে বুঝায় *নিষ্ঠুর* । লোকে বেগমফুলি, শেওড়াফুলি প্রভৃতির সাদৃশ্যে *পায়রাফুলি*কে এক প্রকার অপরিচিত ফুল বলে মনে করে । কিন্তু বস্তুতঃ তা নয় । শব্দটি ইংরেজী pineapple এর অপভ্রংশ । armchair -কে বাংলায় অনেকে *আরাম কেদারা* বলে থাকেন । chair না হয় *কেদারা* হলো কিন্তু arm *আরাম* হবে কেন ? (চেয়ারে হাত বুলালে আরাম পাওয়া যায় সেজন্য ?) ইংরেজীতে দেখা যায় অনেকে disinterested (নিরপেক্ষ)-কে uninterested (অনাগ্রহী) অর্থে এবং infer (অনুমান করা)-কে imply (ইঙ্গিতে বোঝানো) অর্থে ব্যবহার করে থাকেন । অনবধানতা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে পারে । যখন কোন ব্যক্তির আচরণে অনবধানতা চরম পর্যয়ে পৌঁছায় তখন তা একটি মানসিক সমস্যারূপে চিহ্নিত হয় । এই অবস্থায় শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং তা প্রথাগত অর্থকে অবজ্ঞা করে । মেলভিন ম্যাডক্স (১৯৭৭ ঃ ২৭) এ ধরনের মানসিক সমস্যাকে বলেন **অর্থবোধলোপ** ।

● দ্রষ্টব্য : Peter Trudgill (1983), *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*, p. 31

Dhaka University Institutional Repository

সৃজনশীলতা ঃ অনেক সময় কবি সাহিত্যিকরা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন অথবা শব্দের উপর নতুন অর্থ প্রযুক্ত করেন । যেমন *বারুণী* বলতে এক প্রকার মদ বা পশ্চিমদিককে বোঝায়, কিন্তু শ্রুতিমধুর বলে মধুসূদন একে *বরুণ(দেবতা)-র স্ত্রী* অর্থে প্রয়োগ করেছেন । *প্রদোষ* শব্দের অর্থ সন্ধ্যা কিন্তু উষাকাল অর্থেও রবীন্দ্রনাথ ঐ শব্দ ব্যবহার করেছেন । জানালা ও বাতায়নের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ 'জাল নির্মিত অয়ন' এই ব্যাসবাক্য যোগে *জালায়ন* শব্দ তৈরী করেছিলেন । সৃজনশীল স্বেচ্ছাচারিতা সবসময় নিন্দনীয় নয় । এভাবে ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে থাকে । এই প্রসঙ্গে মাইকেলী ধাতুর কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় ।

অস্পষ্টতা ঃ অস্পষ্টতাও অনেক সময় শব্দার্থ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে । যেমন *বিলাত* শব্দের অর্থ বিদেশ । সে থেকে তা ইংল্যান্ড ও আরেকটু ব্যাপকভাবে ইউরোপকে বুঝায় । আবার বিলাতী জিনিষ বললে আমরা প্রধানত ব্রিটিশ দ্রব্যকে বুঝে থাকি । জাপানী জিনিস বিলাতী নয়, কিন্তু টমেটোর নাম বিলাতী বেগুণ । বক্তৃতার সময় নেতারা বলে থাকেন *ভাইসব*, কিন্তু সভায় অনেক বোনও উপস্থিত থাকতে পারেন । *ভদ্রলোক* বলতে ঠিক কাকে বোঝায় তা স্পষ্ট নয় । ভালো পোষাক পড়লে, টাকা পয়সা থাকলে, শিক্ষিত হলে সে ভদ্রলোক আর লুঙ্গিপড়া গরীব নিরক্ষর ব্যক্তিটি অভদ্রলোক (কোন অভদ্রোচিত কাজ না করেও)?

আলংকারিক প্রয়োগ ঃ আলংকরিক প্রয়োগ শব্দের অর্থ পরিবর্তনের জন্য অনেকখানি দায়ী । কথাকে সুন্দর ও শিল্পময় করার জন্য অলংকারের প্রয়োগ হয়ে থাকে । অলংকার তাই সাহিত্যসৃষ্টির আবশ্যিক উপাদান । নীচে আমরা রূপক, অনুকল্প, প্রতিরূপক, অতিশয়োক্তি, সরলোক্তি, সুভাষণ, ব্যাজোক্তি প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর অলংকার নিয়ে আলোচনা করবো ।

রূপক ঃ কোন কিছুর অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য যখন তাকে অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা করা হয় তখন রূপক সৃষ্টি হয় । যেমন, আমরা বলি *পাহাড়ের পাদদেশ, নদীর মুখ, গাছের মাথা* – এখানে পাহাড়, নদী ও গাছের বিশেষ অংশকে মানুষের প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্যে নামকরণ করেছি, যদিও কড়াকড়ি অর্থে পাহাড়ের পা নেই, নদীর মুখ নেই ও গাছের মাথা নেই । এই ধরনের অর্থের পরিবর্তনকে বৈয়াকরণরা বলেন **রূপকগত প্রসারণ** । *দুঃখের সমুদ্র, স্মৃতির আকাশ, কল্পতরু* প্রভৃতিও রূপকের দৃষ্টান্ত । আকংকারিক পরিভাষায় এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদসম্পর্ক কল্পিত (দ্রষ্টব্য ঃ নরেন বিশ্বাস ১৯৮৮ ঃ ৮৪) । নজরুলের কবিতা থেকে রূপকের উদাহরণ দেয়া যায় ঃ

> একটি শুধু *বেদনা মানিক* আমার *মনের মণিকোঠায়*
> সেইত আমার বিজন ঘরে *দুঃখ রাতের* আঁধার ফুটায় ।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা থেকে রূপকের আরেকটি উদাহরণ ঃ

> বুড়োর *মুখটা চাষ করা রৌদ্র পড়া শীত বসন্তের কুঞ্চিত মাঠ*
> আসল যা জীবনের তারি ঘনতা ধরেছে ললাট ।

অনুকল্প ঃ অভিজ্ঞতায় সান্নিধ্য অথবা সাদৃশ্যবশতঃ এক বস্তুর নামকে যখন আরেক বস্তুর নামের স্থানে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে অনুকল্প বলে । *রবীন্দ্রনাথ পড়লুম, নজরুল পড়লুম* -এ ধরনের বাক্যে রবীন্দ্রনাথ নামটি দিয়ে বরীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং নজরুল নামটি দিয়ে নজরুলের সাহিত্য বোঝানো হচ্ছে । আমরা রিক্সাওয়ালাকে

Dhaka University Institutional Repository

বলি – *এই রিক্সা যাবে,* কিম্বা বাড়ির ভিতর থেকে মুরগি বিক্রেতাকে ডাক দিই – *এই মুরগি এখানে আসো* । অনুকল্প প্রভাবের জন্যই *চামচা* বা *ধামাধরা* বললে খোশামোদকারী ব্যক্তি, *কেউটে* বললে অনিষ্টকর ব্যক্তি বোঝায় । পায়ের *মল* দিয়ে যখন পায়ের মলের শব্দ বোঝানো হয় তখনও তাতে অনুকল্প অলংকারের প্রয়োগ ঘটে, যেমন ঃ

কে ঐ যায় তার পায়ের মল শোনা যায়
নিশিরাতে সে কার সাথে যে অভিসারে যায় ।

প্রতিরূপক ঃ অংশ দিয়ে যখন সমগ্রকে অথবা সমগ্র দিয়ে অংশকে বোজানো হয় তখন তাকে প্রতিরূপক বলে । যেমন *কালি* বললে শুধু কালো রঙকে না বুঝে আমরা যে কোন রঙের কালিকে বুঝে তাকি । *বাঈ* বললে আমরা বিশেষ নর্তকীকে বুঝে থাকি অথচ মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে *বাঈ* নারীদের উপাধিমাত্র । যখন আমরা *ভাত খাই* তখন ভাতের সাথে অন্য তরকারীও খাই । যখন *চা-চক্রে* সামিল হই তখন চায়ের সাথে বিস্কুট, সিঙ্গারা (এসবকেই কি *টা* বলে?) ইত্যাদিও চলে । একইভাবে *জলপান* মানে আমাদের কাছে শুধু জল বা পানি পান করা নয়, আরো কিছু ।

অতিশয়োক্তি ঃ বর্ণনার আতিশয্যকে অতিশয়োক্তি বলে । নরেন বিশ্বাসের মতে, কবি-কল্পনায় যখন বিষয় বিষয়ীর দ্বারা গ্রাসিত হয় অর্থাৎ উপমানের চরম প্রতিষ্টা হয়, তখন সৃষ্টি হয় অতিশয়োক্তি । *যে জলে আগুন জ্বলে* বললে আতিশয়োক্তি হয় কারণ জলের প্রজ্জ্বলন ক্ষমতা নেই । তবু কবি মনে হয় বিশ্বাস করিয়েই ছাড়বেন ঃ

সাগরে যে অগ্নি আছে কল্পনা সে নয়
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় । – সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অবিশ্বাস করার যো নেই, কারণ ঃ

অন্য দেশে অসম্ভব যা পূণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর সে । – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সরলোক্তি ঃ সরলোক্তি হলো মনের নেতিবাচক ভাবকে ভাষার বিশেষ কৌশলে দ্বৈত নেতিবাচক শব্দপ্রয়োগে প্রকাশ করা । যেমন, *সে দেখতে অতটা কুৎসিত নয়* বললে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোঝায় *সে খুব কুৎসিত* । ইংরেজী থেকে একটি উদাহরণ দিই । He's not the brightest man in the world বললে বোঝায় He's stupid.

সুভাষণ ঃ রূঢ়তা পরিহারের জন্য নেতিবাচক প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত কোন শব্দের পরিবর্তে যখন নতুন শব্দ প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে সুভাষণ বলে । যেমন, বঙ্গ সমাজে দাসীকে আদর করে ডাকা হয় *ঝি,* পাচককে ডাকা হয় *ঠাকুর* । *মারা গেছেন* খারাপ শোনায় বলে একে ঘুরিয়ে বলা হয় *পরলোকগমন করেছেন, দেহত্যাগ করেছেন, দেহরক্ষা করেছেন, ইন্তেকাল করেছেন, স্বর্গবাসী হয়েছেন, ধরাধাম বা ইহলোক ত্যাগ করেছেন* ইত্যাদি । ইংরেজীতেও তেমনি die -এর বদলে অনেক সময় নরম করে বলা হয় pass away ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাজোক্তি ঃ শব্দের যে আক্ষরিক অর্থ থাকে কৌশলে তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করাকে বলে ব্যাজোক্তি । যেমন *বুদ্ধির ঢেঁকি* বলে বোঝানো হয় বুদ্ধিহীনকে, *মহাবৈদ্য* বলে বোঝানো হয় অকর্মণ্যকে । *ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির* বলে আমরা গালি দেই, *অমুক লোকের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র* বলে আমরা ব্যঙ্গ করি । যারা *দুধের ধোয়া* তারাও *উত্তম মধ্যম* খেয়ে *শ্রীঘরে* যেতে পারেন । জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ব্যাজোক্তির সন্ধান মিলে ঃ

অদ্ভুত আঁধার এক নেমেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই প্রীতি নেই করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া ।

শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া

নামের সাথে যুক্ত থাকে অর্থ অথবা অর্থের সাথে যুক্ত থাকে নাম; নাম ও অর্থের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ফলেই শব্দার্থের উদ্ভব হয় । আর *যখনই কোন অর্থের সাথে নতুন নাম প্রযুক্ত হয় এবং/অথবা কোন নামের সাথে নতুন অর্থ প্রযুক্ত হয় তখনই শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে ।*[●] শব্দার্থ পরিবর্তনের এই সাধারণ সূত্রটি এবার ব্যাখ্যা করা যাক । সূত্রমতে কোন অর্থের সাথে নতুন নাম যুক্ত হতে পারে এবং কোন নামের সাথে নতুন অর্থ যুক্ত হতে পারে । অর্থ ও নামের এই মিথক্রিয়ার ফলে দুটি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে ঃ

(১) একটি অর্থ দুটি নাম এবং
(২) একটি নাম দুটি অর্থ ।

প্রথম অবস্থাকে বলে **সমনামিতা** এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে বলে **অনেকার্থকতা** । দুটি অবস্থাকে নিম্নরূপ লেখচিত্রে প্রকাশ করা যায় ঃ

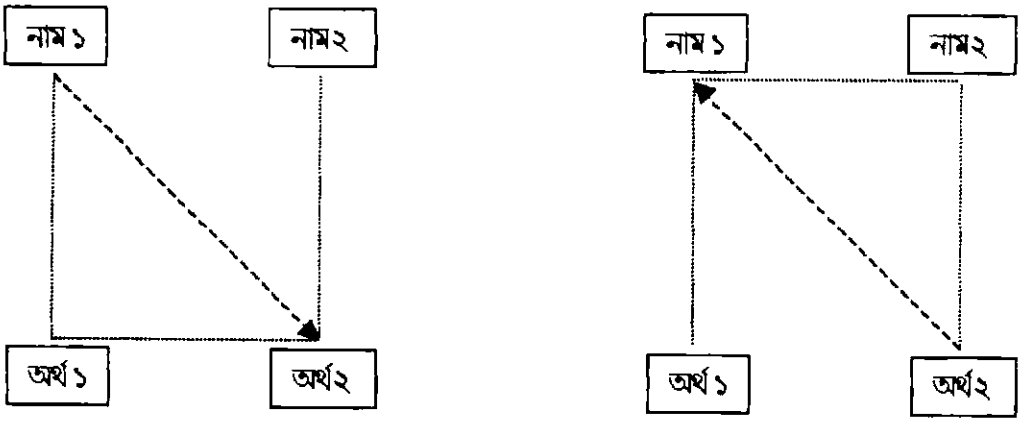

শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া

[●] "A semantic change will occur whenever a new name becomes attached to a sense and/or a new sense to a name." Stephen Ullmann (1957), *The Principles of Semantics*, p.171

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অবস্থা অর্থাৎ সমনামিতাকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় । যেমন মানুষ যে প্রত্যঙ্গ দিয়ে কাজ করে তার জন্য সংস্কৃত শব্দ ছিলো *হস্ত*, পরে প্রাকৃত ভাষা থেকে নতুন শব্দ আসলো *হাত* । ফলে একই জিনিস বোঝাতে দুটি নাম ব্যবহৃত হতে থাকলো । দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ অনেকার্থকতার উদাহরণ দেখা যায় এভাবে – প্রথমে *পরশু* শব্দটি কেবল *আগামী দিনের পরের দিনকে* বোঝাতো, কিন্তু কালক্রমে এটি *গতদিনের পূর্বের দিনকেও* বোঝাতে শুরু করে । উদাহরণের শব্দগুলোকে চিত্রে স্থাপন করলে দেখাবে এরকম ঃ

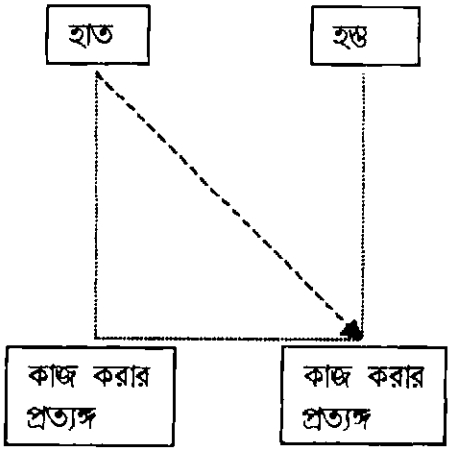

সমনামিতা

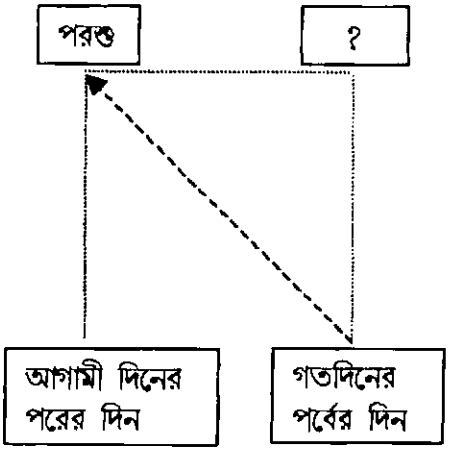

অনেকার্থকতা

এখানে অনেকার্থকতার ক্ষেত্রে আমরা জানি না *পরশু* নামের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে *গতদিনের পূর্বের দিন* এই অর্থের কোন নাম ছিল কি না । হয়তো নামের অভাবই অর্থটিকে *পরশু* শব্দের দিকে চালিত করেছে ।

সিফেন উলম্যান (১৯৫৭ ঃ ২২০) শব্দার্থের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত তালিকা পেশ করেন ঃ

ক. ভাষিক রক্ষনশীলতার দরুণ শাব্দার্থিক পরিবর্তন
খ. ভাষিক উদ্ভাবনার দরুণ শাব্দার্থিক পরিবর্তন
১. নামের স্থানান্তর ঃ
অ. অর্থের সাথে অর্থের সাযুজ্যের মাধ্যমে
আ. অর্থের সাথে অর্থের সামীপ্যের মাধ্যমে
২. অর্থের স্থানান্তর ঃ
অ. নামের সাথে নামের সাযুজ্যের মাধ্যমে
আ. নামের সাথে নামের সামীপ্যের মাধ্যমে
গ. যৌগিক পরিবর্তন

উলম্যান নাম ও অর্থের যে স্থানান্তরের কথা বলেছেন তাকে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে দেখানো যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

	ক সাযুজ্য	খ সামীপ্য
১ অর্থ	১ ক	১ খ
২ নাম	২ ক	২ খ

শাব্দার্থিক পরিবর্তনের ম্যাট্রিক্স

(জাহাঙ্গীর তারেক ১৯৯৮ ঃ ৪৩)

জাহাঙ্গীর তারেকের মতে, উলম্যানের এই শ্রেণীকরণ সংকেতায়ন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভূক্ত করে ঃ একদিকে সংকেতক (নাম)-সংকেতিত (অর্থ) এর দ্বিমেরুত্ব এবং অন্যদিকে প্রক্রিয়াটির মনো-অনুষঙ্গাত্মক প্রকৃতি, অনুষঙ্গবদ্ধ মানসচিত্রের সাযুজ্য বা সামীপ্য যার দ্বৈতরূপ এতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। *টুপি* শব্দটির দ্বারা ব্যাপরাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন ঃ

১ক. *পাগড়ি, হ্যাট, আমামা, শিরস্ত্রাণ* ইত্যাদি আমরা পাই অর্থের সাযুজ্যের মাধ্যমে ;
১খ. *মাথা, পাঞ্জাবি, পাজামা* ইত্যাদি আমরা পাই অর্থের সামীপ্যের মাধ্যমে ;
২ক. *টুলি, টুসি, কুপি, রুপি* ইত্যাদি আমরা পাই নামের সাযুজ্যের মাধ্যমে ;
২খ. *কিশতি টুটি, খেলো টুপি* ইত্যাদিতে *কিশতি, থাল* পাই নামের সামীপ্যের মাধ্যমে।

উলম্যান তার শ্রেণীকরণে ভাষিক রক্ষণশীলতার কথা বলেছেন। ভাষা সাধারণত তার নিজের শব্দাবলীকে ধরে রাখতে চায়। অনেক সময় শব্দটির রূপের পরিবর্তন হয় কিংবা শব্দের (অর্থাৎ নামের) উপর নতুন অর্থ প্রযুক্ত হয়, কিন্তু শব্দটি থেকে যায় ভাষার ভান্ডারে। যেমন, *ঘড়ি* (<ঘটি) বলতে ঘটির মধ্যে জল বা বালু দিয়ে নির্মিত সময় হিসাব করার যন্ত্রকে বোঝাতো। আজ ঘড়ির আকার আকৃতি উপাদান সবই পরিবর্তিত হয়েছে – আজ একে আমরা কব্জিতে বাঁধি, দেয়ালে ঝুলাই, তথাপি এর জন্য আমরা অন্য শব্দ ব্যবহার করি না, গতানুগতিকভাবে ঘড়িই ব্যবহার করি।

অর্থের সাথে অর্থের সাযুজ্যের মাধ্যমে নামের স্থানান্তর ঘটতে দেখা যায় প্রায়শই। অর্থের সাবুজ্য তিন ধরনের হতে পারে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) **সারাত্মক** ঃ দুটি জিনিসের মধ্যে মূলগত সাদৃশ্য ; যেমন *গাছের পাতা* ও *কাগজের পাতার* মধ্যে রূপ, বৃত্তি ও অবস্থানগত মিল । প্রাকৃতিক ঋতু সময়চক্রে ঘুরে ঘুরে আসে, নারীর যৌবনিক ঋতুও তেমনি সময়চক্রে আবর্তিত হয় । তাই কি কবি নারীকে ঋতুর সাথে তুলনা করেন ?

আমাদের জন্য উৎসব নিয়ে আসে সাতটি ঋতু
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এবং নারী ।

(খ) **সাংচেতনিক** ঃ এক ইন্দ্রিয়ের সংবেদনকে অন্য ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের সঙ্গে এক করে দেখা ; যেমন রঙের সঙ্গে ধ্বনি, গন্ধের সঙ্গে রঙ, ধ্বনির সঙ্গে গন্ধ এক সমতলে চলে আসতে পারে । অনেক সময় বলা হয় *সুন্দর গন্ধ* – গন্ধ কি চোখে দেখা যায় যে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যাবে ? শব্দ শ্রবনেন্দ্রিয়ের জিনিস, কিন্তু তা যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ক্রিয়া করে তবে তা হবে সাংচেতনিক । যেমন, সুকুমার রায়ের ছড়ায় আমরা পাই ঃ

রামছাগলের ভারী গলায় ভ্যা ভ্যা রবের ডাকে
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে ।

(গ) **আনুভূতিক** ঃ কোন অনুভূতিকে একটি মূর্ত বস্তুর সঙ্গে সমীভূত করে বস্তুটির গুণাবলী অনুভূতিটির উপর আরোপ করা ; যেমন *উষ্ণ অভিনন্দন, মধুর ভাষণ, বর্ণাঢ্য জীবন* ইত্যাদি । মূর্ত জিনিসের ওজন হয়, কিন্তু যদি বিমূর্ত জিনিসের ওজনের কথা বলা হয় তা হবে আনুভূতিক অর্থে । যেমন আমরা পাই *তিন মণ ওজনের ধাক্কা* ঃ

কটকের নেত্ত মজুমদার
সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার
কালু সিং দেয় তারে পাক্কা
তিন মণ ওজনের ধাক্কা ।

বিদেশী শব্দের সাদৃশ্যে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে । যেমন ইংরেজী bougainvillea শব্দের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ফুলের নামকরণ করেছিলেন *বাগানাবিলাস* । বিদ্যাসাগর university -র সাদৃশ্যে *বিশ্ববিদ্যালয়* শব্দ গঠন করেন । সুধীন্দ্রনাথ ইউরোপের ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সঙ্গে এদেশের ধ্রুপদ অঙ্গের গানের একটি সারূপ্য নির্ণয় করে classical অর্থে *ধ্রুপদী* শব্দটি চালু করেন । এখন আমরা *ধ্রুপদী নাচ, ধ্রুপদী সাহিত্য* প্রভৃতির কথাও বলে থাকি । বাংলা *আনারস* শব্দটি যে পর্তুগীজ *আনানস* শব্দ থেকে সাদৃশ্যকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তা পন্ডিত সমাজে সুবিদিত ।

অর্থের সাথে অর্থের সামীপ্যের মাধ্যমে নামের ভানান্তর ঘটতে পারে । দুটি অর্থের সামীপ্য স্থানিক, কালিক অথবা কারণিক হতে পারে ঃ

(ক) **স্থানিক** ঃ *বালাম* (<ফাঃ বুলন্দ) নামক নৌকায় পরিবাহিত হতো বলে বাংলায় এক ধরনের চালের নাম হয়েছে বালাম । সিন্ধু (আরবী উচ্চারণ হিন্দ) নদীর তীরে বসবাস করতো বলে ঐতিহাসিকভাবে ভারতবাসীদের নাম হয়েছিল *হিন্দু* (পরে *হিন্দু* হয়েছে বিশেষ সনাতন ধর্মাবলম্বী জাতি)।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) **কালিক** ঃ আরবী রমজান মাসে পালিত হয় বলে অনেকে সিয়াম বা রোজাকে *রমজান* বলে থাকেন (পার্বন অর্থে, যেমন রমজানের তাৎপর্য) । সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বলে হিন্দুদের বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠানের নাম *সন্ধ্যা আহ্নিক* ।

(গ) **কারণিক** ঃ মাথার চুলকে চিরে বলে বিশেষ কেশ বিন্যাসকারী পদার্থের নাম হয়েছে চিরুনী । কম্পিউট বা হিসাব করে বলে বিশেষ যন্ত্রের নাম হয়েছে কম্পিউটার ।

নামের সাথে নামের সাযুজ্যের মাধ্যমে অর্থের স্থানান্তর ঘটতে পারে, । যেমন আরবী *মুদ্দা* (উদ্দেশ্য বা অর্থ) শব্দের সঙ্গে *কথা* যোগ করে *মোদ্দা কথা* গঠিত হয়েছে যা উচ্চারণ সাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে *মোটা কথা* এবং পরে *মোট কথায়* । আবার নামের সাথে নামের সামীপ্যের মাধ্যমেও অর্থের স্থানান্তর ঘটে । *মর্তমান* শব্দের সাথে *কলা* শব্দটি এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে শুধু *মর্তমান* বললেই বিশেষ প্রকৃতির ফলকে বোঝায় । *গায়ে হলুদ* - এর জন্য শুধু *হলুদ* বলা যায় । দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি শব্দের সাথে এখন আর *পত্রিকা* শব্দটির উল্লেখের প্রয়োজন নেই । একটি অর্থের সাথে কেবল একটি নয়, একাধিক নাম এসে যুক্ত হতে পারে । যেমন একটি অর্থের সাথে তিনটি অর্থ কিভাবে যুক্ত হয় তা উলম্যান নিম্নরূপ চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন ঃ

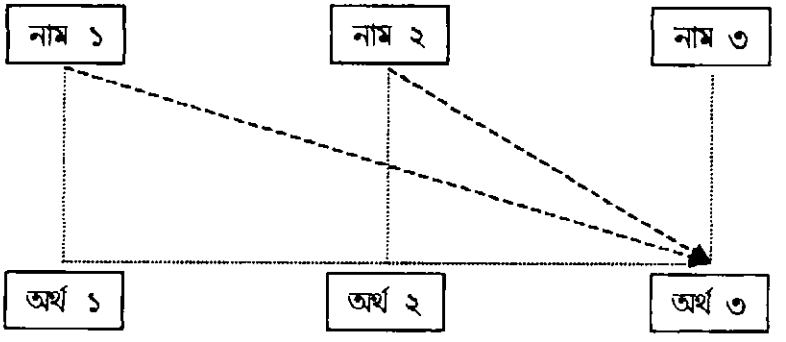

নামের স্থানান্তর প্রক্রিয়া

আমরা বাংলায় *গ্রন্থ, পুস্তক, বই* এই তিনটি শব্দ দিয়ে প্রক্রিয়াটির উদাহরণ দিতে পারি । শব্দগুলি চিত্রে বসালে হবে এরকম ঃ

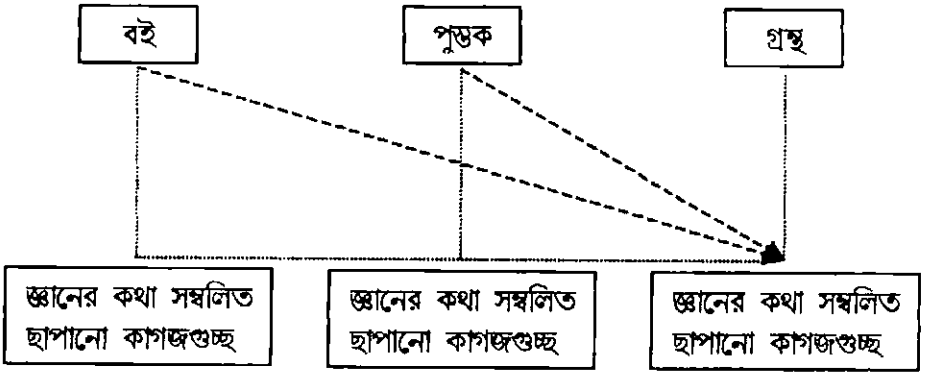

নামের স্থানান্তর প্রক্রিয়ার উদাহরণ

Dhaka University Institutional Repository

শব্দার্থের যৌগিক পরিবর্তন ঘটতে পারে নানাভাবে । যেমন, একটি অর্থের সাথে একত্রে অন্য একটি অর্থ ও নাম যুক্ত হতে পারে অথবা একটি নামের সাথে একত্রে অন্য একটি নাম ও অর্থ যুক্ত হতে পারে ইত্যাদি । একটি অর্থের সাথে অন্য একটি অর্থ ও নাম যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে উলম্যান দেখিয়েছেন এভাবে ঃ

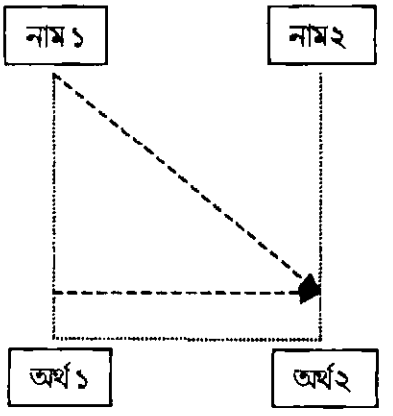

একটি অর্থের সাথে অন্য একটি
অর্থ ও নাম যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়াটিকে আমরা বাংলায় একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করতে পারি । বাংলায় *সধবা* শব্দটির উদ্ভব হয়েছে *বিধবা* শব্দের বৈপরীতে, যদিও বাংলায় *ধব* বলে কোন শব্দ নেই । এটি হয়েছে সপত্নীক, বিপত্নীক শব্দ দ্বয়ের সাদৃশ্যে বা প্রভাবে বা মধ্যস্থতায় । পরিস্থিতি আরো জটিল হয় যখন কাল্পনিক ধাতু *ধব* থেকে তৈরী হয় *বৈধব্য, ত্বৈধব্য* প্রভৃতি শব্দ ।

পরিবর্তনের ধারায় একটি নামের সাথে একত্রে অন্য একটি নাম ও অর্থের সংযুক্তি ঘটতে পারে । একটি নামের সাথে অন্য নাম ও অর্থ যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়টি উলম্যান দেখিয়েছেন এভাবে ঃ

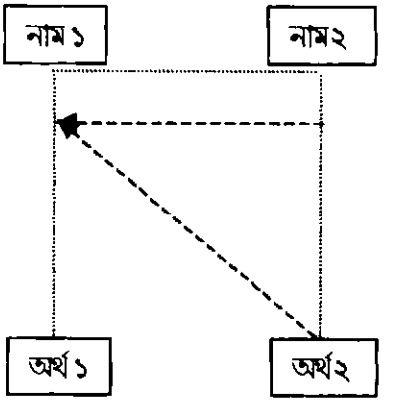

একটি নামের সাথে অন্য একটি
নাম ও অর্থ যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যায় । বাংলায় *নষ্ট* শব্দের অর্থ উলঙ্গ । ব্যুৎপত্তির দিকে তাকালে আমরা দেখি শব্দটি এসেছে *গ্যা* (সম্মানিত মহিলা) থেকে *নষ্যা* (প্রথমে অসম্মানিতা, পরে বেশ্যা ও উলঙ্গ) শব্দের পথ ধরে ।

এভাবেই দেখা যায় নাম ও অর্থ নানারূপ মিথক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ঐতিহাসিক ধারায় শব্দার্থের বহুবিচিত্র পরিবর্তন ঘটায় ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাংগঠনিক বাগর্থবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিক বাগর্থবিদ্যা

সোস্যুরের তত্ত্বায়নের পর থেকে বাগর্থবিদ্যা ঐতিহাসিক ধারা থেকে বেড়িয়ে আসে এবং সংগঠনবাদের চৌহদ্দীতে প্রবেশ করে নিজেকে বিজ্ঞান বলে দাবি করতে থাকে । ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড মনোবিজ্ঞান থেকে আমদানি করেন আচরণবাদ । কিন্তু আচরণবাদ বাগর্থবিদ্যার জন্য কল্যানকর হয়নি । উদ্দীপক-সাড়ার মাধ্যমে অর্থব্যাখ্যার প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন বাগর্থবিদ্যার জন্য এক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে । অনেকেই ভাষার অর্থ বিশ্লেষণ থেকে নিরস্ত হলেন এই মনে করে যে অর্থের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব নয় । ফলে বাগর্থবিদ্যা একদিক থেকে নির্বাসিত হলো ভাষাবিজ্ঞান থেকে । তথাপি বাগর্থবিদ্যার অগ্রগতি থেমে থাকেনি । অগডেন ও রিচার্ডস, অসগুড ও সুকি, নিডা, ফিলমোর প্রমুখের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় বাগর্থবিদ্যা অগ্রগতির পথে তার যাত্রা রেখেছে অব্যাহত । এ অধ্যায়ে আমরা অর্থের বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক আলোচনা করবো, যেগুলো বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ।

ঔপাদানিক বিশ্লেষণ

কোন শব্দকে তার বাগর্থিক উপাদানে ভেঙ্গে ফেলার নাম ঔপাদানিক বিশ্লেষণ । বাগর্থিক উপাদানগুলো মৌলিক এবং সেগুলো আর ভাঙ্গা সম্ভব নয় । কাজেই সেগুলো অর্থের ক্ষুদ্রতম একক । ঔপাদানিক বিশ্লেষণ বোঝার জন্য আমরা নিম্নলিখিত শব্দগুলোর দিকে তাকাতে পারি ঃ

(১) পুরুষ, মহিলা, শিশু
(২) বলদ, গাভী, বাছুর

উপরোক্ত (১) ও (২) -এর শব্দগুলোকে অনুপাতমূলক অভেদ সম্পর্কে স্থাপন করা যায় ঃ

পুরুষ ঃ মহিলা ঃ শিশু ঃ ঃ বলদ ঃ গাভী ঃ বাছুর

এখন সমীকরণটিকে এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

(পুংলিঙ্গ× প্রাপ্তবয়স্কতা× মানুষত্ব) ঃ (স্ত্রীলিঙ্গ× প্রাপ্তবয়স্কতা× মানুষত্ব) ঃ (অপ্রাপ্তবয়স্কতা× মানুষত্ব) ঃ ঃ
(পুংলিঙ্গ× প্রাপ্তবয়স্কতা× গরুত্ব) ঃ (স্ত্রীলিঙ্গ× প্রাপ্তবয়স্কতা× গরুত্ব) ঃ (অপ্রাপ্তবয়স্কতা× গরুত্ব)

প্রক্রিয়াটি গণিতের উৎপাদকে বিশ্লেষণের মতো । যেমন আমরা যদি পুংলিঙ্গ = a, স্ত্রীলিঙ্গ = b, প্রাপ্তবয়স্কতা = c, অপ্রাপ্তবয়স্কতা = d, মানুষত্ব = e ও গরুত্ব = f ধরি, তাহলে আমরা নিম্নরূপ সমীকরণ পাবো ঃ

$$(a \times c \times e) : (b \times c \times e) : (d \times e) : : (a \times c \times f) : (b \times c \times f) : (d \times f)$$

Dhaka University Institutional Repository

নৃতত্ত্ববিদগণ বাগর্থিক বিশ্লেষণকে জ্ঞাতিসম্পর্কিত শব্দাবলী ব্যাখ্যায় কাজে লাগিয়েছেন । যেমন বাবা, মা, ভাই, বোন, পুত্র, কন্যা, চাচা, চাচী, মামা, মামী, ভাতিজা, ভাতিজি, ভাগ্নে, ভাগ্নী প্রভৃতি শব্দকে আমরা এভাবে ছকবদ্ধ করতে পারি ঃ

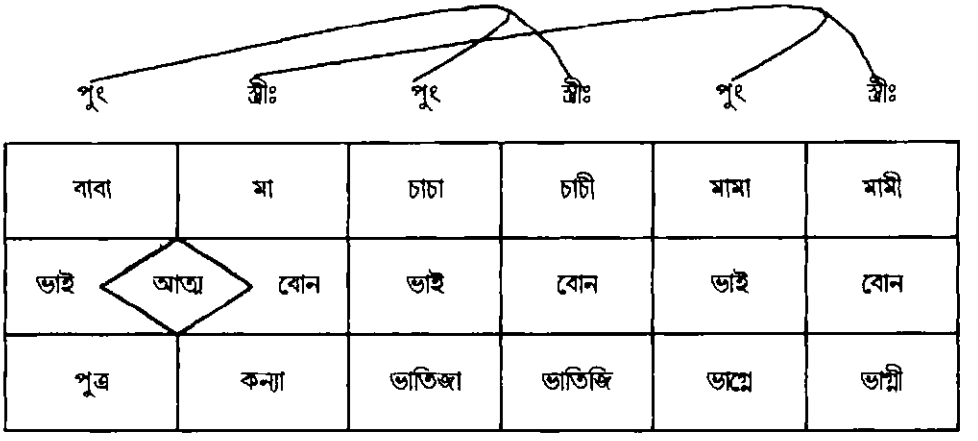

এখানে দেখা যায় *বাবা* হলো এক প্রজন্ম পূর্ববর্তী *আত্ম* -এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত পুংবাচক শব্দ এবং *মা* হলো এক প্রজন্ম পূর্ববর্তী *আত্ম* -এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত স্ত্রীবাচক শব্দ । *পুত্র* ও *কন্যা* যথাক্রমে *আত্ম* -এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এক প্রজন্ম পরবর্তী পুংবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ । একইভাবে *চাচা* ও *চাচী* এক প্রজন্ম পূর্ববর্তী পৈতৃক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ যথাক্রমে পুং ও স্ত্রীবাচক শব্দ এবং *মামা* ও *মামী* এক প্রজন্ম পূর্ববর্তী মাতৃ সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ যথাক্রমে পুং ও স্ত্রীবাচক শব্দ । *ভাতিজা, ভাতিজি* এবং *ভাগ্নে, ভাগ্নি* এক প্রজন্ম নীচে এবং যথাক্রমে বাবা ও মা -এর মাধ্যমে সম্পর্কিত । *আত্ম* -এর প্রজন্মের সবাই লিঙ্গভেদে ভাই কিংবা বোন । পার্থক্যের প্রয়োজনে *আপন, চাচাত, মামাত* প্রভৃতি বিশেষণবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয় ।

ইউজিন এ. লিডা (১৯৭৫ ঃ ৫৪-৬১) বাগর্থিক বিশ্লেষণের ছয়টি প্রক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নির্দেশ করেন । এগুলো হলো ঃ

(ক) নির্দিষ্ট কোন বাগর্থিক এলাকা থেকে পরস্পরসম্পর্কিত কতিপয় শব্দ নির্বাচন করা ।
(খ) নির্বাচিত শব্দগুলো কর্তৃক নির্দেশিত ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনাশ্রেণীর তালিকা তৈরী করা ।
(গ) শব্দগুলোর অর্থ থেকে উপাদান বের করা যেগুলো সব শব্দে না হলেও কতিপয় শব্দে সাধারণভাবে বিদ্যমান ।
(ঘ) প্রতিটি শব্দকে যথার্থ উপাদানে বা উপাদানসমষ্টিতে চিহ্নিত করা ।
(ঙ) শব্দের সাথে উপাদানের সমন্বয় সঠিক হলো কিনা তা অন্য শব্দ সহযোগে যাচাই করা ।
(চ) ছকে বা অন্যবিদ উপায়ে শব্দ ও উপাদান সমূহের শৃঙ্খলাপূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপন করা ।

Dhaka University Institutional Repository

বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে একটি শব্দকে তার পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যে ভেঙ্গে ফেলা হয় । এটি অনেকটা ঔপাদানিক বিশ্লেষণের মতোই । তবে এ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে । প্রথমত, ঔপাদানিক বিশ্লেষণে আমরা পাই অর্থের ক্ষুদ্রতম একক, আর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে আমরা পাই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মূল্যযুক্ত পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয়ত, ঔপাদানিক বিশ্লেষণ কোন বাগর্থিক এলাকার পরস্পরসম্পর্কিত শব্দগুচ্ছের বেলায় প্রযোজ্য, আর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ সাধারণত বাক্যে ব্যবহৃত কোন শব্দের বেলায় প্রযোজ্য । বস্তুতঃ বাগর্থিক উপাদানকে তাত্ত্বিক স্বার্থে বিশেষভাবে রূপায়ন করলে বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় । আমরা দেখবো বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন তত্ত্ববিদগণ কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু তার আগে আমরা বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকে সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়াস পাব । আমরা নিম্নলিখিত চারটি বাক্যের দিকে তাকাই ঃ

(১) বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও ।
(২) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল ।
(৩) বাঘের মাসি বিড়াল কেন মিউ মিউ ডাকে ?
(৪) দুনিয়ায় সাড়ে তিন হাত লম্বা মানুষ অর্ধেক ফাড়া ।

উপরের চারটির বাক্যের নিম্নরেখা দ্বারা চিহ্নিত বিশেষ্য পদগুলো একজন বাক্যতাত্ত্বিক বা বাগর্থবিদ নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা রূপায়িত করতে পারেন ঃ

আশা	**ঘর**	**বিড়াল**	**মানুষ**
[+ বিশেষ্য]	[+ বিশেষ্য]	[+ বিশেষ্য]	[+ বিশেষ্য]
[– মূর্ত]	[+ মূর্ত]	[+ মূর্ত]	[+ মূর্ত]
[– প্রাণী]	[– প্রাণী]	[+ প্রাণী]	[+ প্রাণী]
[– মানব]	[– মানব]	[– মানব]	[+ মানব]
[– গণনা]	[+ গণনা]	[+ গণনা]	[+ গণনা]
[– নির্দিষ্ট]	[+ নির্দিষ্ট]	[– নির্দিষ্ট]	[– নির্দিষ্ট]

বিভিন্ন রকম ক্রিয়াপদেরও আমরা এভাবে বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারি । নীচে *হাঁটা, দৌড়ানো, হামাগুড়ি দেয়া, জগিং করা, পাক খাওয়া* এই পাঁচটি ক্রিয়ার বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য ধনাত্মক / ঋণাত্মক চিহ্নে ম্যাট্রিক্স আকারে তুলে ধরা হলো ঃ

	পায়ের ব্যবহার	হাতের ব্যবহার	দ্রুতবেগ	সম্মুখগতি	ঘূর্ণনগতি
হাঁটা	+	–	–	+	–
দৌড়ানো	+	–	+	+	–
হামাগুড়ি দেয়া	+	+	–	+	–
জগিংকরা	+	–	–	+	–
পাক খাওয়া	+	–	+	–	+

Dhaka University Institutional Repository

নিডা এবং অন্যান্য (১৯৭৭ ঃ ১৪৫) **mumble** (বিড়বিড় করা), **shout** (চিৎকার করা), **scream** (তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করা), **whisper** (ফিসফিস করা), **babble** (আধো আধো বোল বলা) এই পাঁচটি বাঙমূলক ক্রিয়ার বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে ঃ

	mumble	shout	scream	whisper	babble
কথা	+	±	+	+	–
ঘোষতা	+	+	+	–	+
উচ্চস্বর	–	+	+	–	±
উচ্চমীড়	–	–	+	–	–

বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায় কোন কোন বাক্য কেন আবশ্যিকভাবে সত্য, কোনটি স্ববিরোধী এবং কোনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় । যেমন ঃ

(১) বিড়াল একটি প্রাণী ।
(২) আমাদের অন্তঃসত্ত্বা প্রতিবেশী একজন মহিলা ।
(৩) বিড়ালটি প্রাণী নয় ।
(৪) আমাদের অন্তঃসত্ত্বা প্রতিবেশী একজন পুরুষ ।
(৫) ঘর চিৎকার করে কথা বলে ।
(৬) আমাদের অন্তঃসত্ত্বা আশা একজন মানুষ ।

উপরের প্রথম দুটি বাক্যকে বলা হয় **বিশ্লেষক বাক্য**, কারণ এগুলো বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিচারে আবশ্যিকভাবে সত্য । *বিড়াল* এর একটি বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য [+ প্রাণী] এবং অন্তঃসত্ত্বা এর একটি বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য [+ মহিলা] । ৩ ও ৪ নম্বর বাক্য দুটি স্ববিরোধী, কারণ বিড়াল এর বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য [– প্রাণী] নয় এবং অন্তঃসত্ত্বা-এর বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য [– মহিলা] নয় । একইভাবে ৫ ও ৬ নম্বর বাক্যদুটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ঘরের সাথে চিৎকার করে কথা বলা খাপ খায় না এবং আশার সাথে অন্তঃসত্ত্বা ও মানুষ খাপ খায় না ।

বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শব্দের অনেকার্থকতা নির্দেশ করা যায় । যেমন নীচের বাক্যে *কাটা* শব্দটির দ্বিবিধ প্রয়োগের পার্থক্য বোঝা যেতে পারে তাদের বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যের তুলনার মাধ্যমে ঃ

পন্ডিতদের বই যত না বাজারে কাটে তার চেয়ে বেশি পোকায় কাটে ।

[+ ক্রিয়া]	[+ ক্রিয়া]
[– সকর্মক]	[+ সকর্মক]
[+ স্থানান্তর]	[– স্থানান্তর]
[+ অর্থাগম]	[– অর্থাগম]
[– বিশ্লিষ্টতা]	[+ বিশ্লিষ্টতা]
[+ উপযোগিতা]	[– উপযোগিতা]
[+ পঠন]	[– পঠন]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শব্দার্থের স্বরূপ সন্ধান করা হয় । আমরা পরে দেখবো জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদগণ ঔপাদানিক বিশ্লেষণকে এবং রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদগণ বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যকে তাদের তাত্ত্বিক সংগঠনে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন ।

বিয়ারভিশের তত্ত্ব

মানফ্রেট বিয়ারভিশ (১৯৭০) ঔপাদানিক বিশ্লেষণ বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে তার বাগর্থিক তত্ত্ব প্রগঠন করেন । তিনি ইঙ্গিতমূলক নিয়মের ধারণা প্রচার করেন । তার মতে, শব্দকে এর উপাদানে বিশ্লেষণ করার সময় ইঙ্গিতমূলক নিয়ম অনুপূরক হিসাবে কাজ করে । যেমন *বালক, বালিকা, পুরুষ, মহিলা* প্রভৃতি শব্দকে যখন এভাবে বিশেষণ করা হবে ঃ

বালক ঃ + প্রাণী, + মানব, + ছেলে, – প্রাপ্তবয়স্ক
বালিকা ঃ + প্রাণী, + মানব, – ছেলে, – প্রাপ্তবয়স্ক
পুরুষ ঃ + প্রাণী, + মানব, + ছেলে, + প্রাপ্তবয়স্ক
মহিলা ঃ + প্রাণী, + মানব, – ছেলে, + প্রাপ্তবয়স্ক

তখন নিম্নলিখিত ইঙ্গিতমূলক নিয়ম প্রযোজ্য হবে ঃ

+ মানব → + প্রাণী
+ ছেলে → – মেয়ে
+ মেয়ে → – ছেলে
+ ছেলে → + প্রাণী
+ মেয়ে → + প্রাণী

এই নিয়মগুলো নির্দেশ করে যে যা মানব তা অবশ্যই প্রাণী, যা ছেলে তা অবশ্যই মেয়ে নয়, যা মেয়ে তা অবশ্যই ছেলে নয়, যা ছেলে তা অবশ্যই প্রাণী এবং যা মেয়ে তা অবশ্যই প্রাণী । এসমস্ত নিয়ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যের পৌনপুনিকতা রোধ করে । যেমন *বালক* শব্দের বিশ্লেষণে ঃ

বালক ঃ + প্রাণী, + মানব, + ছেলে, – মেয়ে, – অপ্রাপ্তবয়স্ক

এভাবে বর্ণনার প্রয়োজন নেই । যেহেতু "+ মানব → প্রাণী" এবং "+ ছেলে → – মেয়ে" সেহেতু কেবল এটুকু বর্ণনা করাই যথেষ্ট ঃ

বালক ঃ + প্রাণী, + ছেলে, – অপ্রাপ্তবয়স্ক

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ারডিশ জ্ঞাতিশব্দের অর্থ বিশ্লেষণে সম্পর্কসূচক উপাদানের ধারণা প্রচলন করেন। *যেমন ক জন্মদানকারী খ* এবং *ক সন্তান খ* এগুলো হলো সম্পর্কসূচক উপাদান। নীচে *পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা* -র বিশ্লেষণ দেয়া হলো ঃ

পিতা ঃ খ -এর জন্মদানকারী ক এবং ছেলে ক
মাতা ঃ খ -এর জন্মদানকারী ক এবং মেয়ে ক
পুত্র ঃ খ -এর সন্তান ক এবং ছেলে ক
কন্যা ঃ খ -এর সন্তান ক এবং মেয়ে ক
ভ্রাতা ঃ খ -এর জন্মদানকারীর সন্তান ক এবং ছেলে ক
ভগিনী ঃ খ -এর জন্মদানকারীর সন্তান ক এবং মেয়ে ক

এখানে *ভ্রাতা* ও *ভগিনীর* অর্থের সংগঠনটি একটু জটিল এবং নিম্নরূপ সংজ্ঞার মাধ্যমে এদের আরেকটু পরিস্কার করা যায় ঃ

ভ্রাতা ঃ খ -এর জন্মদানকারীর সন্তান ক =Df একজন গ আছে যে খ-এর জন্মদানকারী এবং যার সন্তান ক এবং ক ≠ খ এবং ছেলে ক

ভগিনী ঃ খ -এর জন্মদানকারীর সন্তান ক =Df একজন গ আছে যে খ -এর জন্মদানকারী এবং যার সন্তান ক এবং ক ≠ খ এবং মেয়ে ক

একইভাবে বিয়ারডিশ সম্পর্কসূচক উপাদানের মাধ্যমে *উঁচু, নীচু* প্রভৃতি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেন (স্ব এখানে স্বাভাবিক) ঃ

উঁচু ঃ ক বৃহত্তর স্ব এবং ⟨ক মাত্রা খ এবং উলম্ব ক⟩
নীচু ঃ ক ক্ষুদ্রতর স্ব এবং ⟨ক মাত্রা খ এবং উলম্ব ক⟩

অর্থাৎ তখনই আমরা কোন বস্তু খ -কে উঁচু বলবো যখন তা ক মাত্রায় অর্থাৎ উলম্বভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে বৃহত্তর হবে এবং তখনই আমরা কোন বস্তু খ -কে নীচু বলবো যখন তা ক মাত্রায় অর্থাৎ উলম্বভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হবে।

বিয়ারডিশ ক্রিয়াবাচক শব্দের অর্থও এভাবে বিশ্লেষণ করেন। তার মতে, আছে (have) -কে যদি *ক -এর আছে খ* এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেয়া (give), নেয়া (take), ধার দেয়া (lend), ধার নেয়া (borrow), হত্যা করা (kill) প্রভৃতি শব্দের বাগর্থিক উপাদানকে এভাবে দেখানো যায় ঃ

দেয়া ঃ ক -এর আছে খ এবং ক ঘটায় (গ -এর আছে খ)
নেয়া ঃ গ এর আছে খ এবং ক ঘটায় (ক -এর আছে খ)
ধার দেয়া ঃ ক -এর আছে খ এবং গ -এর নেই খ এবং ক ঘটায় (গ -এর আছে খ) এবং খ -এর এমন পরিবর্তন ঘটে না (গ মালিক খ)

Dhaka University Institutional Repository

ধার নেয়া ঃ গ -এর আছে খ এবং ক -এর নেই খ এবং ক ঘটায় (ক -এর আছে খ) এবং খ -এর এমন পরিবর্তন ঘটে না (ক মালিক খ)

হত্যা করা ঃ জীবিত ক এবং জীবিত খ এবং ক ঘটায় (খ পরিবর্তিত হয় (জীবিত নয় খ))

কাজেই এখন আমরা *বালকটি কুকুর হত্যা করেছে* -এ বাক্যটিকে এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি ঃ

বালকটি কুকুর হত্যা করেছে = Df মানব ক এবং ছেলে ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ক এবং জীবিত ক এবং জীবিত খ এবং ক ঘটায় (খ পরিবর্তিত হয় (জীবিত নয় খ)) এবং প্রাণী খ এবং সারমেয় খ ।

কাজেই বিয়ারভিশের তত্ত্ব দিয়ে শুধু শব্দবিশ্লেষণ নয়, বাক্যবিশ্লেষণও সম্ভব । বাক্যবিশ্লেষণের সময় এর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে স্তরক্রমিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে । এবং বৃক্ষচিত্রে তা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে । কেম্পসন (১৯৭৭ ঃ ১১০) The man killed the woman এই ইংরেজী বাক্যটিকে নিম্নরূপ চিত্রে প্রকাশ করেন ঃ

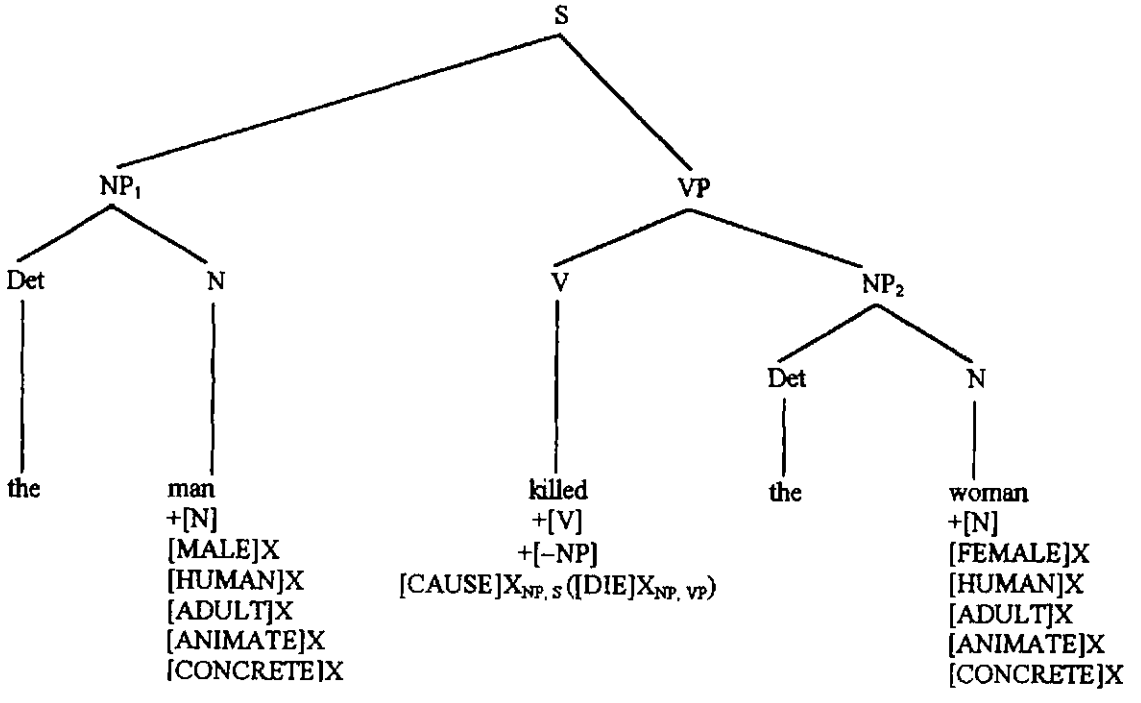

মূলনীতি ও সমস্যা ঃ ঔপাদানিক বিশ্লেষণ বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং তাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বাগর্থিক তত্ত্বসমূহ এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে শব্দের অর্থকে ক্ষুদ্রতম উপাদানে বা বৈশিষ্ট্যে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব এবং এভাবে শব্দসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় । কিন্তু এভাবে অর্থ বিশ্লেষণের অনেক সমস্যা আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, যে সমস্ত বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যকরণের যোগ রয়েছে এবং যে সমস্ত বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যকরনের যোগ নেই তাদের বিভাজন রেখাটি কোথায় তা স্পষ্ট নয় ।
দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ই শব্দের বাগর্থিক উপাদান বের করা মুশকিল হয়ে পড়ে এবং অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াটি নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ।
তৃতীয়ত, এটি অর্থের আংশিক চিত্র তুলে ধরে এবং সামগ্রিক বাগর্থিক তত্ত্ব নির্মানে ব্যর্থ ।

বাগর্থিক ক্ষেত্র

সোস্যুরের ক্রমকালিক/সমকালিক বিভাজনের পর থেকে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী সমকালিক মাত্রায় বাগর্থিক ক্ষেত্র বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন এবং তাদের ক্ষেত্রতত্ত্ব নির্মান করেন । ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য এই যে কোন ভাষার যাবতীয় শব্দ পরস্পরের সাথে ধারণাগতভাবে সম্পৃক্ত এবং তারা সবাই মিলে একটি ক্ষেত্র তৈরী করে । ক্ষেত্রটির গঠন স্তরক্রমিক এবং প্রান্তিক স্তরে অবস্থান করে ভাষার একক শব্দাবলী । বাগর্থিক ক্ষেত্র বিভাজিত হয় বহুসংখ্যক বাগর্থিক এলাকায় এবং প্রতিটি এলাকায় থাকে একগুচ্ছ নিবিড় সম্পর্কিত শব্দ ।
সোস্যুরের মতে, ভাষার কোন শব্দের অর্থ অন্যান্য শব্দের সাথে তার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে এবং নির্দিষ্ট কোন শব্দকে একগুচ্ছ শব্দের কেন্দ্ররূপে দেখানো যায় । যেমন আমরা যদি *শিক্ষা* শব্দটিকে ধরি, তাহলে দেখবো শব্দটি ভাষার অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ক শব্দাবলীর সাথে একাধিক রৈখিক সম্পর্কে আবদ্ধ ।

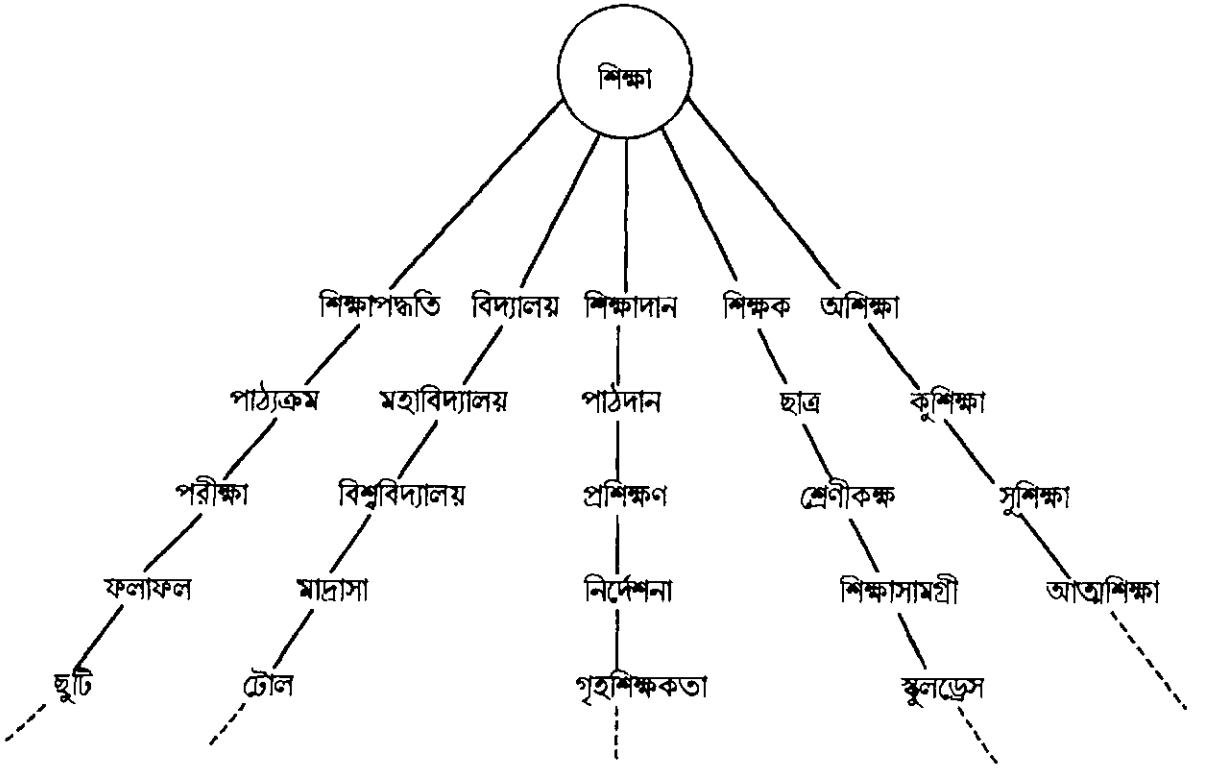

শিক্ষা শব্দের সংশ্রয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি ভাষায় বর্ণবিষয়ক বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। বর্ণবিষয়ক শব্দাবলীর দিক থেকে এক ভাষা অন্য ভাষা থেকে ভিন্ন হতে পারে। এই ভিন্নতাকে অনেকে ভাষিক আপেক্ষিকতার প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করেন। একই বর্ণালীকে কেন বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে তা আজও গবেষণার বিষয়। বাংলা ভাষার বর্ণবিষয়ক শব্দাবলীকে আমরা নিম্নরূপে বিভক্ত ও উপবিভক্ত করতে পারি ঃ

বর্ণ																	
সাদা			কালো			হলুদ				সবুজ			লাল			নীল	
সাদা	দুধেল	রূপালী	কালো	ধূসর	শ্যামলা	হলুদ	বাদামী	সোনালী	তামাটে	সবুজ	পাতা	টিয়া	লাল	কমলা	বেগুনী	নীল	আসমানী

বাংলার বর্ণক্ষেত্র

এখানে দেখা যায় পুরো বর্ণক্ষেত্র প্রথমে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছে, পরে সেগুলো আবার বৈচিত্র্য অনুযায়ী উপ-অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু উপবিভক্তির মধ্যে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হলো মূল ছয়টি বর্ণাঞ্চল এখানে সংকুচিত হয়ে অন্যান্য উপবর্ণের পাশে অবস্থান নিয়েছে, অর্থাৎ উপবর্ণগুলি মূল বর্ণাঞ্চলকে পুরোপুরি দখল করে নিতে পারেনি। বাংলায় *কমলা, বেগুনী* এগুলো একদিকে বিভিন্ন ধরনের *লাল* এবং অন্যদিকে *লাল* থেকে ভিন্ন। যেমন ইংরেজীতে man একদিকে নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝায় আবার অন্যদিকে নারীর সাথে বৈপরীত্য প্রকাশ করে। এখানে এক ধরনের উপনামীয় সম্পর্ক বিদ্যমান যা আমরা পরে আলোচনা করবো।

আগেই বলেছি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে থাকে, ফলে দুটি ভাষার বর্ণবিষয়ক শব্দাবলী বাগর্থিক ক্ষেত্র বিচারে সচরাচর সমাপতিত হয় না। হিয়েমশ্লেভ ইংরেজী ও ওয়েল্‌শ্‌ ভাষার বর্ণবিষয়ক শব্দাবলীর তুলনা করে দেখিয়েছেন তারা কিভাবে ভিন্নরূপ বাগর্থিক ক্ষেত্র নির্দেশ করে ঃ

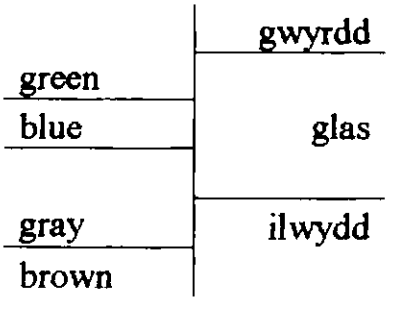

(Palmer 1981: 69)

Dhaka University Institutional Repository

বাগর্থিক ক্ষেত্রের ধারণাটি জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীর বেলায়ও প্রযোজ্য । প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রকে বিভাজিত করে থাকে, ফলে দুটি ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীও সমাপতিত হয় না । এই ব্যাপারটিও বিভিন্ন ভাষাগোষ্টির সমাজসংগঠন ও সমাজচিন্তনের ভিন্নতা প্রতিপন্ন করে । আমরা বাংলা ও ইংরেজী ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীর তুলনা করে বিষয়টি পরিস্কার করতে পারি । ইংরেজী ও বাংলা ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীকে এভাবে চিত্রবদ্ধ করা যায় ঃ

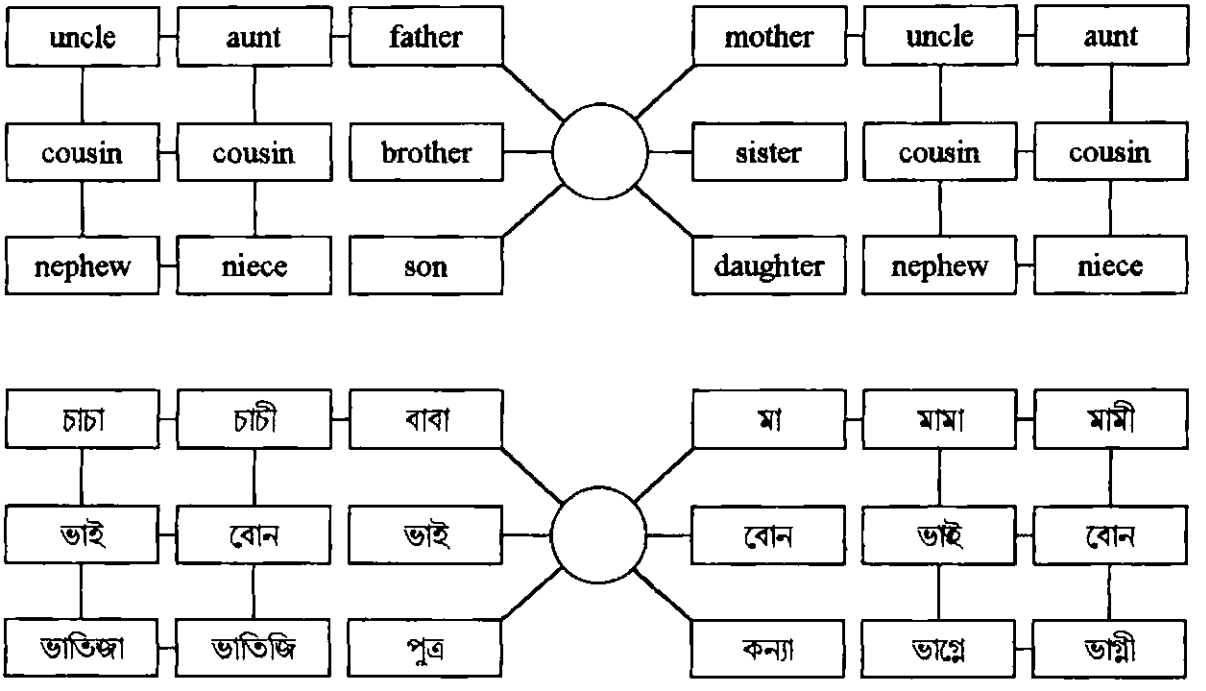

বাংলা ও ইংরেজীর জ্ঞাতিসম্পর্কের তুলনা

কাজেই দেখা যায় বাঙ্গালীরা যেখানে বাবা কিংবা মায়ের দিক থেকে আত্মীয়তার ভিত্তিতে চাচা-চাচী / মামা-মামী -র পার্থক্য করে ইংরেজরা সেখানে uncle/aunt দিয়েই তা চালিয়ে নেয় । ইংরেজরা ভাতিজা/ভাগ্নে উভয়কে বোঝাতে nephew এবং ভাতিজি/ভাগ্নী উভয়কে বোঝাতে niece ব্যবহার করে । ইংরেজরা চাচাত/মামাত ভাইবোনের মধ্যে লিঙ্গভেদ করে না, cousin দিয়েই উভয়কে বোঝায়, কিন্তু বাঙ্গালীরা চাচাত, মামাত ভাইবোনের মধ্যে লিঙ্গভেদ করে এবং নির্দিষ্টভাবে বলার জন্য *ভাই* বা *বোনের* পূর্বে *চাচাত, মামাত* প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করে । তদপুরি বাংলা ভাষায় রয়েছে ফুফা /ফুফু (মুসলমানদের জন্য), পিসা / পিসি (হিন্দুদের জন্য), খালু / খালা (মুসলমানদের জন্য), মেসো / মাসি (হিন্দুদের জন্য)-র ভেদ্য । আবার চাচা-চাচীকে পিতার বয়স তুলনায় (বিশেষত হিন্দুদের বেলায় প্রযোজ্য) জ্যাঠা-জ্যাঠী, কাকা-কাকী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । কাজেই বোঝা যায় বাংলা ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীর বাগর্থিক সংগঠন ইংরেজী ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীর বাগর্থিক সংগঠন থেকে জটিল । ইংরেজী ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীকে একটি বাক্সচিত্রে প্রদর্শন করা যেতে পারে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

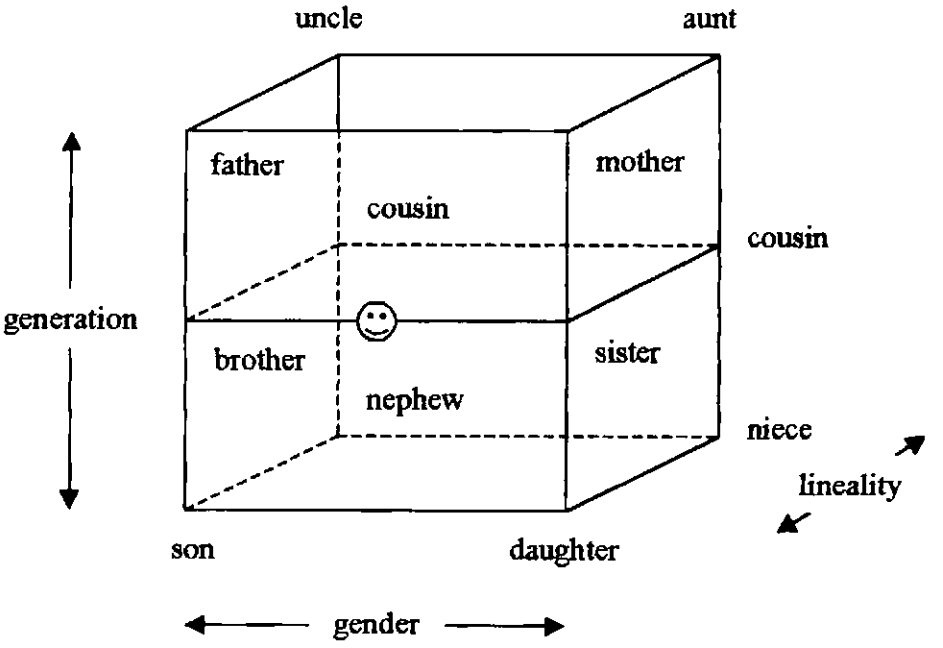

ইংরেজী জ্ঞাতিসম্পর্কের বাক্সচিত্রীয় উপস্থাপনা

(Hatch & Brown 1995: 35 / পরিমার্জিত)

কিন্তু বাংলা ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীকে এরকম সরলভাবে একটিমাত্র বাক্সে প্রকাশ করা যায় না । মোটামুটিভাবে তাদেরকে এভাবে দেখানো যায় ঃ

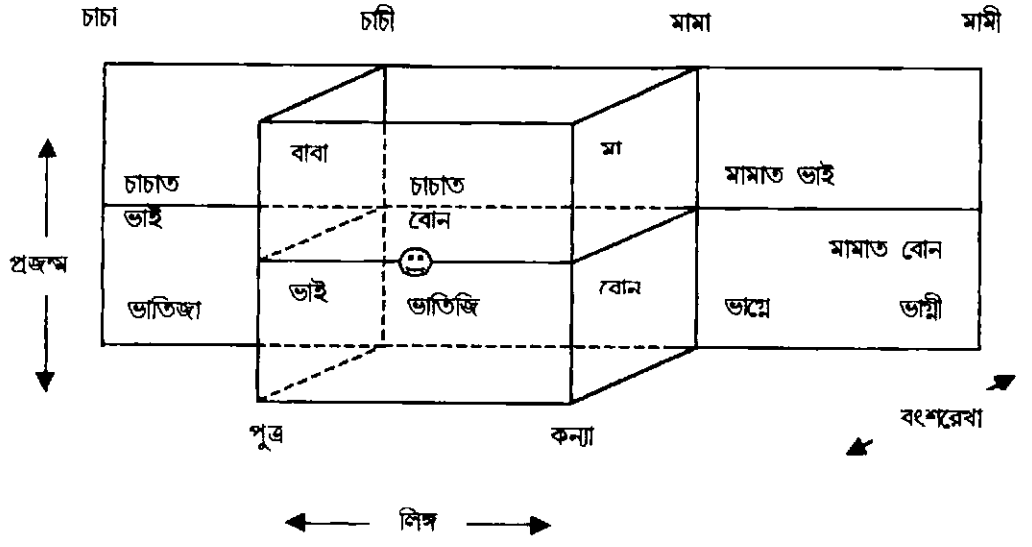

বাংলা জ্ঞাতিসম্পর্কের বাক্সচিত্রীয় উপস্থাপনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণীজগত ও উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য বাগর্থিক ক্ষেত্রের ধারণা কাজে লাগানো হয় । যেমন জীব বিজ্ঞানীরা জীবজগতকে জীবের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সর্গ, বর্গ, গোত্র, জাতি, প্রজাতি এরূপ স্তরক্রমে বিন্যস্ত করে থাকেন । এটি করা হয় বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজনে । প্রাণীজগতকে আমরা জাগতিক প্রয়োজনে অন্যভাবেও শ্রেণীবিভাগ করতে পারি । যেমন ঃ

প্রাণী								
পোষাপ্রাণী			হিংস্রপ্রাণী			গবাদিপশু		
বিড়াল	কুকুর	ঘোড়া	বাঘ	ভাল্লুক	সিংহ	গরু	ছাগল	মহিষ

এখানে প্রাণীকে প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে পোষাপ্রাণী, হিংস্রপ্রাণী ও গবাদিপশু । পোষাপ্রাণীর মধ্যে পড়ে বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া । ময়না, টিয়া প্রভৃতি পোষা পাখিও এই শ্রেণীতে রাখা যেত । হিংস্রপ্রাণীর মধ্যে পড়ে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ । গোখরো, অজগর প্রভৃতি সরীসৃপ এবং ঈগল, চিল প্রভৃতি শিকারী পাখিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারতো । গবাদি পশুর মধ্যে পড়ে গরু, ছাগল, মহিষ । ভেড়া, পাঠা, দুম্বা প্রভৃতিও এই শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য ।

কেবল প্রাণী বা বস্তুর জগত নয়, কর্মের জগতকেও এভাবে বাগর্থিক অঞ্চলে বিভক্ত করা সম্ভব । কর্মের বিভাজনের সময় আমরা বিবেচনা করতে পারি কোন্‌টি জনহিতকর কর্ম, কোন্‌টি স্বার্থপর কর্ম, কোন্‌টি নৈতিক কর্ম, কোন্‌টি অনৈতিক কর্ম, কোন্‌টি সাংসারিক কর্ম, কোন্‌টি বিনোদনমূলক কর্ম, কোন্‌টি কষ্টকর কর্ম, কোন্‌টি আরামদায়ক কর্ম, কোন্‌টি পেশাগত কর্ম, কোন্‌টি অপেশাগত কর্ম ইত্যাদি । নিডা এবং অন্যান্য (১৯৭৭ ঃ ১৬১) ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন সঞ্চারণমূলক শব্দকে কিছু বাগর্থিক অঞ্চলে শ্রেণীবিভক্ত করে দেখান যে তারা কিরূপে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত ঃ

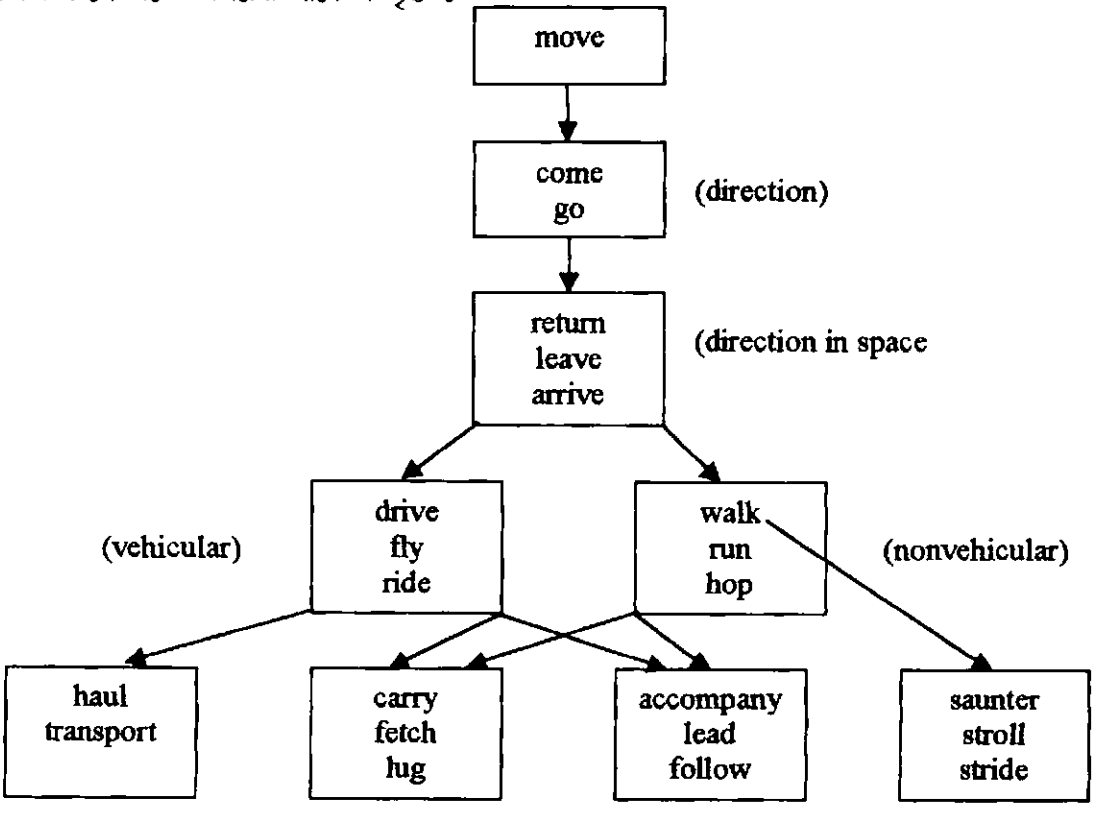

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে লেহরার (১৯৭৪ ঃ ৪০) ইংরেজী বিভিন্ন আওয়াজ বিষয়ক শব্দাবলীর শ্রেণীবিন্যাস করে তাদের বাগর্থিক অবস্থান নির্ণয় করেন ঃ

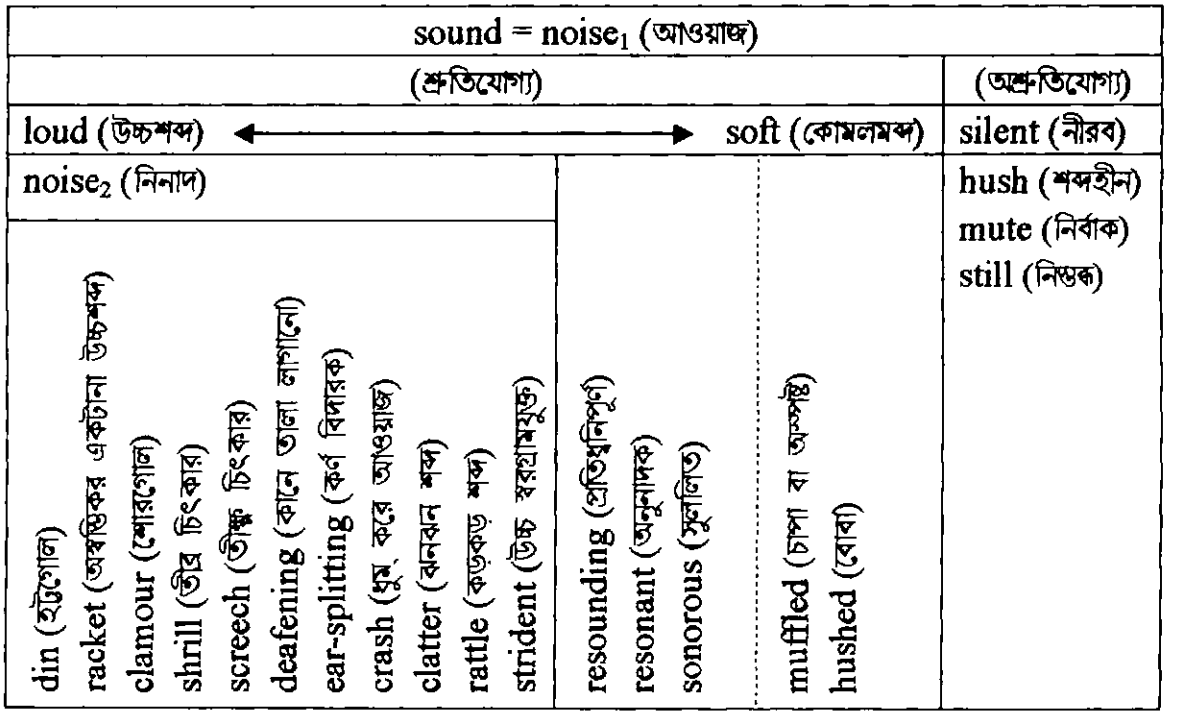

ক্ষেত্রতত্ত্ব অনুসারে একটি ভাষার শব্দভান্ডার পরস্পর সম্পর্কিত শব্দাবলীর একটি সেট, যা ক্ষেত্র বা ময়দানের সাথে তুলনীয় এবং সেই সেট বিভক্ত কতগুলি উপসেটে যাদেরকে বলা হয় বাগর্থিক অঞ্চল । যদি শব্দভান্ডারকে ভ, বাগর্থিক অঞ্চলকে বা এবং প্রতিটি শব্দকে শ ধরি তাহলে ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণাকে এভাবে ব্যক্ত করা যায় ঃ

$$ভ \{ বা_১ (শ_১, শ_২, শ_৩ ...), বা_২ (শ_৪, শ_৫, শ_৬ ...), বা_৩ (শ_৭, শ_৮, শ_৯, ...), ... \}$$

ক্ষেত্রতত্ত্বের সবচেয়ে শক্তিমান ভাষ্যে এটা ধরে নেয়া হয় যে শব্দভান্ডার সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ এবং তাকে সুস্পষ্ট রূপে বিভাজিত করা সম্ভব । ফলে (১) দুটি বাগর্থিক অঞ্চল এমনভাবে সন্নিহিত হবে যে তাদের মাঝখানে কোন শব্দ থাকবে না, অর্থাৎ কোন শব্দই একসাথে দুটি অঞ্চলে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না, এবং (২) সমস্ত বাগর্থিক অঞ্চলের সমষ্টি হবে শব্দভান্ডারের সমান অর্থাৎ এমন কোন শব্দ থাকবে না যা কোন না কোন অঞ্চলের সদস্য নয় (Lyons 1977: 268) । লিয়ন্স বাগর্থিক ক্ষেত্র ও শাব্দিক ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করেন । কোন ভাষা সংশ্রয়ে পারস্পরিক বা অনুস্থাপনিক সম্পর্কের মাধ্যমে বাগর্থিক এককসমূহ যে ক্ষেত্র তৈরী করে তাকে **বাগর্থিক ক্ষেত্র** বলে । আর কোন ভাষা সংশ্রয়ে পারস্পরিক বা অনুস্থাপনিক সম্পর্কের মাধ্যমে শব্দভান্ডার যে ক্ষেত্র তৈরী করে তাকে **শাব্দিক ক্ষেত্র** বলে । আমাদের বিবেচনায় বাগর্থিক ক্ষেত্র ও শাব্দিক ক্ষেত্র একই জিনিসের দুটি দিকমাত্র, প্রথমটি ধারণাগত দিক এবং দ্বিতীয়টি রৌপিক দিক । আমরা যখন শব্দজগতের ক্ষেত্র নির্ধারণ করি তখন ধারণাজগতেরও ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় । বাগর্থিক ক্ষেত্রের একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার শব্দসমূহ মনের অনুষঙ্গাত্মক নীতি অনুযায়ী সংঘবদ্ধ হয় । যদি কতকগুলি শব্দ রূপ ও অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি হয় তবে মানুষের চেতনা তাদেরকে একসাথে সংযুক্ত করে । যেমন *ধান* শব্দটি উচ্চারণ করলে আমাদের মনে পড়তে পারে *গান, কান, মান, টান, দান, ধানী, ধান্য, ধন্য, ধামা, ধাপ্পা* প্রভৃতি শব্দ (রূপগত কারণে) অথবা মনে পড়তে পারে *চাউল, ভাত, মাঠ, মাড়াইকল, সার, লাঙ্গল, কীটনাশক, খড়, তুষ, খুদ* প্রভৃতি শব্দ (অর্থগত কারণে) । এই অবস্থাটিকেই আলেকজান্ডার লুরিয়া (১৯৮২ ঃ ৭৩) বলেছেন **সম্পর্কের অনেকার্থক প্রকৃতি** (polysemantic nature of the relationship)। লুরিয়া উদাহরণ দিয়েছেন koshka (বিড়াল) শব্দটির মাধ্যমে । এ শব্দটি উচ্চারণ করলে একদিকে kroshka (টুকরা) kryshka (ঢাকনা), kruzhka (মগ), প্রভৃতি শব্দ এবং অন্যদিকে *দুধ, ইঁদুরের ফাঁদ, লোম, পোষাপ্রাণী* প্রভৃতি ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দাবলী মনে আসতে পারে । লুরিয়ার মতে ভাষার কোন শব্দেরই এককভাবে নির্দিষ্ট স্থায়ী অর্থ নেই । তিনি বলেন "শব্দের যদি একক স্থায়ী অর্থ থাকতো তাহলে মানুষ একটি বস্তুর বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারতো না অথবা একে বিশ্লেষণ করতে পারতো না এবং সম্ভাব্য সকল অনুষঙ্গ থেকে নির্দিষ্ট কিছু অনুষঙ্গকে পৃথক করতে পারতো না ।"● কাজেই এটি খুবই সম্ভব মনে হয় যে বাগর্থিক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব রয়েছে ।

ট্রিয়ারের তত্ত্ব

বাগর্থিক ক্ষেত্র সম্পর্কে ট্রিয়ারের তত্ত্বটি প্রণিধানযোগ্য, যা উলম্যানের মতে বাগর্থবিদ্যার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের উন্মোচন করেছে । ট্রিয়ারের মতে, কোন ভাষার শব্দভান্ডার অর্থগত সম্পর্কের দিক দিয়ে একটি সংশ্রয়ের মধ্যে যুথবদ্ধ । সংশ্রয়টি সবসময় পরিবর্তিত হচ্ছে এতে নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে এবং পুরণো শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে । সংশ্রয়ের ভিতর যে কোন একটি শব্দের পরিবর্তন পুরো সংশ্রয়টিকে প্রভাবিত করে তার আদল পাল্টে দেয় । যেহেতু এ ধরনের পরিবর্তন সময়ে সাধিত হয় তাই বাগর্থবিদ্যার কাজ সাংগঠনিক ও ঐতিহাসিক উভয় দিক থেকে শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা । কোন শব্দের পরিবর্তনে একটি বাগর্থিক অঞ্চলে কিরূপ পরিবর্তন ঘটবে তা আগে থেকে বলা যায় না । এতে নীচের তিনটির মধ্যে কোন এক ধরনের পরিবর্তন অথবা অন্য যে কোন রকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে ঃ

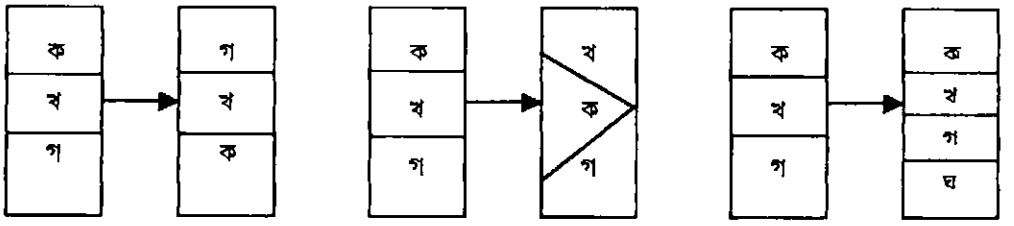

পরিবর্তন- ১ পরিবর্তন-২ পরিবর্তন-৩

বাগর্থিক অঞ্চলের ক্রমকালিক পরিবর্তন

(Lyons 1977: 256 অনুসরণে)

● "If a word had only a single constant meaning, humans could not point to the different aspects of an object or analyse it and isolate certain associations from among all possible ones." Alexander R. Luria (1982), *Language and Cognition*, p. 73

Dhaka University Institutional Repository

ট্রিয়ার দুটি ভিন্ন সময়ের জার্মান ভাষার জ্ঞানবিষয়ক শব্দাবলীর তুলনা করে দেখান ঐতিহাসিকভাবে বাগর্থিক অঞ্চলে কিভাবে পরিবর্তন সাধিত হয় । ট্রিয়ার দেখান যে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জার্মানে জ্ঞানবিষয়ক তিনটি শব্দ ছিল – Wisheit (প্রজ্ঞা), Kunst (শৈল্পিক জ্ঞান) ও List (দুষ্টবুদ্ধি) । Wisheit বলতে একদিকে প্রজ্ঞা বোঝাতো, অন্যদিকে সুকুমার অসুকুমার যে কোন জ্ঞানকে বোঝাতো ; একটি ছিল উচ্চ স্থানিক শব্দ যার ভিতরে Kunst ও List অন্তর্ভূক্ত ছিল । কিন্তু ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে Wisheit, Kunst, Wizzen এই তিনটি শব্দ জ্ঞানের ধারণার এলাকাটি দখল করে । এবার Wisheit এর অর্থ হলো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসহ গভীর জ্ঞান, Kunst এর অর্থ মোটামুটি একই থাকলো এবং Wizzen এর অর্থ হলো অগভীর আটপৌরে জ্ঞান । জার্মানের জ্ঞানবিষয়ক শব্দাবলী ও তৎসংশ্লিষ্ট ধারণার এই এক শতাব্দীর পরিবর্তনকে এভাবে দেখানো যায় ঃ

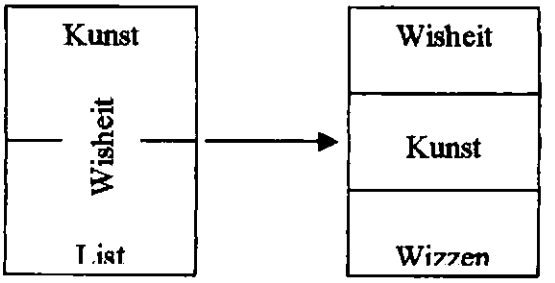

বাগর্থিক অঞ্চলের পরিবর্তন

ট্রিয়ারের মতে, কোন বাগর্থিক অঞ্চলের শব্দাবলী কালিক মাত্রায় পুনঃদলবদ্ধ হয় এবং এই পুনঃদলবদ্ধতা আবার সমকালিক মাত্রায় বিশ্লেষণ করা যায় । যেহেতু বাগর্থিক অঞ্চলের এককগুলো পরস্পরসম্পৃক্ত সেহেতু অংশের পরিবর্তনে সমগ্রের পরিবর্তন সূচিত হয় ।

কাজেই দেখা যায় ট্রিয়ারের তত্ত্বে ক্রমকালিক ও সমকালিক এই দুই আপাত বিরোধী ও বিপরীতমুখী অনুস্থাপনের সমন্বয় ঘটেছে । তার তত্ত্বে চলমানতা ও স্থিরতা এক বিন্দুতে সমাসীন হয়েছে । ট্রিয়ারের নিজের ভাষায় – যেন "ইতিহাস সাংগঠনিকতার ভিতর দিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করলো" (history conceived in structural terms) । (Ullmann 1957: 167)

মাতোরের তত্ত্ব

ক্ষেত্রতত্ত্বের বিকাশে জর্জ মাতোরের শব্দভান্ডার নিয়ে গবেষনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । মাতোর ফরাসী ভাষার শব্দসম্ভার ও তার ঐতিহাসিক পরিবর্তন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং ভাষাসংগঠন থেকে সমাজ সংগঠনের তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন । মাতোরের মতে শব্দতত্ত্বের উদ্দেশ্য শুধু ভাষাবিশ্লেষণ নয়, সমাজ বিশ্লেষণও । কাজেই তার তত্ত্বের একটি সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মাতোর রেনেসাঁ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সময়কে এগারটি প্রজন্মে বিভক্ত করেন এবং এই ভাষা প্রজন্মগুলির মধ্যে শব্দতাত্ত্বিক সংগঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন । তিনি দেখান যে প্রতিটি ভাষা প্রজন্মেই নতুন নতুন ধারণার আবির্ভাব ঘটেছে, তার ফলে নতুন নতুন শব্দের প্রচলন হয়েছে । মাতোর তার গবেষণায় ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জ্ঞানবিদ্যার চর্চা কিরকম হয়েছে তার অনুসন্ধান করেন । তিনি ১৭৬৫ প্রজন্মের দার্শনিক বা জ্ঞানবিদ্যক শব্দবলীর একটি তালিকা তৈরী করেন এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ করে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেন । নীচের চিত্রে তা প্রকাশ করা হলো (শব্দমানচিত্রটি জাহাঙ্গীর তারেক ১৯৮৮ ঃ ৭১ থেকে নেয়া) ঃ

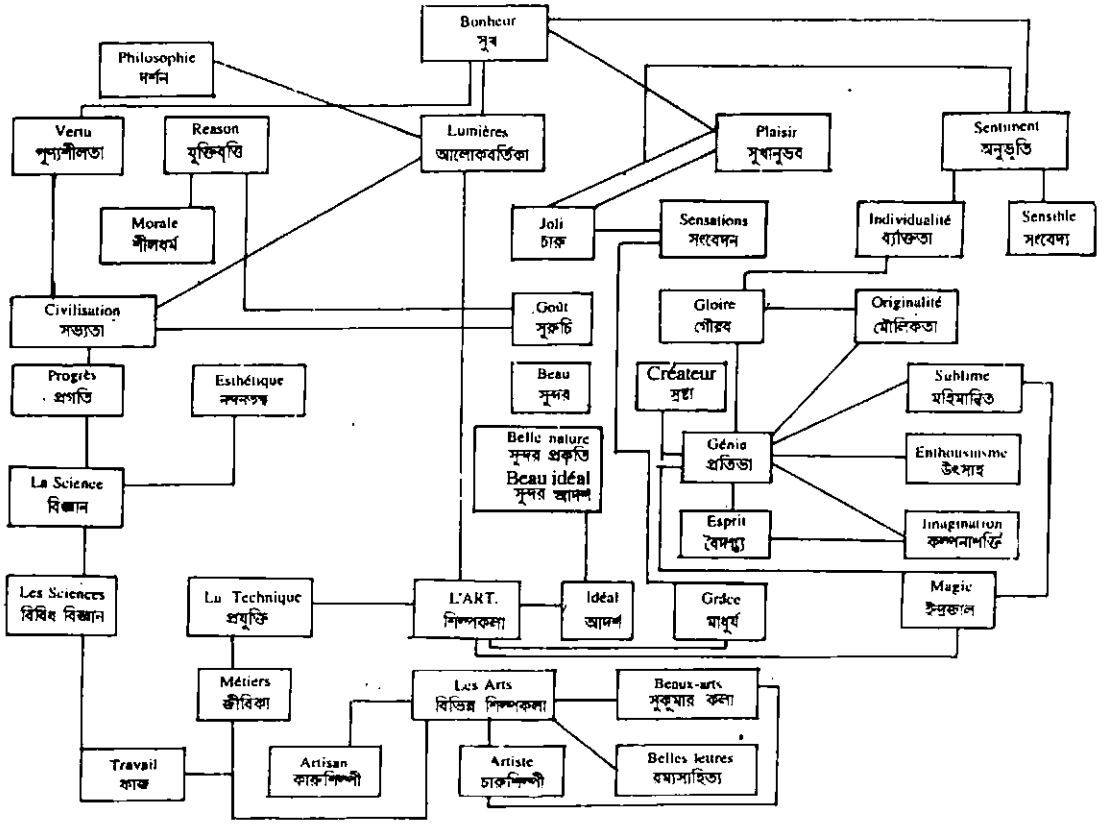

মাতোরের শব্দমানচিত্র

কাজেই দেখা যায় ট্রিয়ারের মতো মাতোরও শব্দের বিচ্ছিন্ন ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না । তিনি শব্দাবলীকে বাগর্থিক ক্ষেত্রের অধীনে এনে সমাজবাস্তবতার নিরিখে তাদের বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী ছিলেন । জাহাঙ্গীর তারেক(১৯৯৮ ঃ ৬৯) ট্রিয়ার ও মাতোরের কাজের পার্থক্য নির্ণয়ে বলেন "ট্রিয়ারের পর্যেষণার বিষয় প্রধানত একটি জাতি বা একটি যুগের আত্মা বা মানসকে অনুধাবন করার লক্ষ্যে তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন । আর মাতোরের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু মূলত শব্দভান্ডারের বস্তুগত, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধঃস্তর ।"

Dhaka University Institutional Repository

মূলনীতি ও সমস্যা ঃ ভাষিক শব্দভান্ডারের ঐক্য ও বিভাজ্যতা ক্ষেত্রতত্ত্বের মূলনীতি হিসাবে কাজ করেছে। বাগর্থিক ক্ষেত্রের ধারণা নিঃসন্দেহে সাংগঠনিক বাগর্থবিদ্যাকে সমৃদ্ধি দান করেছে। তবে এর কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, এক শব্দের সাথে আরেক শব্দের এবং এক ধারণার সাথে আরেক ধারণার সম্পর্কটি খুব সুস্পষ্ট নয়। ফলে বাগর্থিক ক্ষেত্র বিশ্লেষণ প্রায়শই ধোঁয়াশাপূর্ণ মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, বাগর্থিক ক্ষেত্র বিশ্লেষণের কোন সুসংজ্ঞায়িত নীতিমালা নেই। ফলে ক্ষেত্রতত্ত্ব ব্যাক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার ফসল বলেই প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয়ত, বাগর্থিক ক্ষেত্র শব্দার্থের আংশিক চিত্র তুলে ধরে। এটি কোন সামগ্রিক বাগর্থিক তত্ত্বের দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়।

আচরণবাদী তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর শুরুটা ছিল যৌক্তিক ইতিবাচকতাবাদের জয়-জয়কারে মুখরিত। যৌক্তিক ইতিবাচকতাবাদের মূলকথা ছিল যা কিছু পর্যবেক্ষণসম্ভব ও অভিজ্ঞতামূলকভাবে যাচাইযোগ্য তাই বিজ্ঞান সম্মত এবং বাকি সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সমস্ত শাস্ত্রই এর প্রভাবে কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে এবং গবেষনার দিক নির্দেশনা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করেছে। প্রতিটি শাস্ত্রই বৈজ্ঞানিক মর্যাদা অর্জনের জন্য উঠে পড়ে লাগে। বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠার অভিযাত্রায় যে সমস্ত শাস্ত্র যৌক্তিক ইতিবাচকতাবাদের দাবি পূরণ করতে পারেনি তারা স্বীকার হয় অবিশ্বাস ও অবহেলার। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতির ভাগ্যে জোটে অবমূল্যায়ন। মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় অবৈজ্ঞানিক চর্চার, কারণ তা মন, চিন্তা, ধারণা, ভাব প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ-অসম্ভব মানসিক প্রপঞ্চ নিয়ে কারবার করে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য কতিপয় মনোবিজ্ঞানী প্রবর্তন করেন আচরণবাদ, যা মানুষের আচরণকে একটি যান্ত্রিক কৌশলে ব্যাখ্যার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্যাভলভের প্রাণী আচরণ সংক্রান্ত পরীক্ষণ আচরণবাদের রসদ হিসাবে কাজ করে। প্যাভলভ দেখান যে উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে ; শিক্ষা হলো নতুন উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। মনোবিজ্ঞানে আচরণবাদী তত্ত্ব নির্মানে এই ধারণাটিকে কাজে লাগান ওয়াটসন যিনি পরবর্তীকালে আচরণবাদের গুরু বলে আখ্যায়িত হন। ওয়াটসনের মতে বস্তু যেমন প্রাণীর আচরণে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, শব্দও তেমনি প্রাণীর আচরণে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন শব্দ শুনলে কোন ব্যক্তির মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাই হলো ঐ শব্দটির অর্থ। মনোবিজ্ঞান থেকে ভাষাবিজ্ঞানে এই আচরণবাদী ধারণা নিয়ে আসেন প্রখ্যাত আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড। তার উদ্দেশ্য ছিল ভাষাকে তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতরে নিয়মবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করা এবং ভাষাবিজ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। ভাষার অর্থকে তাই তিনি চৈতন্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা না করে যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার প্রয়াস পান। তিনি বলেন, কোন ভাষিক রূপের অর্থ হলো সেই পরিস্থিতি যাতে বক্তা তা উচ্চারণ করে এবং শ্রোতা তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করে।[১] তিনি অর্থকে তিনটি অংশে ভাগ করেন ঃ (১) বক্তার পরিস্থিতি, (২) বক্তব্য, এবং

[১] "We have defined the meaning of a linguistic form as the situation in which the speakers utters it and the response which it calls forth in the hearer." Bloomfield (1933), *Language*, p.139

Dhaka University Institutional Repository

(৩) শ্রোতার সাড়া । এই তিনটি অংশ কারণিক সম্পর্কে আবদ্ধ, অর্থাৎ বক্তার পরিস্থিতি বক্তব্য উৎপাদন করে এবং বক্তব্য শ্রোতার সাড়া সৃষ্টি করে । এই সম্পর্কটিকে তিনি এভাবে প্রদর্শন করেন ঃ

বক্তার পরিস্থিতি ⇛ বক্তব্য ⇛ শ্রোতার সাড়া

ব্লুমফিল্ড একটি গল্পের মাধ্যমে অর্থের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেন । জ্যাক (ছেলে) এবং জিল (মেয়ে) রাস্তা দিয়ে হাঁটছে । জিল গাছে একটি আপেল দেখতে পায় ও ক্ষুধা অনুভব করে । ফলে সে জ্যাককে আপেলটি পেড়ে আনতে বলে । জ্যাক গাছে ওঠে এবং জিলকে আপেলটি পেড়ে দেয় । জিল তা খায় । এই পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি জিলের আপেলটি দেখা ও ক্ষুধা অনুভব করা হলো উদ্দীপক (S = stimulus) ; জিল যদি সরাসরি গাছে উঠে নিজে আপেলটি পাড়তো তবে তা হতো প্রত্যক্ষ সাড়া (R = response) ; কিন্তু তা না করে সে কিছু শব্দ উচ্চারণ করে (r) ; পরিনামে এটি আবার জ্যাকের জন্য উদ্দীপক হিসাবে কাজ (s) ; যার ফলে জ্যাক আপেলটি পেড়ে এনে দেয় (R) ; পুরো পরিস্থিতিটিকে এভাবে দেখাবো যায় ঃ

S → r ..... s → R

ইংরেজী বড় ও ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে এখানে উদ্দীপক ও সাড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে । S ও R -এর মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক নেই, এদুটি সম্পর্কিত হয়েছে মধ্যবর্তী r ও s দ্বারা । এখানে r ..... s হলো বক্তব্য, S হলো বক্তার পরিস্থিতি এবং R হলো শ্রোতার সাড়া ।

ব্লুমফিল্ডের তত্ত্ব যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকটিত করে । তিনি বলেন যে যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার অর্থ কোন মানসিক প্রতিরূপ কিংবা নিছক অনুভূতি নয়, এটি হলো শরীরী আন্দোলন, যা ত্রিবিধ উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ।

প্রথমত, এটি হলো বড় ধরনের প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন লোকের মধ্যে একইভাবে প্রকাশিত হয় এবং যা সমাজনির্ধারিত প্রচলিত ভাষারূপে ব্যক্ত হয় ।

দ্বিতীয়ত, এটি হলো অস্পষ্ট ও পরিবর্তনীয় ছোট মাপের পেশীগত সংকোচন ও গ্রন্থিশত নিঃসরণ যা প্রচলিত ভাষারূপে ব্যক্ত হয় না ।

তৃতীয়ত, এটি হলো বাকপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন যা বাচিক আন্দোলনের বিকল্প এবং যা অন্য কারো সংবেদনের বাইরে ।

কাজেই ব্লুমফিল্ডের মতে ভাষার অর্থের জন্য বক্তার পরিস্থিতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । বক্তার সামগ্রিক আচরণ (অন্তর্গত ও বহির্গত) পর্যবেক্ষণ করে ভাষার অর্থ সম্পর্কে জানা যেতে পারে । তিনি বলেন ঃ

> "ভাষার প্রতিটি রূপের অর্থের বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক সংজ্ঞা দিতে হলে বক্তার পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে । কিন্তু তুলনামূলকভাবে মানবজ্ঞানের সত্যিকার পরিধি অত্যন্ত কম ।"●

● "We have defined the meaning of a linguistic form as the situation in which the speakers utters it and the response which it calls forth in the hearer." Bloomfield (1933), *Language*, p.139

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য ব্লুমফিল্ড মনে করেন ভাষাবিশ্লেষণে অর্থ হলো সবচেয়ে দুর্বল জায়গা এবং মানুষের জ্ঞানের সুদূরপ্রসারী অগ্রগতি ব্যতিত এ অবস্থার নিরসন হবে না।●

ব্লুমফিল্ডের পর অনেকেই আচরণবাদ নিয়ে কাজ করেছেন এবং তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন স্কিনার, নোবল, অসগুড, কোয়াইন, মরিস, স্টিভেনসন প্রমুখ। কোয়াইন উদ্দীপক সাড়া সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তার বাগর্থিক তত্ত্ব নির্মান করেন এবং আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সংকেতায়ন ও প্রকাশনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন (Lyons 1977: 131; Kempson 1977: 49)। স্টিভেনসন আচরণবাদী ধারণার মাধ্যমে সংকেতের অর্থ নির্ধারণে ব্যাপৃত হন এবং বলেন যে কোন সংকেতের অর্থ হলো তার মনোবৃত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য (দাস ১৯৯৫ ঃ ২৩২)। মরিসও মনোবৃত্তির ধারণার মাধ্যমে অর্থকে সংজ্ঞায়িত করেন। তিনি বলেন যে কোন শব্দ শ্রবন করলে শ্রোতার মধ্যে যে মনোবৃত্তির উদয় হয় তাই হলো শব্দটির অর্থ। যেমন কেউ যদি বলে *এখানে আসো* তাহলে শ্রোতা এর অর্থ বুঝতে পারে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সৃষ্ট মনোবৃত্তির মাধ্যমে। এখন একটি নির্দিষ্ট অবস্থার ভিতর *এখানে আসো* যে কেউ উচ্চারণ করুক না কেন তার অর্থ হবে একই। কাজেই মরিসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী অর্থ হলো সেই আচরণগত দিক যা একটি শব্দ বা বাক্যের সকল প্রয়োগে সাধারণভাবে খুঁজে পাওয়া যায় (Alston: 1964:38-39)।

স্কিনার আচরণবাদের একজন বড় প্রবক্তা এবং ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তার বহুল আলোচিত Verbal Behaviour গ্রন্থটি। তার মতবাদ তিনটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ উদ্দীপক, সাড়া ও ঋজুকরণ। উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে যে আকস্মিক সম্পর্ক থাকে তা ঋজুকরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অনিবার্য সম্পর্কে পরিণত হয়। যেমন *শৃগাল* শব্দটি এবং তার দ্বারা নির্দেশিত জানোয়ারটির মধ্যে আমরা যে সম্পর্ক স্থাপন করি তা প্রথমে আসস্মিক থাকে কিন্তু শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় বার বার আবির্ভাবের ফলে তা ক্রমান্বয়ে একটি অনিবার্য সম্পর্কে পরিণত হয়। স্কিনারের মতে উক্তি হলো *বাঙ্‌মূলক কার্যক* যা পরিবেশ বা পরিস্থিতির উপর ক্রিয়া করে থাকে। বাঙমূলক কার্যক শব্দের সাথে সাড়ামূলক আচরণ বা জাগতিক বস্তুর একটি সম্পর্ক স্থাপন করে। একটি শব্দের সাথে তার দ্বারা নির্দেশিত অর্থের সম্পর্ক স্থাপনকে স্কিনার বলেছেন *কার্যক সাপেক্ষীকরণ*। এভাবেই স্কিনার কার্যক সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে মানুষের ভাষিক আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। (দ্রষ্টব্য Lyons 1977: 129-133)

আচরণবাদী তত্ত্বের প্রচারে ও প্রসারে ক্লাইড নোবল (১৯৫২/৬৭) বিশেষ ভূমিকা রাখেন। নোবলের মতে অর্থ হলো উদ্দীপনা S এবং সাড়া R -এর মধ্যে সম্পর্ক যা সূচিত হয় মধ্যবর্তী অভ্যাস H দ্বারা। অর্থাৎ অর্থ হলো S-H-R যে সংশ্রয়টি নোবল প্রকাশ করেন এভাবে ঃ α means β। নোবল লক্ষ্য করেন যে কোন শব্দ পরিস্থিতিভেদে বিভিন্ন উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করতে পারে এবং একেকটি উত্তর ব্যক্তির একেক রকম অভ্যাস গঠনের ফল। যেমন, *রান্নঘর* শব্দটি বললে কেউ মনে করতে পারে খাবার-দাবারের কথা, কেউ রান্নার কথা, কেউ চুলা ও হাড়িপাতিলের কথা, কেউ বুয়া বা বাবুর্চির কথা। এগুলো শুধু ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ব্যক্তিতে নয়, একইসাথে একই ব্যক্তির মধ্যে উদ্রেক হতে পারে। নোবল S-H-R সম্পর্কটি নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন ঃ

● "The statement of meanings is therefore the weak point in language-study, and will remain so until human knowledge advances very far beyond its present state." Bloomfield (1933), *Language*, p.140.

Dhaka University Institutional Repository

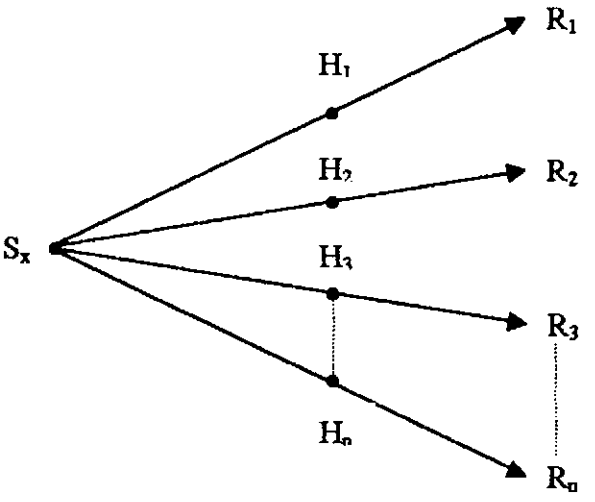

উদ্দীপক-অভ্যাস-সাড়া সম্পর্ক

(Noble 1967: 149)

উদ্দীপক, অভ্যাস ও সাড়ার সম্পর্কটি সব সময় প্রদর্শিত চিত্রের মতো হয় না, বরং প্রায়শই এটি জটিল আকার ধারণ করে । প্রাথমিকভাবে উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা পরিনামে জন্ম দিতে পারে আর একটি অনুরূপ সম্পর্কের । এক্ষেত্রে প্রাথমিক সাড়াটি উদ্দীপকে পরিণত হয় এবং ঋজুকৃত অভ্যাসের মাধ্যমে তা আরেকটি সাড়ার সাথে সম্পর্কিত হয় । যেমন, *রান্নাঘরের* কথা বললে কারো প্রথমে মেয়েমানুষের কথা মনে পড়তে পারে যা তাকে আবার কর্মের লৈঙ্গিক বৈষম্যের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে (যেমন ঘরে-বাইরে তত্ত্বের কথা, যেখানে বলা হয় নারীর কর্মক্ষেত্র হবে ঘর আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র হবে বাহির) । এরূপ জটিল অবস্থাকে নিম্নরূপ চিত্রে প্রকাশ করা যায় ঃ

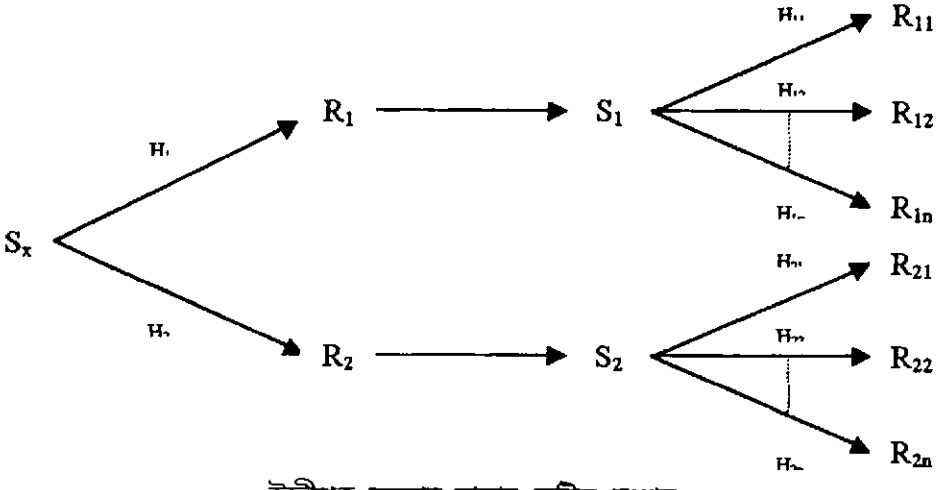

উদ্দীপক-অভ্যাস-সাড়ার জটিল সংশ্রয়

(Noble 1967: 154)

এভাবেই নোবল উদ্দীপক, অভ্যাস ও সাড়ার সংশ্রয়ের মাধ্যমে উদ্দীপকের অর্থ (stimulus meaning) ব্যাখ্যার প্রয়াস পান যা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ রূপমাত্র ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থের আচরণবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চার্লস অসগুডের (১৯৫২/৬৭) তত্ত্বটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অসগুড মধ্যবর্তিতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংকেতের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন উদ্দীপক-বস্তু জীবের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা উদ্দীপক-বস্তুর সংকেত দ্বারা ও সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি *মধ্যবর্তিতা প্রক্রিয়া* কাজ করে। মধ্যবর্তিতা প্রক্রিয়াটি শিক্ষণের সাথে যুক্ত। প্রাথমিকভাবে উদ্দীপক-বস্তু ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তা যখন শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীব সংকেত ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্থাপন করে তখন মধ্য বর্তিতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন, *তেলাপোকা* নামক বস্তুটির সাথে অস্বস্তিকর অনুভূতি, আতঙ্ক, ঘিনঘিন ভাব প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া যুক্ত থাকতে পারে। এখন তেলাপোকা শব্দটি শুনলেই কারো মধ্যে এরূপ প্রতিক্রিয়া (সাধারণত পূর্বের চেয়ে অল্পমাত্রায়) দেখা দিতে পারে। একইভাবে তেঁতুল দেখলে অনেকের জিবে জল আসে, এবং *তেঁতুল* শব্দটি শুনলেও অল্পবিস্তর একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। অসগুড প্রক্রিয়াটিকে নিম্নরূপ চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন ঃ

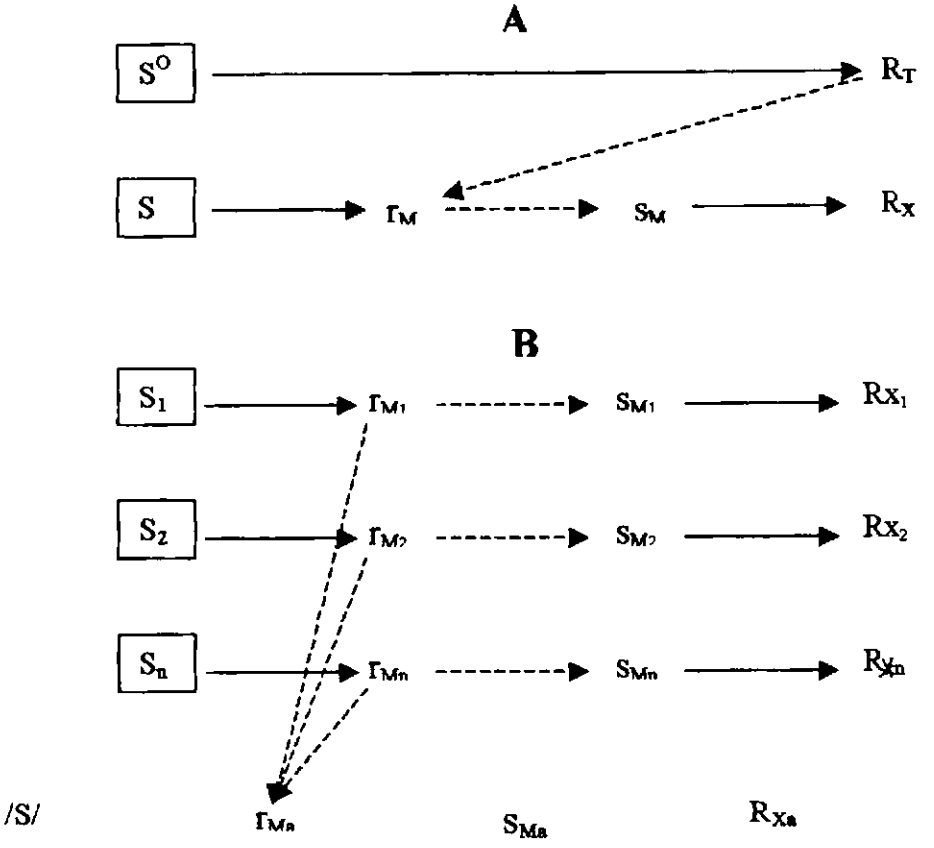

মধ্যবর্তিতা প্রক্রিয়া

(Osgood 1967: 162)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে A -তে সংকেতের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে । উদ্দীপক বস্তু ($\boxed{S^O}$ = stimulus object) প্রকাশ্য আচরণ (R_T = overt behaviour) এর সাথে সরলরেখায় সরাসরি সম্পর্কিত । প্রকাশ্য আচরণ পরে মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া (r_M = mediating reaction) রূপে বস্তুর সংকেত $\boxed{S}$ -এর সাথে যুক্ত হয়েছে । মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া আবার স্বতঃউদ্দীপনা (s_M = self stimulation) -য় রূপান্তরিত হয়ে জটিল আচরণ (R_X = complex behaviour) -এর উন্মেষ ঘটায় । B-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিসংকেতের অর্থ । এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে একাধিক মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া ($r_{M_1}, r_{M_2} \ldots r_{Mn}$) অন্য একটি জটিল মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া (R_{Ma}) -এর সাথে সম্পর্কিত হয় যে মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া যুক্ত থাকে কোন বাঙরূপ (/S/) -এর সাথে । অর্থাৎ বাঙরূপ (/S/) উদ্দীপক হিসাবে মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়া (r_{Ma}) উৎপাদন করে যা আবার স্বতঃ উদ্দীপনা (s_{Ma}) -য় পরিণত হয়ে নতুন জটিল আচরণ (R_{Xa}) কে অভিব্যক্ত করে । শিশুদের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিসংকেতের ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় । যেমন শিশুরা বই-তে বাঘের বিভিন্ন ছবি দেখে তার সম্পর্কে বর্ণনা পড়ে প্রাণীটি সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া তৈরী করে । তারপর শিক্ষক বা পিতামাতার কাছ থেকে যখন সে প্রাণীটির নামের উচ্চারণ শোনে ও শিখে তখন সে শব্দটির সাথে তার প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপন করে – তখন তাকে আর ছবি দেখা বা বর্ণনা পড়ার প্রয়োজন হয় না ।

এভাবেই অসগুড তার আচরণবাদী তত্ত্বে মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষা সংকেতের একটি যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পান ।

মূলনীতি ও সমস্যা ঃ সব আচরণবাদী তত্ত্বই সাধারণভাবে মানুষের ভাষা ব্যবহার ও অর্থের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত । এই তত্ত্বের একটি বড় গুণ অভিজ্ঞতামূলক যাচাইযোগ্যতা । প্রথমত, আচরণবাদ কোন রকম মানসিক প্রপঞ্চ বা অন্তরীক্ষণে বিশ্বাসী নয় । দ্বিতীয়ত, আচরণবাদ মানুষ ও অন্যান্য নিম্নতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করে না । তৃতীয়ত, আচরণবাদ শিক্ষণের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকার চেয়ে পরিবেশ ও প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয় । চতুর্থত, আচরণবাদ নিয়ন্ত্রণবাদী ভাবধারায় লালিত ; এতে সবকিছু কারনিক সম্পর্কে আবদ্ধ । আচরণবাদ বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় চালিত হলেও এর কিছু মারাত্মক ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে ।

প্রথমত, যদিও এটি চৈতন্যবাদকে অস্বীকার করে, তথাপি এটি অর্থের ব্যাখ্যার জন্য চৈতন্যবাদেরই শরনাপন্ন হয় । *মনোবৃত্তি, প্রতিক্রিয়া* এসব প্রত্যয় যত না শারীরিক বা পারিবেশিক তার চেয়ে বেশি মানসিক ।

দ্বিতীয়ত, একটি উদ্দীপকের সাথে বহুবিচিত্র সাড়া জড়িত থাকতে পারে ; তাদের সব অর্থ বলে স্বীকার করতে গেলে তা হয়ে উঠে অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাতীত ।

তৃতীয়ত, আচরণবাদ অর্থের একটি দূর্বল চিত্র তুলে ধরে । আদতে এটি উদ্দীপক-সাড়া দিয়ে যা ব্যাখ্যা করে তা অর্থই নয় । এটি মোটা দাগে ব্যাখ্যা করে মানুষের ভাষিক আচরণ যা ভাষার জটিল সংশ্রয়ের ধারেকাছেও যেতে পারে না ।

বস্তুতঃ অর্থ সম্পর্কে আচরণবাদী ব্যাখ্যা মোটেও সন্তোষজনক নয় । নিজেকে যতই বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবি করুক না কেন এটি শেষ পর্যন্ত চরম অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতীয়মান হয় । এটি অর্থকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাগর্থবিদ্যাকে এক নিদারুণ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয় । ফলে বাগর্থবিদ্যাকে অনেকে সন্দেহ করতে শুরু করে এবং অনেকে বাগর্থবিদ্যাকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করে । আচরণবাদের এই অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে বাগর্থবিদ্যার অনেকদিন সময় লেগেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ সম্পর্কসমূহ

কেবল উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ নয়, আমরা শব্দের সাথে শব্দের সম্পর্কের মাধ্যমেও তার অর্থ নির্ণয় করে থাকি । যেমন *রবি* শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা বলে থাকি *রবি অর্থ সূর্য* । একইভাবে *ঠান্ডা* বলতে *গরমের বিপরীত অবস্থাকে* বোঝাই এবং *হাসনাহেনা* কে বলি *এক ধরনের ফুল* । অর্থের দিক দিয়ে শব্দের সাথে শব্দের এরূপ সম্পর্ককে আমরা **অর্থ সম্পর্ক** বলি । একে অবশ্য কেউ কেউ **শাব্দিক সম্পর্ক** বলেও অভিহিত করে থাকেন (দ্রষ্টব্য George Yule 1996: 118)। আমরা এখানে চার ধরনের অর্থ সম্পর্ক আলোচনা করবো – সহনামিতা, প্রতিনামিতা, উপনামিতা ও অংশনামিতা । এ সম্পর্কগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে । ডি. এ. ক্রুজ (১৯৮৬ ঃ ৮৬-৮৮) সমতা সম্পর্কের মাধ্যমে এদের বিশ্লেষণের প্রয়াস পান । দুটি শ্রেণীবাচক শব্দের মধ্যে অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি চারটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন ঃ (১) দুটি শ্রেণী একই সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে, (২) একটি শ্রেণী অপরটির অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, (৩) দুটি শ্রেণীর কিছু সদস্য অভিন্ন হতে পারে এবং (৪) দুটি শ্রেণীর সদস্যরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পারে । এ চারটি সম্ভাবনাকে নিম্নরূপ চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় ঃ

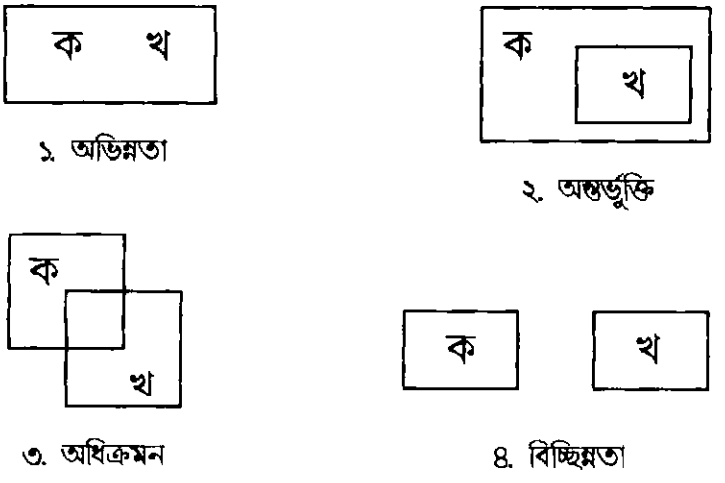

উপরের সম্পর্কসমূহ আমরা উদাহরণ সহযোগে বোঝার চেষ্টা করতে পারি । প্রথম ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান *সারমেয়* ও *কুকুর* -এর মধ্যে, দ্বিতীয় ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান *পাখি* ও *দোয়েল* -এর মধ্যে, তৃতীয় ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান *জ্ঞানী* ও *অশিক্ষিত* -এর মধ্যে এবং চতুর্থ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান *জীবিত* ও *মৃত* -এর মধ্যে । নীচে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো ।

সহনামিতা ঃ সহনামিতাকে বাংলায় সমার্থকতা বা প্রাতিশব্দ্যও বলা হয়ে থাকে এবং আমরা যাকে সহনাম বলবো তাকে বলা হয় সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ । দুটি শব্দের মধ্যে যখন অর্থগত মিল থাকে তখন আমরা একটিকে অপরটির সমনাম বলে থাকি । কিন্তু বাস্তবে দুটি শব্দের মধ্যে কতটুকু অর্থগত মিল থাকতে পারে ? পুরোপুরি মিল খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়, সচরাচর পাওয়া যায় আংশিক মিল । এজন্যই বলা হয় প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

সহনামিতা বলতে কিছু নেই । একটি ভাষায় দুটি শব্দের মধ্যে অবিকল একই রকম অর্থ থাকতে পারে না । পামার (১৯৮১ ঃ ৮৯) বলেন, "আদতে এটি অসম্ভব যে ঠিক একই অর্থবিশিষ্ট দুটি শব্দ একসাথে ভাষায় বেঁচে থাকবে ।"● উলম্যান (১৯৫৭ ঃ ১০৮ / তারেক ১৯৯৩ ঃ ১১৫) -এর ভাষায়, "এটি প্রায় একটি স্বতঃপ্রমাণিত সত্য যে সার্বিক সহনামিকতা একটি অতিবিরল ঘটনা, এ এমন এক বিলাসিতা যার দায় বহন করা ভাষার পক্ষে কঠিন ।"

সহনামিতার বিবেচনার মোটামুটি চারটি বিষয় আসতে পারে ।

প্রথমত, যেগুলোকে আমরা সহনাম বলি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিভিন্ন উপভাষার অন্তর্ভুক্ত । বাংলাদেশে *মাঠ* এবং *কোলা* এই অর্থে সমার্থক যে মাঠ মানবাংলায় প্রায় সর্বত্র প্রচলিত, কিন্তু কোলা শব্দটি বাংলাদেশের দক্ষিণে বরিশাল, বরগুণা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত । ইংল্যান্ডে যা lift আমেরিকাতে তা elevator , ইংল্যান্ডে যা fuel আমেরিকাতে তা gasoline ।

দ্বিতীয়ত, দুটি সহনামের মধ্যে শৈলিগত ভিন্নতা থাকতে পারে । যেমন *প্রহার* ও *ধোলাই* এ দুটি শব্দের মধ্যে প্রথমটি ভদ্র শৈলিতে এবং দ্বিতীয়টি অভদ্রশৈলিতে ব্যবহৃত হয় ।

তৃতীয়ত, দুটি সহনামের মধ্যে আবেগাত্মক বা আনুভূতিক অর্থের পার্থক্য থাকতে পারে । যেমন *চালাক* ও *চতুর* -এর অর্থ এক হলেও দ্বিতীয়টি নেতিবাচকতার প্রতীক ; ফলে কাউকে চালাক বললে খুশি হয়, কিন্তু চতুর বললে রাগ করে ।

চতুর্থত, দুটি শব্দের অর্থ এক থাকলেও তাদের মধ্যে সহাবস্থানিক পার্থক্য থাকতে পারে । যেমন *গলদ* শব্দটি *গোড়া* -র সাথে ব্যবহৃত হয় অথচ *ত্রুটি* শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না, ফলে *গোড়ায় গলদ* গ্রহণযোগ্য কিন্তু *গোড়ায় ত্রুটি* গ্রহণযোগ্য মনে হয় না । হাডসন ও অন্যান্য (১৯৯৭) ইংরেজী ভাষার বিভিন্ন শব্দ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখান যে দুটি সহনাম কখনোই সম্পূর্ণ একই ধরনের সহাবস্থানগত ভাষিক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে না ।

কাজেই আমরা কড়াকড়ি অর্থে ও হালকা অর্থে সহনামিতার কথা বলতে পারি । হালকা অর্থে দুটি সহনামের মধ্যে অংশত মিল ও অমিল থাকতে পারে । কিন্তু কড়াকড়ি অর্থে দুটি সহনামের মধ্যে উপভাষিক, শৈলিগত, আবেগিক, সহাবস্থানিক কোন রকম পার্থক্য থাকতে পারবে না । প্রাত্যাহিক জীবনে আমরা সহনামিতাকে হালকা অর্থেই গ্রহণ করে থাকি । আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য অভিধান প্রণেতারাও হালকা অর্থে শব্দের প্রতিনাম সরবরাহ করে থাকেন ।

অনেকেই মনে করেন সহনামিতা একটি মাত্রার ব্যাপার । মাপনরেখায় দুটি সহনামের অবস্থান কাছাকাছি হতে পারে, আবার দূরবর্তী হতে পারে (Lyons 1968: 447) ।

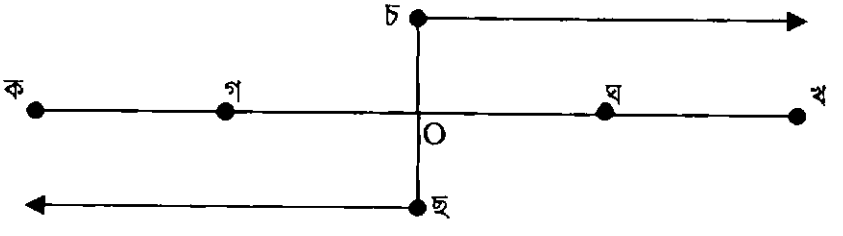

● "Indeed it would seem unlikely that two words with exactly the same meaning would both survive in a language." F.R. Palmer (1981), *Semantics*, p.89.

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ০ বিন্দুটি পরিপূর্ণ সহনামিতার প্রতীক। কাজেই চ ও ছ পরস্পরের পরিপূর্ণ সহনাম। শূন্য বিন্দু থেকে আনুভূমিক দূরত্ব যতো বাড়ে দুটি সহনামের মধ্যে পার্থক্য ততোই বাড়তে থাকে। কাজেই এখানে সহনাম হিসাবে গ এবং ঘ -এর মধ্যে যতটুকু পার্থক্য, ক এবং খ -এর মধ্যে পার্থক্য তার চেয়ে বেশি। লিয়ন্স **সম্পূর্ণ সহনামিতা** ও **সামগ্রিক সহনামিতা**র মধ্যে পার্থক্য করেন। দুটি সহনামের অর্থের মধ্যে যখন কোন আবেগগত পার্থক্য থাকে না, যদিও তাদের মধ্যে সহাবস্থানিক সম্পর্ক থাকতে পারে, তখন তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সহনামিতার সম্পর্ক বিরাজ করে। আর দুটি সহনামের মধ্যে যখন আবেগগত বা সহাবস্থানিক কোন পার্থক্যই থাকে না তখন তাদের মধ্যে সামগ্রিক সহনামিতার সম্পর্ক বিরাজ করে। এই বিভাজন মেনে নিলে চার ধরনের সহনামিতা পাওয়া যাবে ঃ

(১) সম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক সহনামিতা,
(২) সম্পূর্ণ কিন্তু অসামগ্রিক সহনামিতা,
(৩) অসম্পূর্ণ কিন্তু সামগ্রিক সহনামিতা, এবং
(৪) অসম্পূর্ণ এবং অসামগ্রিক সহনামিতা।

প্রতিনামিতা ঃ প্রতিনামিতাকে বিপরীতার্থকতা বা বিরোধিতাও বলা হয়। প্রতিনামিতা বলতে বোঝায় অর্থের বৈপরীত্যকে। প্রতিনামিতা দু'ধরনের হতে পারে – ক্রমিক ও অক্রমিক। ছোট-বড়, লম্বা-খাটো, ধনী-গরীব, ঠান্ডা-গরম প্রভৃতি **ক্রমিক প্রতিনামিতা**র দৃষ্টান্ত এবং নারী-পুরুষ, জীবিত-মৃত, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি **অক্রমিক প্রতিনামিতা**র দৃষ্টান্ত। ক্রমিক প্রতিনামিতার তুলনামূলক পরিমাপ সম্ভব এবং এটি অক্রমিক প্রতিনামিতার মতো মধ্যবর্তী সম্ভাবনাকে নাকচ করে না। যেমন, আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হয় *অপেক্ষাকৃত ছোট বা বড়*, কিন্তু *অপেক্ষাকৃত নারী বা পুরুষ* বলা সম্ভব হয় না। ক্রমিক প্রতিনামসমূহকে একটি মাপনরেখায় স্থাপন করে তাদের ক্রম পরিমাপ করা সম্ভব। প্রতিনামগুলো একটি কেন্দ্রীয় এলাকা থেকে বিপরীত অভিমুখে সঞ্চারণশীল। ধীর-দ্রুত এই দুটি প্রতিনামকে মাপনরেখায় স্থাপন করলে এরকম হবে ঃ

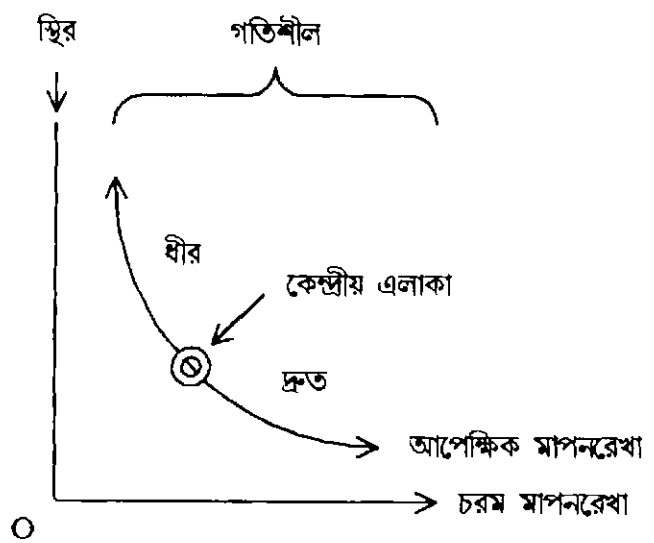

ধীর-দ্রুত প্রতিনামিতা সম্পর্ক

(D. A. Cruse 1986: 205)

Dhaka University Institutional Repository

ক্রুজ চার ধরনের প্রতিনামের কথা বলেন – মেরুমূলক, অধিক্রমনমূলক, সমানাধিকারক ও ব্যক্তিগতক ।

মেরুমূলক প্রতিনাম ঃ এক্ষেত্রে প্রতিনামগুলোকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করা যায় । যেমন, *ভারী-হালকা* -র ক্ষেত্রে আমরা ওজন করে বলতে পারি কোন বস্তু কতটুকু ভারী এবং নির্দিষ্ট ওজনের কম হলে আমরা বলতে পারি বস্তুটি হালকা ।

অধিক্রমনমূলক প্রতিনাম ঃ এক্ষেত্রে প্রতিনামদ্বয়ের একটি হয় প্রশংসাসূচক এবং অন্যটি হয় নিন্দাসূচক । যেমন ঃ ভালো-মন্দ, ভদ্র-অভদ্র, দয়ালু-নির্দয়, পরিস্কার-নোংরা, নিরাপদ-ঝুঁকিপূর্ণ, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী ইত্যাদি ।

সমানাধিকারক প্রতিনাম ঃ এক্ষেত্রে প্রতিনামগুলো ব্যক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে । যেমন ঃ সুখী-দুখী, নিরপেক্ষ-পক্ষপাতমূলক, সুশ্রী-কুশ্রী, মনোহর-বিরক্তিকর ইত্যাদি ।

ব্যক্তিগতক প্রতিনাম ঃ এক্ষেত্রে আবেগিক অর্থ এত বেশি কাজ করে যে প্রতিনামদুটোর সম্পর্ক অনন্য বলে প্রতিভাত হয় । মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকার, সৎ-ঘুষখোর, মোটকা-শুটকি প্রভৃতির ব্যক্তিগতক প্রতিনামের দৃষ্টান্ত ।

অক্রমিক প্রতিনামিতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো **পরিপূরকতা** । পরিপূরকতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এতে একটি ধারণাগত অঞ্চল প্রতিনামগুলো দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয় যার ফলে কোন মাঝামাঝি অবস্থা থাকে না যেখানে অন্য কোন শব্দ অবস্থান নিবে । যেমন কেউ জীবিত না হলে সে মৃত হবে, কেউ বিবাহিত না হলে অবিবাহিত হবে, কেউ ডানহাতী না হলে বামহাতী হবে, কেউ কৃতকার্য না হলে অকৃতকার্য হবে, কেউ না ঘুমালে জেগে থাকবে, কেউ ভুল না করলে অবশ্যই শুদ্ধ হবে । পরিপূরকতা বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে যেমন হতে পারে, ক্রিয়ার মধ্যেও হতে পারে । ক্রুজ (১৯৮৬ ঃ ২০২) ক্রিয়াপদের পরিপূরকতাকে চারভাগে বিভক্ত করেন – উল্টোমুখী, মিথক্রিয়ামূলক, সন্তুষ্টিমূলক ও বিপরীতক্রিয়ামূলক ।

উল্টোমুখী পরিপূরকতা ঃ এক্ষেত্রে প্রতিনামদুটি দুই বিপরীতমুখী পরিবর্তন সূচিত করে । যেমন ঃ শুরু করা-শেষ করা, শেখা-ভোলা, আগমন করা-স্থানত্যাগ করা, উপার্জন করা-ব্যয় করা । উল্টোমুখী পরিপূরকতাকে ত্রিপাক্ষিক সম্পর্কেও দেখানো যায়, যার ফলে ধারণাগত অঞ্চলটি দুটি ভাগে বিভক্ত না হয়ে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে । যেমন ঃ শুরু করা-চালিয়ে যাওয়া-শেষ করা, শেখা-মনে রাখা-ভোলা, আগমন করা-অবস্থান করা-স্থানত্যাগ করা, উপার্জন করা-সঞ্চয় করা-ব্যয় করা ।

মিথক্রিয়ামূলক পরিপূরকতা ঃ এক্ষেত্রে প্রতিনামদুটি উদ্দীপক-সাড়া সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে । যেমন ঃ আদেশ করা-মান্য করা, আবেদন করা-নাকচ করা, আমন্ত্রন করা-গ্রহণ করা, শুভেচ্ছা জানানো-প্রতিশুভেচ্ছা জানানো, প্ররোচিত করা-প্ররোচিত হওয়া । এখন উদ্দীপকের জবাবটিকে যদি দ্বিধাবিভক্ত করা হয় তাহলে একটি ত্রয়ী সম্পর্ক পাওয়া যাবে । যেমন ঃ আদেশ করা-মান্য করা-অমান্য করা, আবেদন করা-মঞ্জুর করা-নাকচ করা, আমন্ত্রন করা-গ্রহণ করা-ফিরিয়ে দেয়া, শুভেচ্ছা জানানো-প্রতিশুভেচ্ছা জানানো-এড়িয়ে যাওয়া, প্ররোচিত করা-প্ররোচিত হওয়া-সামলানো ।

সন্তুষ্টিমূলক পরিপূরকতা ঃ এক্ষেত্রে দুটি প্রতিনামের একটি কর্মের প্রচেষ্টা ও অপরটি কর্মসম্পাদন নির্দেশ করে । যেমন ঃ চেষ্টা করা-সফল হওয়া, সন্ধান করা-খুঁজে পাওয়া, প্রতিযোগিতা করা-জয়ী হওয়া, তাক করা-লক্ষ্যভেদ করা । এক্ষেত্রেও কর্মসম্পাদনের বিপরীতে ব্যর্থতার কথা বললে একটি ত্রয়ী সম্পর্ক সৃষ্টি হবে । যেমন ঃ চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করা-সফল হওয়া-ব্যর্থ হওয়া, সন্ধান করা-খুঁজে পাওয়া-হারিয়ে ফেলা, প্রতিযোগিতা করা-জয়ী হওয়া-পরাজিত হওয়া, তাক করা-লক্ষ্যভেদ করা-লক্ষ্যে না লাগা ।

বিপরীতক্রিয়ামূলক পরিপূরকতা ঃ এক্ষেত্রে একটি প্রতিনাম আক্রমন নির্দেশ করে এবং অন্যটি প্রতিআক্রমন নির্দেশ করে । যেমন ঃ ধাওয়া করা-পাল্টা ধাওয়া করা, অভিযোগ করা-পাল্টা অভিযোগ করা, ঘুষি মারা-পাল্টা ঘুষি মারা, গোলপোষ্টে বল মারা-বল ফিরিয়ে দেয়া । কিন্তু আক্রমনের জবাবটি যদি প্রতিআক্রমনমূলক না হয়ে নতিস্বীকারমূলক হয় তাহলে সম্পর্কের ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে । যেমন ঃ ধাওয়া করা-পাল্টা ধাওয়া করা-ধাওয়া খাওয়া, অভিযোগ করা-পাল্টা অভিযোগ করা-অভিযুক্ত হওয়া, ঘুষি মারা-পাল্টা ঘুষি মারা-ঘুষি খাওয়া, গোলপোষ্টে বল মারা-বল ফিরিয়ে দেয়া-গোল খাওয়া ।

অন্য এক ধরনের অক্রমিক প্রতিনামিতা হলো **অভিমুখী বিরোধিতা** । অভিমুখী বিরোধিতার ক্ষেত্রে প্রতিনাম দুটি দুই বিপরীত দিক নির্দেশ করে । যেমন ঃ উপরে-নীচে, দূরে-কাছে, সামনে-পিছনে, ডানে-বায়ে ইত্যাদি । অভিমুখী বিরোধিতা দুধরনের হতে পারে – বিরোধপ্রান্তিক ও বিপরীতপ্রান্তিক । **বিরোধপ্রান্তিকতা**র ক্ষেত্রে কতগুলি প্রতিনাম একটি সেটের অধীনে থাকে এবং একে অপরের সাথে বৈপরীত্য প্রকাশের মাধ্যমে পরস্পরকে সংজ্ঞায়িত করে । যেমন ঃ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিন এই চারটি প্রতিনামের পরস্পরের মধ্যে বিরোধপ্রান্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান । **বিপরীতপ্রান্তিকতা**র ক্ষেত্রে দুটি প্রতিনাম সরলরৈখিক বৈপরীত্য প্রকাশ করে । যেমন ঃ শীর্ষবিন্দু-সর্বনিম্নবিন্দু, মাথা-পা, সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন, প্রারম্ভ-সমাপ্তি ইত্যাদি ।

তৃতীয় ধরনের অক্রমিক প্রতিনামিতা হলো **বিপ্রতীপতা** । বিপ্রতীপতার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিনাম পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকে না । স্বামী-স্ত্রী, পিতা-সন্তান, বেঁচা-কেনা, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-রোগী প্রভৃতি বিপ্রতীপ সম্পর্কের উদাহরণ ।

কাজেই দেখা যায় প্রতিনামিতা একরূপ সম্পর্কের নাম নয়, প্রতিনামিতা বিচিত্রমূখী । এখানে আমরা প্রতিনামিতাকে যেভাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছি তা সংক্ষিপ্ত রূপে নীচের চিত্রে প্রকাশ করা হলো ঃ

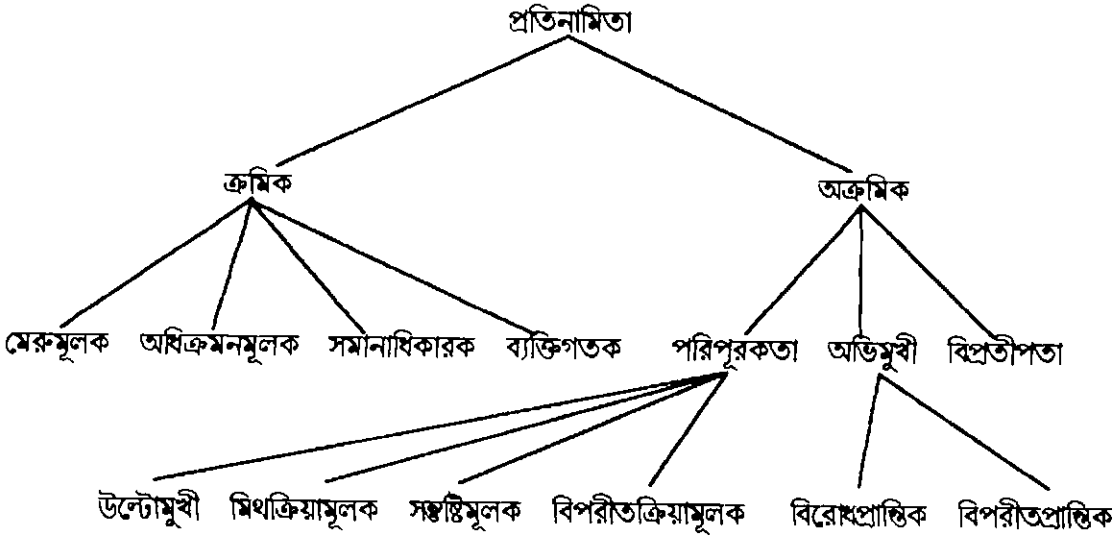

Dhaka University Institutional Repository

উপনামিতা ঃ দুটি শব্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্তির সম্পর্ককে করা বলা হয় উপনামিতা । যেমন ঃ গোলাপ–ফুল, হাতি–প্রাণী, লাউ–সব্জি, কড়ই–গাছ এই শব্দজোড়ের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান । এখানে ফুল গোলাপকে, প্রাণী হাতিকে, সব্জি লাউকে এবং গাছ কড়ইকে অন্তর্ভূক্ত করে । অর্থাৎ গোলাপ এক ধরনের ফুল, হাতি এক ধরনের প্রাণী, লাউ এক ধরনের সব্জি ইত্যাদি । কাজেই দেখা যায় উপনামিতাকে বর্ণনামূলকভাবে *এক ধরনের* বা *এক প্রকার* বলে প্রকাশ করা যায় ।

যখন আমরা উপনামিতার কথা বলি তখন আমরা শব্দসমূহের স্তরক্রমের দিকে ইঙ্গিত করি । স্তরক্রম ছাড়া উপনামিতা হতে পারে না । এজন্য দুটি শব্দের উপনামিতা প্রদর্শন করতে হলে তাদের স্তরক্রমিক সম্পর্ক দেখাতে হয় । যে কোন দুটি শব্দের স্তরক্রম কোন বৃহত্তর স্তরক্রমের অংশ (তার প্রমান বাগর্থিক ক্ষেত্র) । আমরা জীবিত পদার্থ, প্রাণী, উদ্ভিদ, জন্তু, পোকা, শাকসব্জি, ফুল, গাছ, ঘোড়া, কুকুর, সাপ, তেলাপোকা, পিঁপড়া, গাজর, ড্যাফোডিল, বট, পাইন প্রভৃতি শব্দকে স্তরক্রমে বিন্যস্ত করে ব্যাপারটি পরীক্ষা করতে পারি ঃ

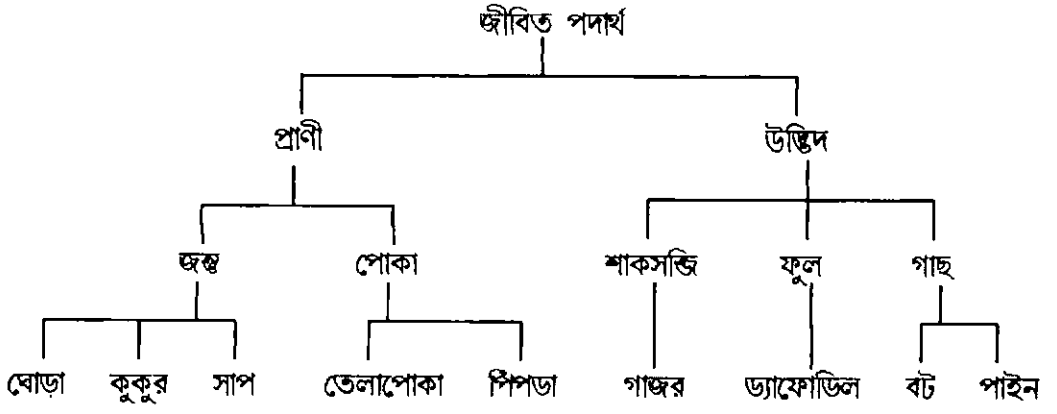

স্তরক্রমিক সম্পর্ক

(George Yule 1996: 119)

উপরের চিত্র থেকে আমরা ক্ষুদ্র পর্যায়ে উপনামিতার নিম্নরূপ তালিকা পাবো ঃ

প্রাণী < জীবিত পদার্থ	ঘোড়া < জন্তু	পিঁপড়া < পোকা	গাজর < শাকসব্জি
উদ্ভিদ < জীবিত পদার্থ	কুকুর < জন্তু	শাকসব্জি < উদ্ভিদ	ড্যাফোডিল < ফুল
জন্তু < প্রাণী	সাপ < জন্তু	ফুল < উদ্ভিদ	বট < গাছ
পোকা < প্রাণী	তেলাপোকা < পোকা	গাছ < উদ্ভিদ	পাইন < গাছ

এখানে প্রতিটি জোড়ে প্রথমটি অন্তর্ভূক্ত পদ এবং দ্বিতীয়টি অন্তর্ভূক্তকারী পদ । অন্তর্ভূক্ত পদকে পারিভাষিকভাবে বলা হয় **উপনাম** এবং অন্তর্ভূক্তকারী পদকে পারিভাষিকভাবে বলা হয় **উর্ধ্বনাম** । কোন উর্ধ্বনামের অধীনে একাধিক উপনাম থাকতে পারে । একই স্তরে অবস্থিত উপনামসমূহকে পরস্পরের **সহউপনাম** বলা হয় । উপরের উদাহরণে *বট* উপনাম এবং *গাছ* উর্ধ্বনাম এবং *বট* ও *পাইন* সহউপনাম । কেবল বিশেষ্য

Dhaka University Institutional Repository

বাচক শব্দ নয়, বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যেও উপনামিতা থাকতে পারে । যেমন – লাল, হলুদ প্রভৃতি *বর্ণ* -এর উপনাম, আবার কমলা, বেগুণি, প্রভৃতি *লাল* -এর উপনাম (দেখুন পৃষ্ঠ ৫৬) । অর্থাৎ সংক্ষেপে সম্পর্কটি এরকম ঃ

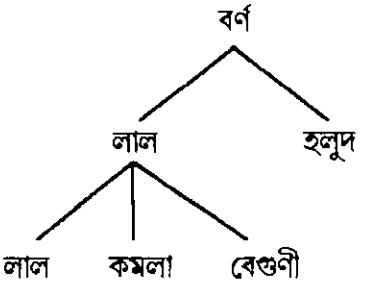

এখানে লক্ষ্যণীয় *লাল* একই সাথে *কমলা, বেগুণীর* উর্ধ্বনাম ও সহউপনাম । অর্থাৎ *কমলা, বেগুণী* লালের প্রকার হলেও এরা *লাল* -এর বাগর্থিক অঞ্চলের পুরোটা দখল করতে পারেনি ; কমলা, বেগুণীর বাইরের অবশিষ্ট লাল অঞ্চল লাল নামেই চিহ্নিত হয় ।

ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি *ঘর গোছানো, রান্না করা, খাবার পরিবেশন করা* প্রভৃতি উপনাম *ঘরকন্যার কাজ করা* উর্ধ্বনামের সাথে যুক্ত । *আঘাত করা* যদি উর্ধ্বনাম হয়, তবে তার উপনাম হতে পারে *লাথি মারা, ঘুষি মারা, চড় মারা, খোঁচা মারা, চাকু মারা, গুলি করা* (এরা পরস্পরের সহউপনাম) । (Hatch & Brown 1995: 67; Yule 1996: 120)

অংশনামিতা ঃ অংশনামিতা এক ধরনের স্তরক্রমিক সম্পর্ক যাতে অংশ ও সমগ্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় । যেমন ঃ পাতা-গাছ, পায়া-টেবিল, মাছ-পুকুর, ডানা-পাখি ইত্যাদি । উপনামিতার মতো অংশনামিতার ক্ষেত্রেও অন্তর্ভূক্তির ব্যাপার রয়েছে । তবে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে উপনামিতার ক্ষেত্রে শব্দজোড় *এক ধরনের* এরূপ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু অংশনামিতার ক্ষেত্রে *এক ধরনের* বর্ণনা প্রযোজ্য নয় । যেমন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে পাতা এক ধরনের গাছ, পায়া এক ধরনের টেবিল কিংবা মাছ এক ধরনের পুকুর । তবে এভাবে বলা সম্ভব হয় যে পাতা গাছের অংশ, পায়া টেবিলের অংশ অথবা পুকুরে মাছ থাকে, পাখির ডানা আছে ইত্যাদি । অংশনামিতা তাই আধার-আধেয় সম্পর্ক । গাছ, টেবিল, পুকুর, পাখি আধার এবং পাতা, পায়া, মাছ, ডানা আধেয় । অংশনামিতাকে মানব শরীরের গঠন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

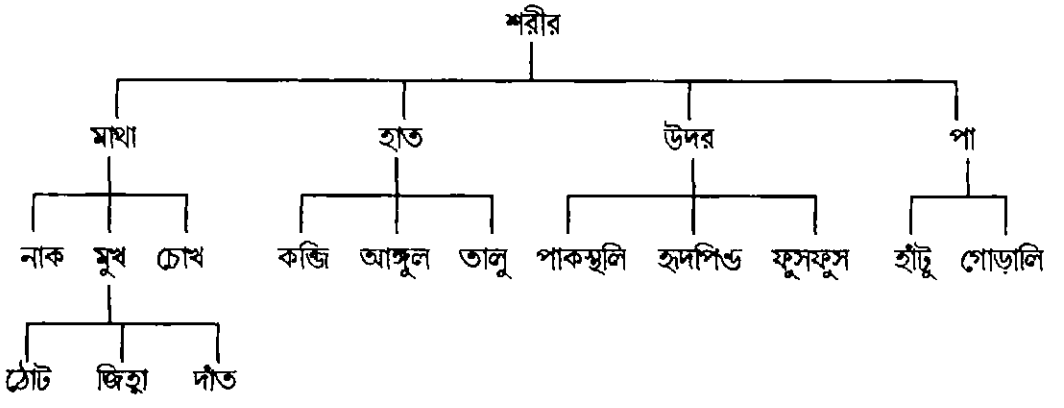

অংশনামিতা

Dhaka University Institutional Repository

উপরের স্তরক্রমের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই *মাথা, হাত, উদর, পা* শরীরের অংশ, *নাক, মুখ, চোখ* মাথার অংশ, *কব্জি, আঙ্গুল, তালু* হাতের অংশ, *পাকস্থলি, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস* উদরের অংশ, *হাঁটু, গোড়ালি* পায়ের অংশ এবং *ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত* মুখের অংশ । কাজেই আধেয়-আধার বিবেচনায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত উপনামিতার সাক্ষাৎ পাবো ঃ

মাথা < শরীর	মুখ < মাথা	কব্জি < হাত	ফুসফুস < উদর
হাত < শরীর	চোখ < মাথা	আঙ্গুল < হাত	হাঁটু < পা
উদর < শরীর	ঠোঁট < মুখ	তালু < হাত	গোড়ালি < পা
পা < শরীর	জিহ্বা < মুখ	পাকস্থলি < উদর	
নাক < মাথা	দাঁত < মুখ	হৃৎপিন্ড < উদর	

এখানে প্রতিটি জোড়ের প্রথমটিকে অর্থাৎ অংশকে পারিভাষিকভাবে বলা হবে **অংশনাম** এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সমগ্রকে বলা হবে **সমগ্রনাম** । একই নামের অধীনে একই স্তরে অবস্থিত অংশনামগুলো হবে পরস্পরের **সহঅংশনাম** । যেমন এখানে *ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত* সহঅংশনাম কারণ এগুলো মুখের অংশ এবং স্তরক্রমের একই স্তরে অবস্থিত । ক্রুজ লক্ষ্য করেন যে অংশনামিতা স্তরক্রমের সাথে জড়িত থাকলেও তা সুসংগঠিত স্তরক্রমের নিশ্চয়তা দিতে পারে না । শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন স্তরক্রমে বিভাজিত পদগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট দেয়াল থাকে এবং দুটি শাখা কখনোই এক সাথে মিলিত হয় না, অংশনামিতার ক্ষেত্রে স্তরক্রমে এরকম কড়াকড়ি কানুন নেই । যেমন ঃ

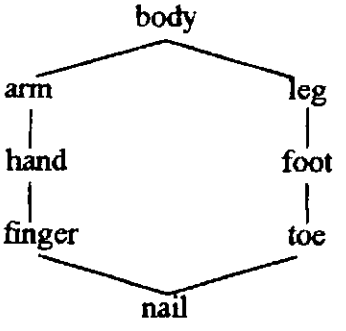

অংশনামিতার স্তরক্রম

(D.A. Cruse 1986: 170

এখানে দেখা যায় একদিকে *নখ* যেমন হাতের আঙ্গুল, অন্যদিকে পায়ের আঙ্গুলেরও অংশ এবং হাতের আঙ্গুল হাতের ও পায়ের আঙ্গুল পায়ের অংশ । এখানে আমরা নখকে যদি অংশনাম বলি, তাহলে হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলকে বলতে হবে **উচ্চঅংশনাম** ।

অংশনামিতা সঞ্চারমূলক হতে পারে, আবার অসঞ্চারমূলকও হতে পারে । যেমন cuff : sleeve : jacket -এর মধ্যে সঞ্চারমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান, কারণ sleeve -এর অংশ cuff এবং jacket -এর অংশ sleeve, ফলে jacket এর অংশ cuff । কিন্তু *হাতল ঃ চেয়ার ঃ ঘর* -এর মধ্যে অসঞ্চারমূলক সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান । কারণ এখানে *হাতল চেয়ারের* এবং *চেয়ার* ঘরের অংশ হলেও বলা যাবে না যে *হাতল ঘরের অংশ* । সঞ্চারমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীরী সংযুক্তি আবশ্যক, যার ফলে অংশ-সমগ্রের মধ্যে একটি শৃঙ্খল রচিত হবে । যেমন *সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর* -এর মধ্যে সময়ের শৃঙ্খল রয়েছে; ফলে এ সম্পর্কটি সঞ্চারমূলক ।

গুচ্ছপদের ক্ষেত্রে অংশনামিতা প্রযোজ্য হতে পারে । যেমন ঃ *গবাদিপশু, আসবাবপত্র, পরিবার* প্রভৃতি গুচ্ছপদ অংশনামীয় সম্পর্ক দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

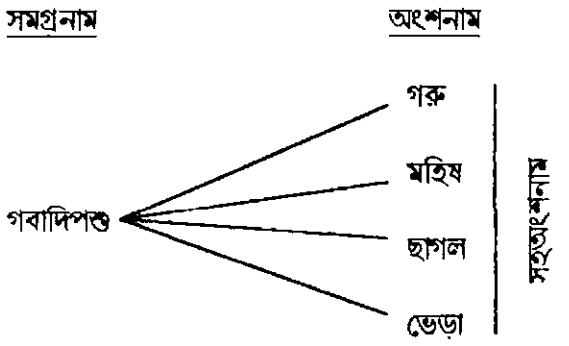

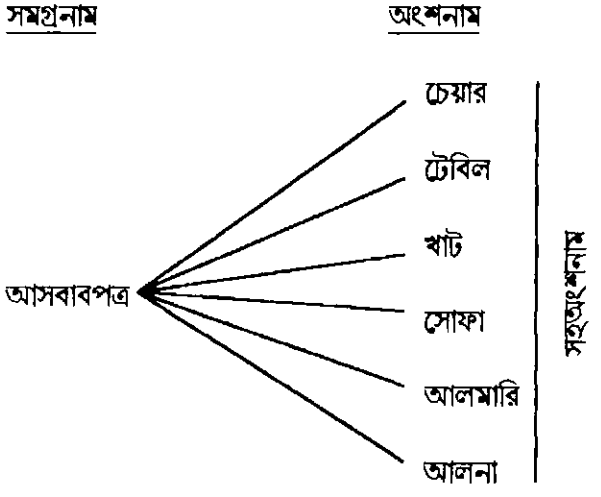

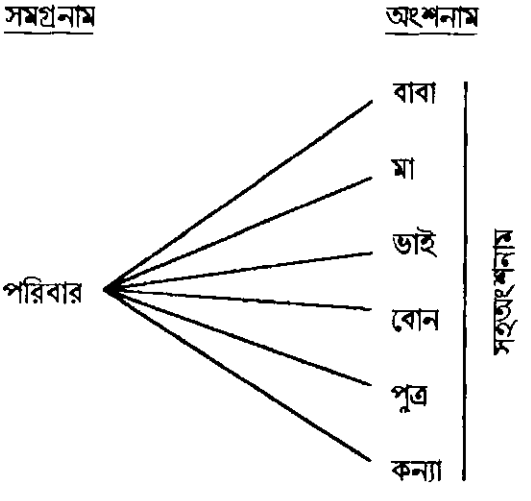

Dhaka University Institutional Repository

বাগর্থিক ভূমিকা

বাগর্থিক ভূমিকা দ্বারা বাক্যে শব্দের অর্থ নির্ধারিত হতে পারে । বাক্যে একটি বিশেষ্য পদ ক্রিয়াপদের সাথে যেরূপ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে তাকেই বাগর্থিক ভূমিকা বলে । কাজেই এটি হলো প্রথাগতভাবে বাংলায় যাকে আমরা কারক বলে থাকি অনেকটা তাই । বাগর্থিক ভূমিকা অর্থ নিয়ন্ত্রিত, তাই এর যথাযথ আলোচনা বাগর্থবিদ্যার কাজ ।

হাওয়ার্ড জ্যাকসন (১৯৯০ ঃ ২৩-৪৫) ক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করেন – অবস্থা, ঘটনা ও কর্ম এবং এই তিন ধরনের ক্রিয়ার সাথে বিশেষ্যের সম্পর্ক নির্ধারণ করেন । বিশেষ্যকে তিনি বলেন **অংশগ্রহণকারী** এবং বাক্যে বিশেষ্যের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ককে তিনি বলেন **অংশগ্রহণকারী ভূমিকা** । তিনি হওয়া (be), মনে হওয়া (seem), থাকা (have), শোনা (hear), ব্যথা হওয়া (ache) প্রভৃতি ক্রিয়াকে **অবস্থা** বলেন ; নিশ্বাস নেয়া (breathe), পড়ে যাওয়া (fall), আগমন করা (arrive), ভাসা (float), ঝিলমিল করা (shine), মরা (die) প্রভৃতি ক্রিয়াকে **ঘটনা** বলেন; এবং গান গাওয়া (sing), হাসা (laugh), নিক্ষেপ করা (throw), স্থির করা (decide), উৎসাহ দেয়া (encourage), ধাক্কা দেয়া (push), পরিস্কার করা (clean), প্রভৃতি ক্রিয়াকে বলেন **কর্ম** । অবস্থার জন্য জ্যাকসন নিম্নলিখিত অংশগ্রহণকারী ভূমিকা খুঁজে পান ঃ

১. **প্রাপক** ঃ প্রাপক বলতে কোন ব্যক্তিকে বোঝায় যার রয়েছে কোন বিশেষ গুণ বা সাময়িক বৈশিষ্ট্য অথবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (বুদ্ধিবৃত্তিক বা আবেগাত্মক) । যেমন ঃ

আমি ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম ।
করিম সাহেবের তিনটি গাড়ি আছে ।

২. **প্রভাবিত** ঃ প্রভাবিত বলতে কোন বস্তুকে বোঝায় যা একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থায় আছে অথবা কোন ব্যক্তিকে বোঝায় যে কোন শরীরি সংবেদন অনুভব করছে; অথবা এটি দ্বারা বোঝায় জ্ঞান, ভাবাবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রভৃতি যা কোন প্রাপকের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে । যেমন ঃ

তারেককে খুব হতাশ মনে হলো না ।
তার মাথা ধরেছে ।

৩. **অবস্থানক** ঃ অবস্থানক বলতে বোঝায় কোন ব্যাক্তি বা প্রাণীকে যে কোন একটি স্থানে অবস্থান করে । যেমন ঃ

মেয়েটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ।
অপরাধী এখন কারাগারে আছে ।

৪. **গুণ** ঃ গুণ বলতে কোন বস্তুধর্ম বা সাময়িক অবস্থাকে বোঝায় যা প্রভাবিতের পরিচায়ক অথবা প্রাপকের বৈশিষ্ট্য । যেমন ঃ

তার বৈশিষ্ট্য হলো হিসাব করে কথা বলা ।
যুদ্ধ হলো রক্তপাত ও প্রাণনাশ ।

জ্যাকসন ঘটনার জন্য দুই ধরনের অংশগ্রহণকারী ভূমিকার কথা বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. **প্রভাবিতঃ** এক্ষেত্রে প্রভাবিত বলতে সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাবে যাকে নিয়ে কোন ঘটনা ঘটছে। যেমন ঃ

আকাশ হতে খসলো তারা।
দিলদার গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন।

২. **গুণ** ঃ এক্ষেত্রে গুণ বলতে সেই অবস্থাকে বোঝাবে যা কোন ঘটনাগত প্রক্রিয়ার ফলে প্রাপ্ত। যেমন ঃ

ধীরে ধীরে সে হয়ে উঠেছে পাকা খেলোয়ার।
না খেতে খেতে সে এখন তালপাতার সেপাই।

জ্যাকসন কর্মের জন্য আট ধরনের অংশগ্রহণকারী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **কর্তামূলক** ঃ কর্তামূলক বলতে কোন প্রাণীকে বোঝায় যে কোন ঘটনার সূচনাকারী বা কারণ হিসাবে কাজ করে। কর্তামূলক ভূমিকার সাথে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জড়িত। যেমন ঃ

আনু ভাত খাচ্ছে।
বাঘটি হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

২. **বহিঃপ্রভাবক** ঃ বহিঃপ্রভাবক বলতে কোন বস্তুকে বোঝায় যা কোন ঘটনার কারণ হিসাবে কাজ করে। বহিঃপ্রভাবক ভূমিকার সাথে ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের যোগ নেই। যেমন ঃ

কালবৈশাখী ঝড় ঘরটিকে উড়িয়ে নিল।
এই জটিল হিসাবটি করেছে কম্পিউটার।

৩. **অবস্থানক** ঃ অবস্থানক বলতে কোন প্রাণীকে বোঝায় যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। যেমন ঃ

তিনি ব্রিফকেস হাতে হোটেলে ঢুকলেন।
মা শিশুটির গালে চুমু খেল।

৪. **প্রভাবিত** ঃ এক্ষেত্রে প্রভাবিত বলতে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাবে যা কোন কর্ম দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়। যেমন ঃ

তিনি আয়েশ করে চা পান করলেন।
জিদ করে সে বিড়ালটিকে লাথি মারলো।

৫. **ফলন** ঃ ফল বলতে কেই বস্তুকে বোঝায় যা কোন কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত। যেমন ঃ

বাবুর্চি পোলাও রাঁধছেন।
দিদিমা নক্সী কাঁথা বুনছেন।

৬. **সাধিত্র** ঃ সাধিত্র বলতে সেই বস্তু বা যন্ত্রকে বোঝায় যার সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করা হয়। যেমন ঃ
সে চাবি দিয়ে তালাটি খুললো।
সে লাঠি দিয়ে সাপটি মারলো।

Dhaka University Institutional Repository

৭. **প্রাপক** ঃ প্রাপক বলতে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীকে বোঝায় যার উপর কোন কর্ম বর্তায় অথবা কর্ম থেকে ফল লাভ করে । যেমন ঃ

বাবা আমাদের কলা কিনে দিলেন ।
মিন্টু তার বান্ধবীকে উপহার পাঠিয়েছে ।

৮. **গুণ** ঃ গুণ বলতে সেই অবস্থা বা ধর্মকে বোঝায় যা কোন কর্মের প্রভাবিতের উপর আরোপ করা হয় । যেমন ঃ

তিনি আমাদের রক্ষাকর্তা ।
পথচারীদের জন্য ট্রাক হচ্ছে ঘাতক ।

জ্যাকসন আরো তিনটি অংশগ্রহণকারী ভূমিকার কথা বলেন ঃ ঘাটনিক, স্থানিক ও কালিক ।

ঘাটনিক ঃ ঘাটনিক বলতে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় না, বরং বোঝায় কোন ঘটনাকে বা কর্মকে যা ঘটনা বা কর্ম নির্দেশক ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট । যেমন ঃ

আমি তার পেটে ঘুষি মারলাম ।
ইদানিং ধর্ষণ বেড়ে গেছে ।

স্থানিক ঃ স্থানিক বলতে কোন স্থানকে বোঝায় যার বর্ণনা বাক্যে আবশ্যিক উপাদানরূপে কাজ করে । যেমন ঃ

রাস্তাটি চলে গেছে হাইকোর্ট পর্যন্ত ।
সে মাছগুলো ব্যাগে ভরলো ।

এখানে *হাইকোর্ট* ছাড়া প্রথম বাক্যটি এবং *ব্যাগে* ছাড়া দ্বিতীয় বাক্যটি অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন ।

কালিক ঃ কালিক বলতে কোন সময়কে বোঝায় যার বর্ণনা বাক্যে আবশ্যিক উপাদারূপে কাজ করে । যেমন ঃ

৮ই ফাল্গুন আমাদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন ।
একবিংশ শতাব্দী হবে রোবটের যুগ ।

এখানে *৮ই ফাল্গুন* ও *একবিংশ শতাব্দী* বাদ দিলে বাক্যগুলোর গঠনের সাথে অর্থও খর্ব হয় ।

ফিলমোর (১৯৬৮) বাগর্থিক ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনাকে বলেছেন **কারক ব্যাকরণ** । তাঁর মতে বাগর্থিক ভূমিকা বাক্যের গভীর সংগঠনের বিষয় এবং এটি সকল ভাষার জন্য প্রযোজ্য । ফিলমোর মোট ছয়টি কারক নির্ধারণ করেন – কর্তৃকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, প্রযোজককারক, কর্মকারক ও অধিকরণকারক ।● নীচে

● বাংলা নামগুলো দেখে ভাষা উচিত নয় যে এগুলোর অর্থ অবিকল বাংলার মতো, বরং বিরাজমান নামগুলো আমরা ব্যবহার করেছি পারিভাষিক সুবিধার জন্য ।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখবো ফিলমোর কিভাবে কারকগুলোর সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রতিটির জন্য আমরা একটি করে ইংরেজী ও বাংলা উদাহরণ দিবো।

১. **কর্তৃকারক** ঃ কর্তৃকারক বলতে বোঝায় সেই সপ্রান জিনিসকে বেঝায় যা কোন কার্য সূচিত বা উদ্দীপিত করে। যেমন ঃ

রমেশ নদীতে সাঁতার কাঁটছে।
John opened the door.

২. **করণকারক** ঃ করণ কারক বলতে সেই অপ্রাণ জিনিসকে বোঝায় যার দ্বারা কোন কার্য সম্পাদিত হয়। যেমন ঃ

সে কুড়াল দিয়ে গাছটি কাটলো।
The key opened the door.

৩. **সম্প্রদানকারক** ঃ সম্প্রদান কারক বলতে সেই সপ্রান জিনিসকে বোঝায় যে কোন অবস্থা বা কার্যের স্বীকার হয়। যেমন ঃ

ইসমাইল বিশ্বাস করে যে সে একদিন বিখ্যাত হবে।
It was apparent to John that he would win.

৪. **প্রযোজক কারক** ঃ প্রযোজক কারক হলো সেই বস্তু বা ঘটনা যা কোন কার্য বা অবস্থা থেকে নিঃসৃত হয়। যেমন ঃ

তাড়াতাড়ি পোষাক পড়ো।
John dreamed a dream about Marry.

৫. **কর্মকারক** ঃ কর্মকারক বলতে বোঝায় সেই বস্তুকে যা কোন কর্তার কার্য দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়। যেমন ঃ

সে বই পড়ছে।
John sees the door.

৬. **অধিকরণ কারক** ঃ অধিকরণ কারক বলতে কোন স্থানকে বোঝায় যেখানে কোন কার্য সম্পাদিত হয়। যেমন ঃ

বনে বাঘ আছে।
Chicago is windy.

ফিলমোর দাবি করেন যে বাক্যের প্রতিটি বিশেষ্যপদই কোন না কোন কারক নির্দেশক, তবে কোন পদেই একাধিক কারক প্রযোজ্য হবে না। এবং জ্যাকসনের সাথে ফিলমোরের পার্থক্য এই যে জ্যাকসনের ভূমিকাগুলো

Dhaka University Institutional Repository

একে অপরকে অধিক্রমন করে, কিন্তু ফিলমোরের কারকগুলো পরস্পরকে অধিক্রমন করে না । একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিস্কার হবে ।

মিঃ গিলবার্টো সেগুলোর উপর হাত রাখলেন ।

জ্যাকসনের মতে এখানে মিঃ গিলবার্টোর ভূমিকা একইসাথে কর্তৃবাচক ও অবস্থানক, কারণ এখানে মিঃ গিলবার্টো, যে কাজের কর্তা, হস্ত স্থাপনের সুবাদে তার অবস্থানও প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু ফিলমোরের সংজ্ঞা অনুসারে এখানে মিঃ গিলবার্ট শুধুই কাজের কর্তা এজন্য কর্তৃকারক, তার হস্তস্থাপনমূলক অবস্থানটি ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না ।

প্যাট (১৯৭১) ফিলমোরের কারকের ধারণাকে আরো প্রসারিত করেন । তিনি মোট নয়টি কারকের প্রস্তাব করেন । সংক্ষেপে এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **প্রভাবিত** ঃ কার্য বা অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত সত্তা ।
   উদাহরণ ঃ Joe broke the vase.
২. **কর্তৃ** ঃ কার্যের প্রণোদক ।
   উদাহরণ ঃ John is eating his lunch.
৩. **ফলভোগী** ঃ কার্য বা অবস্থার ফললাভকারী ।
   উদাহরণ ঃ Fred brought Mary a book.
৪. **প্রযোজক** ঃ কার্য ও অবস্থা থেকে উৎপন্ন সত্তা ।
   উদাহরণ ঃ Those slums were built by Marmeduke.
৫. **করণ** ঃ কার্য বা অবস্থার সাথে কারণিকসূত্রে আবদ্ধ শক্তি বা বস্তু ।
   উদাহরণ ঃ Jo tickled Flo with a blade of grass.
৬. **অধিকরণ** ঃ কার্য বা অবস্থার স্থান বা অভিমুখ ।
   উদাহরণ ঃ Fred sat there.
৭. **নিরপেক্ষ** ঃ কার্য বা অবস্থা দ্বারা কোনভাবে প্রভাবিত নয় এমন সত্তা ।
   উদাহরণ ঃ The tree is a Eucalyptus cameldulensis.
৮. **অংশগ্রাহক** ঃ কার্য বা অবস্থার সাথে অবেগিকভাবে সম্পৃক্ত প্রণীসত্তা ।
   উদাহরণ ঃ He was liked by all his staff.
৯. **উদ্দেশ্য** ঃ কার্য ও অবস্থার উদ্দেশ্য ।
   উদাহরণ ঃ Joe went out for some cigarettes.

চমস্কি (১৯৮৬), র‍্যাডফোর্ড (১৯৮৮) কারককে বলেন থেটা-ভূমিকা যা তাদের রূপান্তরমূলক তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । চমস্কি কর্তা, কর্ম ও গন্তব্য এই তিনটি থেটা-ভূমিকার কথা বলেন । কিন্তু র‍্যাডফোর্ড সেই সংখ্যা বাড়িয়ে আনেন আটটিতে – কর্ম, কর্তা, অভিজ্ঞতালাভকারী, ফলভোগী, সাধিত্র, স্থান, গন্তব্য ও উৎস্য ।

এফ. আর. পামার (১৯৯৪ ঃ ৮-১১) মনে করেন বাগর্থিক ভূমিকার একটি বাক্যতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে । তিনি ব্যাকরণিক ও ধারণাগত ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য করেন এবং বাক্যে ব্যাকরণিক ভূমিকার গুরুত্ব নির্ণয় করেন । তিনি পাঁচটি ব্যাকরণিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন ঃ কর্তা, কর্ম, ভোক্তা, নিমিত্ত ও স্থান । তিনি দেখান যে

Dhaka University Institutional Repository

কর্তা ও **কর্মের** অবস্থানের উপর একটি বাক্যের ধরন নির্ভর করে । যেমন যে বাক্যে কর্তা ও কর্ম উভয়ই উপস্থিত থাকে তা হবে সকর্মক বাক্য এবং যে বাক্যে শুধুমাত্র একটি উপস্থিত থাকে তা হবে অকর্মক বাক্য ।

মুনির লিমাকে হত্যা করেছে ।
কাদের হাসছে ।

এখানে প্রথমটিতে কর্তা ও কর্ম উভয়ই উপস্থিত, তাই এটি সকর্মক বাক্য, কিন্তু দ্বিতীয়টি শুধু কর্তা উপস্থিত, কর্ম নেই, তাই এটি অকর্মক বাক্য । বাক্যের সকর্মক/অকর্মক হওয়া আবার নির্ভর করে ক্রিয়াবিভাজনের উপর । সকর্মক বাক্য গঠিত হয় সকর্মক ক্রিয়া সহযোগে এবং অকর্মক বাক্য গঠিত হয় অকর্মক ক্রিয়া সহযোগে । তবে একটি ক্রিয়া একই সাথে সকর্মক ও অকর্মক হতে পারে । যেমন ঃ

সকর্মক বাক্য ঃ The boy is flying a kite. (ছেলেটি ঘুড়ি উড়াচ্ছে ।)
অকর্মক বাক্য ঃ The kite is flying. (ঘুড়ি উড়ছে ।)

সকর্মক ক্রিয়া বাক্যে কর্তা ও কর্মের উপস্থিতি আবশ্যক করে তোলে, কিন্তু অকর্মক ক্রিয়া বাক্যে কর্তা ও কর্মের একসাথে অবস্থান বাধাগ্রস্ত করে । সেজন্য উপরের ইংরেজী প্রথম বাক্যটিতে কর্তা ও কর্ম উভয়েই তাদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে কর্তা বাদ পড়েছে ।

ভোক্তা বলতে পামার বুঝিয়েছেন ব্যক্তিবাচক কর্মকে যা ইংরেজীতে to এবং for দ্বারা সূচিত হতে পারে । যেমন ঃ

The boy gave a book to the girl.
(= The boy gave the girl a book.)
(The boy bought a book for the girl.)
(=The boy bought the girl a book.)

নিমিত্ত ও **স্থান** বলতে যথাক্রমে কার্যসম্পাদনে সাহায্যকারী বস্তু ও যে জিনিসের উপর কার্য সম্পাদিত হয় তাকে বোঝায় । আমরা পামারের ইংরেজী উদাহরণের দিকে তাকিয়ে তাদের ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য (এখানে preposition -এর সহযোগে) অনুসন্ধান করতে পারি ঃ

The woman is writing a letter *with a pen.*
The teacher is writing maths *on the blackboard.*

বাংলা ভাষায়ও কারকগুলো বিভক্তি দ্বারা চিহ্নিত । সম্প্রদান কারককে উপেক্ষায় করলে বাংলায় আমরা নিম্নলিখিত কারক ও বিভক্তি খুঁজে পাই [●] ঃ

[●] সম্প্রদান কারককে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে । এটিকে অনেকে বাংলা ব্যাকরন থেকে বাদ দেয়ার পক্ষপাতী । এর জন্য দেখুন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৭৭), *বাক্যার্থ* পৃঃ ১০৫-১১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

কারক	বিভক্তি
কর্তৃকারক	০
কর্মকারক	কে
করণ কারক	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
অপাদান কারক	থেকে, হতে
অধিকরণ কারক	তে, এ, য়

অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে, তাই কারক নির্ণয়ের জন্য এদের ভূমিকা বিনিশ্চায়ক নয় । যেমন প্রতিটি কারকেই *শূন্য* বিভক্তি বা *এ* বিভক্তি হতে পারে । নীচে সকল কারকে এ বিভক্তি (প্রথাগতভাবে সপ্তমী বিভক্তি)-র উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

পাগলে কিনা বলে ?
গুরুজনে কর ভক্তি ।
টাকায় কি না হয় ।
মেঘে বৃষ্টি হয় ।
জলে কুমির আছে ।

কাজেই দেখা যায় কারক ও বিভক্তি ওয়ান-টু-ওয়ান সম্পর্কে আবদ্ধ নয় । কারক ও বিভক্তির সম্পর্কের এই শিথিলতা থেকে এটি বলা যায় যে বাংলায় কারক যতোটা না ব্যাকরণিকভাবে নির্ধারিত তার চেয়ে বেশি বাগর্থিকভাবে নির্ধারিত । তাই বিভক্তি যেখানে বিভ্রান্ত করে, সেখানে মীমাংসার জন্য কারকের বাগর্থমূলক সংজ্ঞার শরণাপন্ন হতে হয় । কেউ যখন জানে যে, যে কর্ম সম্পাদন করে সে কর্তৃকারক; যার উপর কর্ম বর্তায় সে কর্মকারক, যা দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয় তা করণ কারক, যা হতে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় তা অপাদান কারক এবং যেখানে কর্মসম্পাদিক হয় তা অধিকরণ কারক তখন তাকে আর বিভক্তি চিহ্ন হয়রানি করতে পারে না ।

স্থানিকতাবাদ

স্থানিকতাবাদ হলো সেই মতবাদ যেখানে দাবি করা হয় যে ভাষার স্থানিক প্রকাশ ও ধারণাগুলো অ-স্থানিক প্রকাশ ও ধারণাগুলোর চাইতে মৌলিক (Lyons 1977: 718; Miller 1985: 119) এই মতবাদটি একটি প্রফল্প আকারে উপস্থাপিত হয় যার একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন । মানবীয় বোধ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থানিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব এখন অনেক মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন ।

স্থানিকতাবাদের দুটি তরজমা রয়েছে – শক্ত ও দুর্বল । শক্ত তরজমা অনুযায়ী নাবোধকতা, পরিমাপন, ক্রিয়াবয়ব, ভাববাচকতা, সমন্ধপদ সহ ভাষার যে সমস্ত দিক স্থানিক ও অন্যান্য প্রকাশের সাথে জড়িত স্থানিকতাবাদের বিশ্লেষণ তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অন্যদিকে দুর্বল তরজমা শুধু এতটুকু দাবি করে যে অনেক ভাষাতে কালিক প্রকাশগুলো স্থানিক প্রকাশ থেকে বিবর্তিত হয়েছে । যেমন ইংরেজীতে যতো কালবাচক প্রকাশ আছে তাদের প্রায় সবই এসেছে স্থানবাচক প্রকাশ থেকে । ট্রগট (Traugott) দেখান যে for, since,

Dhaka University Institutional Repository

till আজ এগুলো কেবল কালবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়, অথচ একসময় এগুলো কেবল স্থানবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণে কালবাচক শব্দকে প্রায়ই স্থানবাচক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর কারণটিও স্থানিকতাবাদ। যেমন বাংলায় আমরা বলে থাকি *নিকট ভবিষ্যত, সুদূর ভবিষ্যত*। এখানে আমরা সময়ের দিকে ইঙ্গিত করলেও সময়কে বিচার করি স্থানিক দূরত্বের নিরিখে, কারণ *নিকট* ও *দূর* মূলত স্থানবাচক শব্দ। সময়ের এরূপ স্থাননির্ভর হওয়ার প্রক্রিয়াকে লিয়ন্স বলেছেন **কালের স্থানীকরণ**। বাংলায় *দূরদর্শী, অদূরদর্শী* প্রভৃতি শব্দেও কালের স্থানীকরণ লক্ষ্যণীয়।

ঘটনা কালে সম্পাদিক হয়, তথাপি প্রায়ই একে আমরা স্থানিক মাত্রায় স্থাপন করে থাকি। যেমন আমরা বলতে পারি *টুনির যখন জন্ম হলো তখন চারদিকে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল*। এখানে টুনির জন্মের ঘটনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলে বটে, কিন্তু সেই ঘটনাটি একটি স্থানের ইঙ্গিত দেয় যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে। এভাবে এটি কালের চেয়ে স্থানের মৌলিকতাই প্রমান করে।

স্থানিকতাবাদীরা কালিক অবস্থানকে স্থানিক অবস্থানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও একে আবার তারা বিমূর্ত অবস্থানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। বিমূর্ত অবস্থান হলো *হতাশায়, হরিষে* ইত্যাকার প্রকাশ। কাজেই স্থানিকতাবাদীদের মতে *তিনি দুঃখে আছেন* এর চেয়ে অধিক মূর্ত হলো *তিনি সময় কাটাচ্ছেন*, যদিও তা *তিনি বাসায় আছেন* এর চেয়ে কম মূর্ত।

আমরা যখন *উপরে নীচে, সামনে পিছনে, ডানে বামে* ইত্যাদি বলি তখন নিজের অবস্থানের ভিত্তিতে অন্য কিছুর অবস্থান নির্ণয় করি। বাস্তব জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণনায় আমরা এরূপ অবস্থানগত বিবেচনা আরোপ করি। যেমন আমরা বলি *দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি/নিম্নগতি, শেয়ারবাজারে মূল্যসূচকের উন্নতি/অবনতি, রাজনৈতিক দলের একত্রীকরণ, অর্থনৈতিক মেরুকরণ* ইত্যাদি। এখানে স্থানিক ধারণা আরোপ করা হয়েছে। লিয়ন্স মনে করেন ভাষার আলংকরিক ব্যবহারের বিষয়টাও স্থাকিতাবাদ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন *আকাশছোঁয়া খ্যাতি, অতল অন্ধকার* প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের অর্থ মৌলিকভাবে স্থানিক ধারণা দিয়েই নির্নীত হয়।

যাত্রা বা ভ্রমন স্থানসাপেক্ষ। প্রতিটি ভ্রমনের একটি সূচনাস্থল ও গন্তব্য থাকে। এই স্থানিক সূচনা ও গন্তব্যের ধারণাকে আমরা অনেক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে থাকি। যেমন শিক্ষণের ব্যাপারে একটি স্তর থেকে শিক্ষা শুরু হয় এবং একটি উচ্চতর স্তরে লক্ষ্য অর্জিত হয়। ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটি একই রকম – নির্দিষ্ট একটি ইতিবাচক অবস্থান থেকে তার যাত্রা শুরু এবং একটি নেতিবাচক অবস্থানে গিয়ে তার যাত্রা শেষ হয়। আগমন করা, প্রস্থান করা, ঘুমিয়ে পড়া, জেগে ওঠা, খুঁজে পাওয়া, হারিয়ে ফেলা, বিয়ে করা, তালাক দেয়া, জন্মগ্রহণ করা, মৃত্যুবরণ করা প্রভৃতি সবই ভ্রমনমূলক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। যদি ক প্রারম্ভবিন্দু এবং খ সমাপ্তিবিন্দু হয় তাহলে ভ্রমনমূলক প্রক্রিয়াটিকে এভাবে দেখানো যায়ঃ

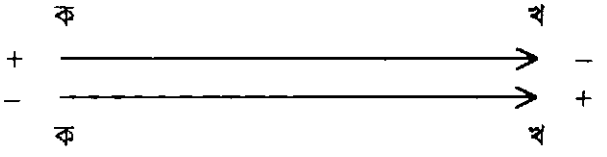

ভ্রমনমূলক প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

এখানে + কোন কিছুর উপস্থিতি এবং – কোন কিছুর অনুপস্থিতি বোঝায় । যাত্রার শুরুতে যার অস্তিত্ব থাকে যাত্রার শেষে তার অবলুপ্তি ঘটতে পারে অথবা যাত্রার শুরুতে যার অস্তিত্ব নেই যাত্রার শেষে তার প্রাপ্তি ঘটতে পারে । যেমন ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে চেতনার লোপ এবং জেগে উঠার ক্ষেত্রে চেতনার আবির্ভাব ঘটে । একইভাবে আগমন ও প্রস্থান করার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সংস্পর্শ ও বিচ্যুতি ঘটে ; খুঁজে পাওয়া ও হারিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে একটি দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয় ও তার অপনয়ন ঘটে ; বিয়ে করা ও তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ জীবনসঙ্গীর অর্জন ও বিয়োজন ঘটে ; এবং সবশেষে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করার ক্ষেত্রে জীবন নামক প্রপঞ্চের যোগ ও বিয়োগ ঘটে । এখানে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে স্থানিক ধারণা দিয়ে যখন এভাবে আমরা শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করি তখন আমরা আংশিকভাবে মৌলিক উপাদান বা স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্যও অনুসন্ধান করি । নীচের তালিকায় বিষয়টি বিধৃত ঃ

আগমন করা প্রস্থান করা	± স্থান
জেগে উঠা ঘুমিয়ে পড়া	± চেতনা
খুঁজে পাওয়া হারিয়ে ফেলা	± দ্রব্য
বিয়ে করা তালাক দেয়া	± স্বামী বা স্ত্রী
জন্মগ্রহন করা মৃত্যুবরন করা	± জীবন

যৌক্তিক কারণকে স্থানিকতাবাদী ধারণায় বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । *যদি ক তবে খ* এরূপ যুক্তিবাক্য স্থানিক ধারণা পরিপুষ্ট । এটি ইঙ্গিত দেয় যে ক থেকে খ এর উৎপত্তি অর্থাৎ ক → খ, যেখানে একটি ভ্রমনমূলক প্রক্রিয়া বিদ্যমান । যেমন, *যদি বৃষ্টি হয় তবে মাটি ভিজে* এ বাক্যটি একটি অবস্থাগত রূপান্তরের কথা বলে । বৃষ্টি হওয়া একটি অবস্থা এবং মাটি ভিজা আরেকটি অবস্থা । দ্বিতীয় অবস্থাটি সৃষ্টি হয় প্রথম অবস্থার ফলে । এখানে ভ্রমনমূলক প্রকিয়াটি এভাবে দেখানো যায় ঃ

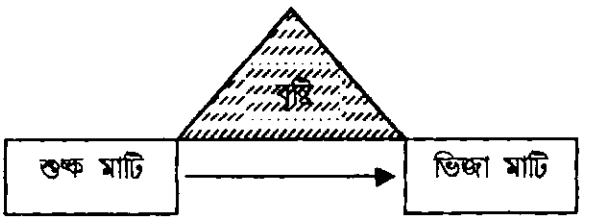

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কিছু অব্যয় ও প্রশ্নমূলক শব্দ স্থানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায় । যেমন যখন আমরা *এভাবে, কিভাবে* বলি তখন আমরা একটি প্রক্রিয়ার কথা বলি । *এভাবে* মানে *এই উপায়ে বা প্রক্রিয়ায়* । *কিভাবে* মানে *কি উপায়ে বা প্রক্রিয়ায়* । সম্বন্ধপদের ক্ষেত্রে স্থানিক বিশ্লেষণ প্রযোজ্য । যখন আমরা বলি *রহিমের বই* তখন আমরা স্বত্বের ধারণা প্রকাশ করি যাতে একটি বস্তু একটি ব্যক্তির দখলে থাকে । স্থানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এরকম ঃ রহিম একটি স্থান ও বই তার অল্প একটু জায়গা জুড়ে অবস্থিত । সম্পর্কটি নীচের চিত্রের মতো । আমরা ক -কে রহিম ও খ -কে বই কল্পনা করতে পারি ঃ

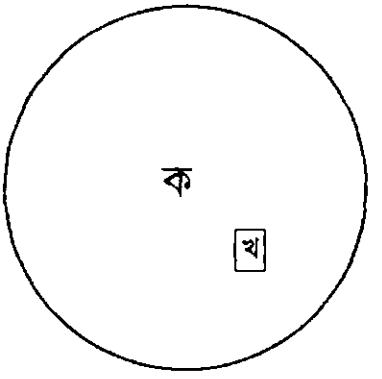

স্বতের ধারণা

জ্যাকেনডফ সার্বজনীন বাগর্থবিদ্যার সন্ধানে ভাষার একটি স্থানিকতাবদী তত্ত্ব গঠন করেছেন । তিনি ভাষার তাবৎ ক্রিয়াকে তিনটি মৌলিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন – go (যাওয়া), be (হওয়া) এবং stay (অবস্থান করা) । এই ত্রয়ী বিভাজনের উপর ভিত্তি করে বলা সম্ভব হবে আমরা বাক্যে কোন্ সম্পর্কের কথা বলছি অবস্থানিক, স্বত্বমূলক নাকি অভেদমূলক (Miller 1985: 121) । নীচের তিনটি বাক্য লক্ষ্য করা যাক ঃ

১. ট্রেনটি ঢাকা থেকে চিটাগাং যাচ্ছিল ।
২. হিরন হাসপাতালকে তার চক্ষু দান করলো ।
৩. সন্ধ্যায় আকাশ লাল হয়ে গেল ।

এখন এই তিনটি বাক্যকে আমরা *যাওয়ার* ধারণা দ্বারা বিশ্লেষণ করতে পারি ঃ

১. যাওয়া (ট্রেন, ঢাকা, চিটাগাং)
২. যাওয়া (চক্ষু, হিরন, হাসপাতাল)
৩. যাওয়া (সন্ধ্যা, আকাশ, লাল)

প্রথমটিতে অবস্থানিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে – এখানে ঢাকা ও চিটাগাং-এর প্রেক্ষিতে ট্রেনের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে । দ্বিতীয়টিতে স্বত্বমূলক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে – এখানে হাসপাতাল হিরনের চোখের স্বত্বাধিকারী হয়েছে । তৃতীয়টিতে অভেদমূলক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে – এখানে সন্ধ্যার আকাশ ও লালিমা এক হয়ে গেছে ।

এভাবে স্থানিকতাবাদী প্রকল্প ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যা

যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে রৌপিক ভাষা দর্শনের পথ ধরে । ফ্রেজ, কারন্যাপ, টার্সকি, কোয়াইন, ডেভিডসন, রাসেল, মনটেগ প্রমূখ দার্শনিকগণ ভাষার অর্থ বিশ্লেষণের জন্য যুক্তিবিদ্যার আশ্রয় নেন এবং প্রতীকবাদের মাধ্যমে এক ধরনের কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করেন যাকে আমরা সাধারণভাবে *যৌক্তিক ভাষা* বলে থাকি । যৌক্তিক বাগর্থবিদদের যুক্তি হলো প্রাকৃতিক ভাষার নানারকম ভেদরূপ ও বিচ্যুতি থাকায় তা বাগর্থিক আলোচনার উপযোগী নয়, অর্থের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য তাই প্রয়োজন সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত একটি কৃত্রিম ভাষা যা প্রাকৃতিক ভাষার সীমাবদ্ধতামুক্ত । যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যা দার্শনিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উদ্ভুত হয়েছে । তাই একে **দার্শনিক বাগর্থবিদ্যা**ও বলা হয় । বিভিন্ন দার্শনিক তাদের তাত্ত্বিক প্রয়োজনে যৌক্তিক ভাষাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন । ফলে যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যার বিকাশও ঘটেছে বিচিত্ররূপে । এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করবো ।

নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব

নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব অনুসারে কোন শব্দের অর্থ হলো শব্দ নির্দেশিত বস্তু । এই তত্ত্বে শব্দ ও বস্তুর মধ্যে একটা অভেদসম্পর্ক স্থাপন করা হয় । দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল নির্দেশনাত্মক তত্ত্বের একজন প্রধান প্রবক্তা । রাসেল বলেন যে শব্দের অর্থ আছে একথা বলার অর্থ এই যে শব্দ প্রতীক হিসাবে কোন কিছুকে নির্দেশ করে । যেমন *কুকুর* শব্দটির অর্থ হবে পৃথিবীর সেই চতুষ্পদ প্রাণী যার মধ্যে কুকুরত্ব গুণটি রয়েছে । আবার *টনি* শব্দের অর্থ হতে পারে সাহেব বাড়ির সেই কালো কুকুরটি যা গেটের সামনে বাঁধা থাকে এবং পথচারী দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে । কাজেই দেখা যায় এ তত্ত্বে শব্দের অর্থ বলতে তার বাচ্যার্থকে বোঝানো হচ্ছে । এজন্য এর অন্য নাম **বাচ্যার্থমূলক তত্ত্ব** । যখন মনে করা হয় যে কোন শব্দের অর্থ হলো এর বাচ্যার্থ তখন নিম্নলিখিত তিনটি দাবি প্রাসঙ্গিকভাবে সামনে এসে দাঁড়ায় (Akmajian et al 1995: 218) ঃ

(ক) কোন শব্দের অর্থ আছে একথা বলার মানে হলো শব্দটির বাচ্যার্থ আছে ।

(খ) যদি দুটি শব্দের বাচ্যার্থ এক হয় তবে তাদের অর্থও এক হবে ।

(গ) কোন শব্দের বাচ্যার্থ সম্পর্কে যা সত্য শব্দটির অর্থ সম্পর্কেও তা সত্য হবে । এ তত্ত্ব শব্দ ও বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে একটা সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে ।

এ তত্ত্বকে একটি সহজ সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় ঃ

ক = নির্দেশিত বস্তু

এখন ক যদি গরু হয় তবে বলা যায় ঃ

গরু =

Dhaka University Institutional Repository

উইলিয়াম এ্যালস্টন (১৯৬৪ ঃ ১২) মনে করেন নির্দেশনাত্মক তত্ত্বের দুটি রূপ রয়েছে – একটি সরল ও অন্যটি মার্জিত। এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করালাম তা হলো নির্দেশনাত্মক তত্ত্বের সরল রূপ অর্থাৎ কোন শব্দের অর্থ হলো শব্দটি যে বস্তুকে নির্দেশ করে তা-ই। এর মার্জিত রূপটি হলো কোন শব্দের অর্থ বলতে শব্দনির্দেশিত বস্তুকে বোঝায় না, বরং বোঝায় শব্দ ও বস্তুর সম্পর্ককে।● ক যদি কোন শব্দ হয় এবং খ যদি বস্তু হয় তবে মার্জিত তত্ত্বটিকে এভাবে প্রদর্শন করা যায় ঃ

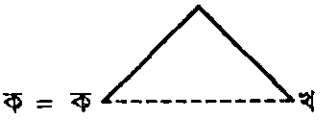

একইভাবে –

এখানে দেখা যায় শব্দ ও বস্তুর মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে, তবে তা পরোক্ষ (বিন্দুযুক্ত রেখা পরোক্ষ সম্পর্কের প্রতীক) এবং কোন শব্দের অর্থ বলতে শব্দ ও বস্তুর এই সম্পর্ককেই বোঝাবে।

তবে অধিকাংশ নির্দেশনাত্মক তত্ত্ববিদ মার্জিত রূপের চেয়ে বরং সরল রূপটিকেই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন। অনেকেই স্বীয় নামকে ব্যাখ্যা করেছেন এ তত্ত্বের দ্বারা। তাদের দাবি অনুসারে, স্বীয় নাম বাস্তব জগতের বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে। যেমন *শামছুর রাহমান* নামটি দ্বারা বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট কবি চিহ্নিত হয়। কাজেই ঐ ব্যক্তিই শামছুর রাহমান শব্দটির অর্থ।

মূলনীতি ও সমস্যা ঃ নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব মনে করে যে ভাষা ও বাস্তব জগতের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এ্যালস্টন (১৯৬৪ ঃ ১৯) বলেন, "নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব এই গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তিশীল যে ভাষা ব্যবহৃত হয় ভাষার বাইরের (এবং ভিতরের) জিনিস সম্পর্কে কথা বলার জন্য এবং সেই কথায় শব্দের উপযুক্ততা শব্দের অর্থের জন্য জরুরী।"● নির্দেশনাত্মক তত্ত্বের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এজন্য অনেক দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক এ তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন।

প্রথমত, একই বস্তু দুটি ভিন্ন শব্দ বা শব্দসমষ্টি দ্বারা নির্দেশিত হতে পারে। দার্শনিক ফ্রেজ দেখান যে morning star ও evening star একই বস্তুকে নির্দেশ করে, কিন্তু তা বলে এদের অর্থ এক নয়।

দ্বিতীয়ত, এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো বাস্তব জগতে কি বস্তু নির্দেশ করে তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যেমন – *যদি, তবে, এবং, না, কিন্তু* ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নির্দেশিত বস্তু কোনগুলো ? কিংবা ভূত পেত্নী, জলকন্যা, পরী এসব কোন্ বস্তুর নির্দেশক না স্পষ্ট নয়।

● এটি আমাদের সাংকেতিক ত্রিভুজের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে বলা হয় যে সংকেতক (শব্দ) ও সংকেতিত (বস্তু) একটি চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পর্কিত। দেখুন পৃঃ ২৮-২৯।

● "The referential theory is based on an important insight – that language is used to talk about things outside (as well as inside) language, and that the suitability of an expression for such talk is somehow crucial for its having the meaning it has." Alston, P. (1964), *Philosophy of Language*, p. 19.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, এমন অনেক শব্দ আছে যাদের অর্থ পরিস্থিতিভেদে পরিবর্তিত, যেমন – আমি, তুমি, এটা, ওটা, এখানে, সেখানে, এখন, তখন (এ ধরনের শব্দকে বলা হয় **দিবাচক প্রকাশ**)। এই অভিসন্দর্ভ লেখক যখন বলবে *আমি যোগ্য* তখন *আমি* যে ব্যক্তিকে বোঝাবে, অভিসন্দর্ভ পাঠক যখন বলবে *আমি যোগ্য* তখন *আমি* প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বোঝাবে না ।

চতুর্থত, শব্দের *অর্থ = শব্দনির্দেশিত বস্তু* একথা মেনে নিলে এটা বলতে হবে যে বস্তুর মতো অর্থের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বিবাহ করে, খায়, ঘুমায় ইত্যাদি । কাজেই এ তত্ত্ব প্রচলিত বাক্‌রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।

পঞ্চমত, স্বীয় নামের ক্ষেত্রেও তত্ত্বটি প্রযোজ্য বলে মনে হয় না । যেমন, *শামছুর রাহমান* নামটি কেবল বাংলাদেশের কোন বিশিষ্ট কবিকেই বোঝাবে না, এটি উক্ত নামের যে কোন ব্যক্তিকে বোঝাবে । কাজেই স্বীয় নাম নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক এ দাবি দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।

কাজেই বিভিন্ন দিক বিবেচনায় বলা যায় নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব শব্দের অর্থ সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারে না । তাই এই তত্ত্বটি কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয় ।

বিধেয় কলন

ক্রিয়া ও অন্যান্য পদের সম্পর্কের মাধ্যমে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণের জন্য যে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেয়া হয় তা *বিধেয় কলন* হিসাবে পরিচিত । একে অনেকে *বিধেয় যুক্তিবিদ্যাও* বলে থাকেন । বিধেয় কলনে একটি বচনকে বিধেয় ও যুক্তিকে বিভক্ত করা হয় এবং অধীনস্থকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় । বিধেয় ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকে বলে *বিধেয়ন* । বিধেয়ের মূল অংশ বা কেন্দ্র হলো *বিধেয়ক* যা এক বা একাধিক *যুক্তির* সাথে যুক্ত হয়। যেমন ঃ

১. ফেলুদা একজন গোয়েন্দা ।
২. ফেলুদা সমস্যাটির সুরাহা করলো ।

এদুটি বাক্যের প্রথমটিতে *গোয়েন্দা* হলো বিধেয়ক এবং *ফেলুদা* হলো যুক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে *সুরাহা করা* হলো বিধেয়ক এবং *ফেলুদা* ও *সমস্যা* হলো যুক্তি । এদুটি বচনকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি ঃ

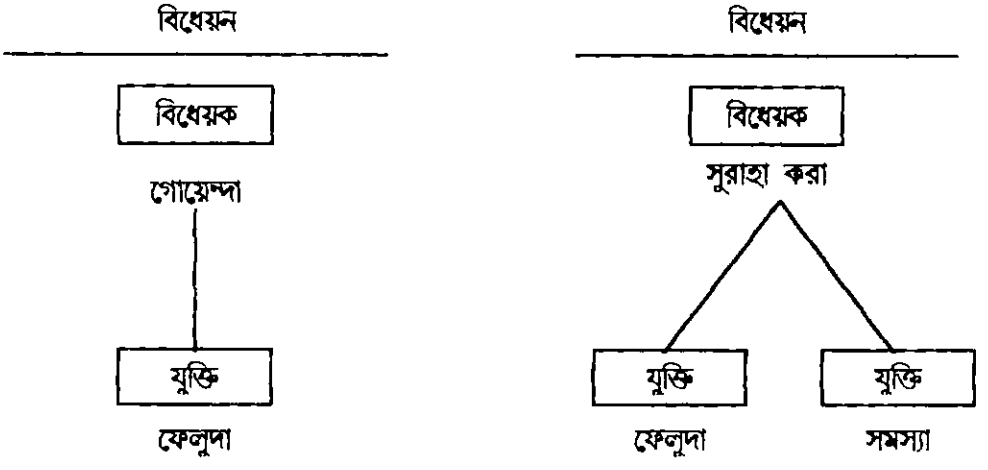

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজীতে সাধারণত বিধেয়ককে বড় হাতের অক্ষর যেমন L, M, N ইত্যাদি দিয়ে এবং যুক্তিকে ছোট হাতের অক্ষর যেমন a, b, c ইত্যাদি দিয়ে প্রকাশ করা হয় । বাংলায় আমরা বিধেয়কের জন্য স্বরবর্ণ যেমন অ, আ, ই, ইত্যাদি এবং যুক্তির জন্য ব্যঞ্জনবর্ন যেমন ক, খ, গ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি । উপরের বাক্য দুটিকে এবার যদি আমরা প্রতীকায়িত করি তবে সেগুলো এরকম হবে ঃ

১. অ (ক)
২. আ (ক, খ)

এখানে,

অ = গোয়েন্দা
ক = ফেলুদা
আ = সুরাহা করা
খ = সমস্যা

বিধেয় কলনের মাধ্যমে এভাবে সাধারণ প্রাকৃতিক ভাষাকে রূপবদ্ধ করা হয় । বিধেয়কের সাথে যুক্তিগুলিকে অনেক সময় রসায়নের অনুসরণে বলা হয় **যোজনী** । যেমন উপরের উদাহরণে প্রথম বাক্যে বিধেয়কের যোজনী এক এবং দ্বিতীয় বাক্যে বিধেয়কের যোজনী দুই । আবার কোন বিধেয়কের যোজনী তিনও হতে পারে। যেমন ঃ

বাবা ছেলেকে একটি কলম কিনে দিলেন ।

অ (ক, খ, গ)

এখানে,

অ = কেনা
ক = বাবা
খ = ছেলে
গ = কলম

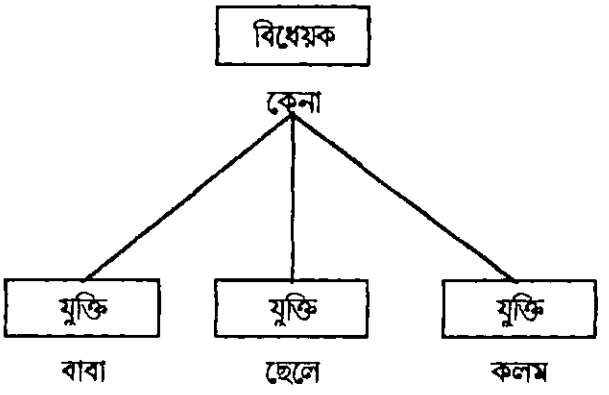

বচনের যুক্তিগুলি স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয় । তাই যোজনী সংখ্যা থেকে বোঝা যায় কোন বিধেযক কয়টি স্থানের সাথে যুক্ত । যোজনী সংখ্যা অনুসারে বিধেয়ক এক, দুই বা তিন স্থানের সাথে যুক্ত থাকতে পারে । এবং সে

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী বিধেয়ককে একস্থানিক, দ্বিস্থানিক, তিনস্থানিক বলা হবে। সেই হিসাবে উপরের উদাহরণে *বাবা ছেলেকে একটি কলম কিনে দিলেন* এই বাক্যে *কেনা* তিনস্থানিক বিধেয়ক।

বিধেয় কলকে চিহ্নব্যবহার প্রচল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে *সমস্ত, সকল, সব* ইত্যাদি শব্দকে ∀ চিহ্ন এবং *কিছু কতক* একটি ইত্যাদি শব্দকে ∃ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রথমটিকে বলা হয় **সার্বজনীন পরিমাপক** এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় **অস্তিত্ববাচক পরিমাপক**। এখন ম কে যদি আমরা মানুষ ধরি তাহলে *সকল মানুষ* ও *কতক মানুষ* লেখা হবে এভাবে ঃ

∀ম (সকল মানুষ)
∃ম (কতক মানুষ)

এখন আমরা দেখবো বিধেয় কলনকে কিভাবে অর্থ বিশ্লেষণে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু তার আগে চিহ্নব্যবহারগত একটি পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমরা বলেছি ইংরেজীতে যুক্তিগুলো a, b, c ইত্যাদি চিহ্ন (আমাদের ক্ষেত্রে ক, খ, গ ইত্যাদি) দ্বারা নির্দেশিত হয়। এগুলোকে কৌশলগতভাবে বলা হয় **ধ্রুবক**, যা পার্থক্য সূচিত করে **চল** -এর সাথে। চলগুলো ইংরেজীতে উপস্থাপিত হয় x, y, z ইত্যাদি রূপে। আমরাও তাই করবো। ধ্রুবক ও চলের মূল পার্থক্য এই যে ধ্রুবক যেখানে বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে চল সেখানে যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু নির্দেশ করে। অর্থাৎ চল হলো ধ্রুবকের শ্রেণী। যেমন – *অ (x)* এর অর্থ হতে পারে *মানুষ মরণশীল,* যদি আমরা ধরে নেই যে *অ* এখানে *মরণশীল* এবং x মানুষ। কিন্তু *অ (ক)* এর অর্থ হতে পারে *করিম মরণশীল,* যদি ধরে নেই যে *অ* এখানে *মরণশীল* এবং *ক* এখানে *করিম*। এই প্রচল অনুসরণ করে এখন আমরা *সকল মানুষ মরণশীল* ও *কতক মানুষ মরনশীল* এই বাক্যদুটোকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি ঃ

∀ (অ x) 'সকল মানুষ মরনশীল'
∃ (অ x) 'কতক মানুষ মরনশীল'

382718

এখন দেখা যাক এটি দিয়ে কিভাবে **প্রজ্ঞাপন** ব্যাখ্যা করা যায়। যদি কোন বাক্য থেকে অপর একটি বাক্য আবশ্যিকভাবে বেড়িয়ে আছে তাহলে বলা হয় প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে প্রজ্ঞাপিত করেছে। যেমন *মিতা একজন কুমারী* এই বাক্যটি থেকে আমরা আবশ্যিকভাবে পাই *মিতা অবিবাহিতা*। কাজেই এটি প্রজ্ঞাপন। প্রজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যটি সত্য হলে দ্বিতীয় বাক্যটি অবশ্যই সত্য হবে। আমরা বিধেয় কলনের সাহায্যে ব্যাপারটিকে এভাবে দেখাতে পারি ঃ

∃ ম (অ (ম) → আ (ম))

এখানে,

ম = মিতা
অ = কুমারী
আ = অবিবাহিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এখন *কৌমার্যের* সংজ্ঞা দিতে পারি এই বলে যে, যে কুমার (বা কুমারী) সে অবিবাহিত (আমরা আপাততঃ লিঙ্গভেদ উপেক্ষা করতে পারি) । কুমার মাত্রই অবিবাহিত অথবা সকল কুমার অবিবাহিত । এটিকে এভাবে দেখানো যায় ঃ

$\forall x$ (অ x) $\rightarrow$ আ (x))

এখানে,

অ = কুমার

আ = অবিবাহিত

এবার আমরা বিধেয় কলনের সাহায্যে ন্যায় অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত-ও উপস্থাপন করতে পারি । যেমন ঃ

সকল মানুষ মরনশীল

হিরন একজন মানুষ

$\therefore$ হিরন মরনশীল

এই ন্যায় অনুমানটিকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি ঃ

$\forall x$ (অ x) $\rightarrow$ আ (x))

অ (ক)

$\therefore$ আ (ক)

এখানে,

অ = মানুষ

আ = মরণশীল

ক = বিনয়

এবার আমরা নিম্নলিখিত ন্যায় অনুমানটির দিকে লক্ষ্য করি ঃ

কিছু মানুষ বোকা

বাদল একজন মানুষ

$\therefore$ বাদল বোকা

$\exists x$ (অ x) $\rightarrow$ আ (x))

অ (ক)

$\therefore$ আ (ক)

এই অনুমানটি অবৈধ, কারণ এটি সঠিরভাবে অনুমিত হয়নি । বাদল যে কিছু মানুষ যারা বোকা তাদের মধ্যে পড়বে তার কোন গ্যারান্টি নেই, সে তাদের বাইরেও পড়তে পারে । আমরা *সব মানুষ* (বা মানুষ) এবং *কিছু মানুষ* -এর সম্পর্কটিকে এভাবে দেখাতে পারি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

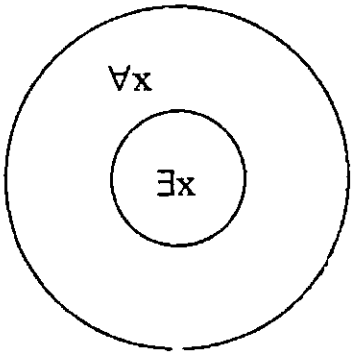

কিছু মানুষ সম্পর্কে যা সত্য তা সমস্ত মানুষ সম্পর্কে সত্য নাও হতে পারে । এজন্য আলোচ্য উদাহরণে *পরিধি লঙ্ঘনের অনুপপত্তি* ঘটেছে । পরিধির ব্যাপারটি এখানে আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক । প্রতিটি বিধেয়ক ও যুক্তির একটি নির্দিষ্ট সীমানা থাকে যার মধ্যে সেগুলো প্রযোজ্য হয় । বাক্যে যদি স্পষ্টরূপে সীমানা উল্লেখিত না থাকে তবে দ্ব্যর্থকতা দেখা দিতে পারে । সীমানাজনিত দ্ব্যর্থকতাকে বাগর্থবিদরা বলেন **পরিধি দ্ব্যর্থকতা** । নীচের বাক্যটি সীমানা দ্ব্যর্থকতার একটি উদাহরণ ঃ

প্রত্যেকেই একজনকে ভালবাসে ।

এখানে স্পষ্ট নয় একজন বলতে কি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে যাকে প্রত্যেকে ভালবাসে নাকি প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভালবাসার জনের কথা বলা হচ্ছে । বিধেয় কলনের সাহয্যে এই দ্ব্যর্থকতা স্পষ্ট করা যেতে পারে (Palmer 1981: 189) । আমরা পামারের উপস্থাপনাটি নীচে উপস্থাপন করছি ঃ

Everyone loves someone.

$\exists x\ \forall x\ (L\ (x, y))$ There is a y such that for all x x loves y
$\forall x\ \exists x\ (L\ (x, y))$ For all x there is a y such that x loves y

প্রথমে ক্ষেত্রে একজন (someone) নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে বোঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন ভিন্ন (একাধিক) ব্যক্তিকে বোঝায় । এখানে একটি ব্যাপার পরিস্কার হওয়া উচিত যে বিধেয় কলনে প্রতীকগুলোর ক্রমের একটি গুরুত্ব রয়েছে । উপরের উদাহরণে লক্ষ্য করলে দেখবো যে দুটি বাক্যেই একই প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে, তবে একই বিন্যাসে নয় । প্রথম ক্ষেত্রে লেখা হয়েছে $\exists x\ \forall x$ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $\forall x\ \exists x$ এবং তার ফলেই দুটো বাক্য ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করেছে । *স* -কে *সম্পর্ক* ধরে আমরা বলতে পরি স (ক, খ) এবং স (খ, ক) এক নয় । এদুটি প্রতীকগুচ্ছ দুই ভিন্ন ধারণার সাথে যুক্ত হবে । যেমন ঃ

ক শ্রদ্ধা করে খ কে
খ শ্রদ্ধা করে ক কে

কাজেই আমরা এখানে বলতে পারি ঃ

স (ক, খ) ≠ স (খ, ক)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বিপ্রতীপ সম্পর্কের ক্ষেত্রে স (ক, খ) এবং স (খ, ক) দুটোই একসাথে সত্য হতে পারে । যেমন বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি মনা যদি কনাকে বিয়ে করে থাকে তাহলে কনাও মনাকে বিয়ে করেছে । এই বিপ্রতীপতাকে বিধেয়কলনে এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ

স (ক ,খ) ≡ স (খ, ক)[●]

জন লিয়ন্স (১৯৭৭ ঃ ১৫৪) তিন ধরনের সমতুল্যতা সম্পর্ক এবং তাদের বিপরীতে তিন ধরনের অসমতুল্যতা সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন ক্রমের ধারণার মাধ্যমে । এগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) **প্রতিসম ও অপ্রতিসম সম্পর্ক** ঃ প্রতিসম সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তি বা বস্তু অন্যোন্য সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ একের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য অন্যের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয় । যেমন খালেক যদি মালেকের বন্ধু হয় তাহলে মালেকও খালেকের বন্ধু হবে । অন্যদিকে অপ্রতিসম সম্পর্কের ক্ষেত্রে একের জন্য যা প্রযোজ্য হবে অন্যের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না । যেমন খালেক যদি মালেকের পিতা হয় তবে মালেক খালেকের পিতা হতে পারবে না । প্রতিসম ও অপ্রতিসম সম্পর্ক এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

স (ক, খ) ≡ স (খ, ক)
স (ক, খ) ≠ স (খ, ক)

(২) **সঞ্চারমূলক ও অসঞ্চারমূক সম্পর্ক** ঃ সঞ্চারমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্তু এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তা প্রথম ও তৃতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর উপরও প্রযোজ্য হয় । অসঞ্চারমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না । যেমন খালেক যদি মালেকের চেয়ে লম্বা এবং সালেক যদি খালেকের চেয়ে লম্বা হয় তবে সালেক মালেকের চেয়েও লম্বা হবে । যে কোন পরিমাপের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক সত্য । অন্যদিকে খালেক যদি মালেকের পিতা হয় এবং সালেক যদি খালেকের পিতা হয় তবে সালেক অবশ্যই মালেকের পিতা নয় । সঞ্চারমূলক ও অসঞ্চারমূলক সম্পর্ককে এভাবে দেখানো যায় ঃ

ক > খ এবং খ > গ
∴ ক > গ
ক > খ এবং খ > গ
∴ ক ≯ গ

(৩) **আত্মবাচক ও অনাত্মবাচক সম্পর্ক** ঃ আত্মবাচক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে ভেদ বিলুপ্ত হয় এবং একের সম্পর্ক অন্যের উপর প্রতিফলিত হয় । অনাত্মবাচক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা দৃষ্ট হয় না । ব্যক্তি একইসাথে পিতার সন্তান এবং মাতার সন্তান । উভয় ক্ষেত্রেই সে সন্তান, কাজেই সম্পর্কটি আত্মবাচক । অন্যদিকে কেউ কখনো নিজে নিজের পিতা বা মাতা হতে পারে না – তাই এই সম্পর্কটি অনাত্মবাচক । আত্মবাচক ও অনাত্মবাচক সম্পর্ককে এভাবে দেখানো যায় ঃ

[●] যুক্তিবিদ্যায় ≡ এই প্রতীকটি ব্যবহৃত হয় সমতুল্যতা বোঝাতে ।

Dhaka University Institutional Repository

স (ক, ক)
স (ক, ~ ক)

বিধেয় কলনে ~ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয় নেতিবাচকতা বোঝাতে । সমতুল্যতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক চিহ্নটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । যেমন আমরা বলতে পারি *সকল মানুষ মরণশীল* -এর মানে হলো – এমন কোন মানুষ নেই যে মরনশীল নয় । ব্যাপারটিকে এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$\forall x\ (\text{অ}\ (x) \rightarrow \text{আ}\ (x)) \equiv \sim\exists x\ (\text{অ}\ (x)\ \&\ \sim\text{আ}\ (x))$$

সাধারণ নেতিবাচক বাক্য বর্ণনার জন্যও ~ চিহ্নটির প্রয়োজন হয় । যেমন, *কেউ আসেনি* – এ বাক্যটিকে এভাবে লেখা যায় ঃ

$$\sim\exists x\ (\text{অ}\ (x))$$

এখানে,
অ = আসা

একইভাবে *মুনিম বই পড়েনি* হবে এরকম ।

~ অ (ক, খ)
এখানে,
অ = পড়া
ক = মুনিম
খ = বই

নেতিবাচক চিহ্ন ব্যবহার করে আমরা কৌমার্যের সংজ্ঞা দিতে পারি ঃ

$$\forall x\ (\text{অ}\ (x) \rightarrow \sim\text{ই}\ (x))$$

এখানে,
অ = কুমার
ই = বিবাহিত

অর্থাৎ যে কুমার সে বিবাহিত নয় (কুমারীর বেলায় অবশ্য একই কথা প্রযোজ্য)।

শুরুতে আমরা বিধেয় কলনের সংজ্ঞায় বলেছিলাম যে বিধেয়ক ও যুক্তি অধীনস্থকরণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে । ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখা যাক । অধীনস্থকরণকে আমরা এতক্ষণ বন্ধনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছি যদিও বিষয়টি পরিস্কার করে বলা হয়নি । আমরা নীচের বাক্যটি লক্ষ্য করতে পারি ঃ

শানু বিশ্বাস করে যে পানু রানুকে ভালবাসে ।

বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহার করে এভাবে বলা যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস করা (শানু (ভালবাসা (পানু, রানু)))
অ (ক (আ (খ, গ)))

এখানে দেখা যাচ্ছে (খ, গ) যুক্তিদুটি বিধেয়ক আ -এর অধীন, আবার আ (খ, গ) বচনটি যুক্তি ক -এর অধীন এবং ক (আ (খ, গ) আবার বিধেয়ক অ -এর অধীন । এভাবে বিধেয় কলনে বিধেয়ক ও যুক্তি মিলে একটি স্তরক্রম রচনা করে । আমরা এবার *পুলিশ রুবেলকে হত্যা করেছে* –এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করতে পারি ঃ

ঘটানো (পুলিশ (হওয়া (*রুবেল* (~জীবিত))))

বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে অধীনস্থকরণ সম্পর্কটি পরিস্কার বোঝা যাবে ঃ

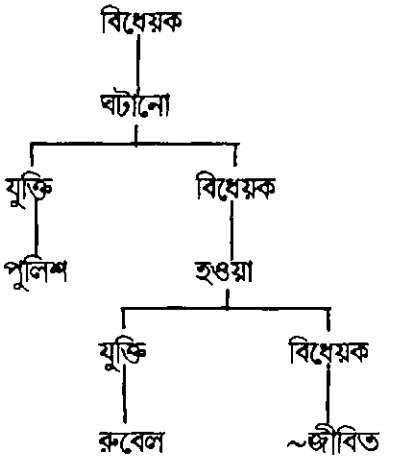

এভাবেই যুক্তিবিদরা বিধেয়কলনকে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে কাজে লাগিয়েছেন ।

বাচনিক যুক্তিবিদ্যা

বাচনিক যুক্তিবিদ্যা বচনসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে । বাচনিক যুক্তিবিদ্যাকে অনেকে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে নিয়োগ করে থাকেন । তবে এটি কিভাবে বাগর্থের সাথে যুক্ত তা বোঝার জন্য *যৌক্তিক বাক্য তত্ত্বের* সাথে পরিচিত হতে হবে । রুডল্‌ফ কারন্যাপ যৌক্তিক বাক্যতত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "কোন ভাষার যৌক্তিক বাক্যতত্ত্ব বলতে আমরা বুঝি সেই ভাষার ভাষিক রূপের রৌপিক তত্ত্ব – ভাষার নিয়ন্ত্রণকারী রৌপিক নিয়মের সুশৃঙ্খল বর্ণনা এবং তার সাথে ঐ সমস্ত নিয়ম প্রয়োগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তার অভিব্যক্তি।"(Barhillel 1964: 38)● যৌক্তিক বাক্যতত্ত্বের কাজ বচন নিয়ে যা যুক্তিবিদ্যার মৌলিক একক ।

● "By the logical syntax of a language, we mean the formal theory of the linguistic forms of that language – the systematic statement of the formal rules which govern it together with the development of the consequences which follow from these rules." Yehoshua Bar-Hillel, (1964), *Language and Information: Selected Essays on Their Theory and Application*, p. 38.

Dhaka University Institutional Repository

একটি বচন আরেকটি বচনের সাথে সম্পর্কিত হয় যৌক্তিক সংযোজক বা যৌক্তিক চালকের মাধ্যমে। নীচে কয়েক ধরনের যৌক্তিক চালকের নাম উল্লেখ করা হলো যার কয়েকটির সাথে ইতোমধ্যে আমাদের পরিচয় ঘটেছেঃ

প্রতীক	নাম	বাংলারূপ
$\wedge$ বা &	সংযুক্তি	(এবং)
$\vee$	বিযুক্তি	(অথবা)
~ বা $\neg$	নেতিবাচকতা	(যদি .. তবে)
$\Rightarrow$	ইঙ্গিত	(যদি .. তবে)
$\equiv$	সমতুল্যতা	(যদি এবং কেবল যদি .. তবে)

(Brainerd 1971: 1; Palmer 1981: 180)

এখন উপরোক্ত যৌক্তিক চালকসমূহ ব্যবহার করে আমরা বিভিন্নভাবে বচন সংযুক্ত করতে সক্ষম । আমরা বচনসমূহকে বাংলায় ঙ, ঞ, ক্ষ দিয়ে চিহ্নিত করবো (ইংরেজীতে এক্ষেত্রে p, r, q ব্যবহৃত হয়) । যেমন ঃ

তিনি ধনী এবং তিনি সুখী	ঙ $\wedge$ ঞ
তিনি ধনী অথবা তিনি সুখী	ঙ $\vee$ ঞ
তিনি ধনী এবং তিনি সুখী নন	ঙ $\wedge$ ~ঞ
তিনি যদি ধনী হন তবে তিনি সুখী	ঙ $\Rightarrow$ ঞ
তিন সুখী যদি এবং কেবল যদি তিনি ধনী	ঙ $\equiv$ ঞ
তিনি ধনী এবং সুখী এবং সৎ	ঙ $\wedge$ ঞ $\wedge$ ক্ষ
তিনি ধনী এবং সুখী অথবা সৎ	ঙ $\wedge$ ঞ $\vee$ ক্ষ
তিনি ধনী অথবা সুখী এবং সৎ	ঙ $\vee$ ঞ $\wedge$ ক্ষ
তিনি ধনী কিন্তু অসুখী ও অসৎ	ঙ $\wedge$ ~ঞ $\wedge$ ~ক্ষ

একটি বচন সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে । বচনের সত্য বা মিথ্যা হওয়াকে বলে **সত্যমূল্য** । যৌগিক বচন সত্য না মিথ্যা তা নির্ভর করে সরল বচনগুলির সত্য বা মিথ্যা হওয়ার উপর । সরল বচন ও যৌগিক বচনের মধ্যে সত্যমূল্যের সম্পর্ক তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় । এ ধরনের তালিকাকে বলা হয় **সত্য সারণী** । ইংরেজীতে সত্যকে t এবং মিথ্যাকে f দিয়ে লেখা হয় । আমরা বাংলায় সত্যকে স মিথ্যাসে ম দ্বারা চিহ্নিত করবো । একটি বচন একইসাথে সত্য ও মিথ্যা হতে পারে না । যেমন *তিনি সৎ* এটি হয় সত্য না হয় মিথ্যা হবে কিন্তু একইসাথে সত্য কিংবা মিথ্যা হবে না । অন্যভাবে বলা যায় তিনি সৎ এটি মিথ্যা হলে তিনি অসৎ এটি সত্য হবে । এটি নেতিবাচকতার নিয়ম । একটি ইতিবাচক বচন এবং তার বিপরীতে একটি নেতিবাচক বচনের মধ্যে সম্পর্ককে একটি ছোট সত্য সারণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ঙ	~ঙ
স	মি
মি	স

একইভাবে আমরা সংযুক্তি ও বিযুক্তির জন্য সত্য সারণী তৈরী করতে পারি ঃ

ঙ	ঞ	ঙ ∧ ঞ
স	স	স
স	মি	মি
মি	স	মি
মি	মি	মি

ঙ	ঞ	ঙ ∨ ঞ
স	স	স
স	মি	স
মি	স	স
মি	মি	মি

কাজেই সংযুক্তির ক্ষেত্রে উভয় বচন সত্য হলে যৌগিক বচনটি সত্য এবং উভয় বচন মিথ্যা হলে যৌগিক বচনটি মিথ্যা হবে, কিন্তু দুটির একটি সত্য ও একটি মিথ্যা হলে যৌগিক বচনটি মিথ্যা হবে । আমরা উদাহরণ সরবরাহ করতে পারি ঃ

তিনি শিক্ষিত (সত্য)
তিনি সত্যবাদী (সত্য)
∴ তিনি শিক্ষিত ও সত্যবাদী (সত্য)

তিনি শিক্ষিত (সত্য)
তিনি সত্যবাদী (মিথ্যা)
∴ তিনি শিক্ষিত ও সত্যবাদী (মিথ্যা)

তিনি শিক্ষিত (মিথ্যা)
তিনি সত্যবাদী (সত্য)
∴ তিনি শিক্ষিত ও সত্যবাদী (মিথ্যা)

তিনি শিক্ষিত (মিথ্যা)
তিনি সত্যবাদী (মিথ্যা)
∴ তিনি শিক্ষিত ও সত্যবাদী (মিথ্যা)

বিযুক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি বচনের উভয়টি সত্য অথবা একটি সত্য ও একটি মিথ্যা হলে যৌগিক বচনটি সত্য এবং উভয় বচন মিথ্যা হলে যৌগিক বচনটি মিথ্যা হয় ।

তিনি শিক্ষিত (সত্য)
তিনি সত্যবাদী (সত্য)
∴ তিনি শিক্ষিত অথবা সত্যবাদী (সত্য)

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শিক্ষিত (সত্য)
তিনি সত্যবাদী (মিথ্যা)
∴ তিনি শিক্ষিত অথবা সত্যবাদী (সত্য)

তিনি শিক্ষিত (মিথ্যা)
তিনি সত্যবাদী (সত্য)
∴ তিনি শিক্ষিত অথবা সত্যবাদী (সত্য)

তিনি শিক্ষিত (মিথ্যা)
তিনি সত্যবাদী (মিথ্যা)
∴ তিনি শিক্ষিত অথবা সত্যবাদী (মিথ্যা)

এখানে একটি ব্যাপার বলা প্রয়োজন যে যুক্তিবিদ্যার *অথবা* এবং সাধারণ ভাষার *অথবা* -র মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য দেখা দেয় । যুক্তিবিদ্যার *অথবা* -কে বলা হয় **অন্তর্ভূক্তিমূলক অথবা** যা **বহির্ভূক্তিমূলক অথবা** থেকে পৃথক । *বহির্ভূক্তিমূলক অথবা* -র উদাহরণ হলো ঃ

তিনি শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত
তিনি সত্যবাদী অথবা মিথ্যাবাদী

এগুলোকে *হয় ... নয়/নতুবা* সংযোজক দিয়ে প্রকাশ করা যায় । যেমন ঃ

হয় তিনি শিক্ষিত নতুবা অশিক্ষিত
হয় তিনি সত্যবাদী নয় মিথ্যাবাদী ।

এধরনের যৌগিক বচনের সাথে সরল বচনের সম্পর্ক অবিকল আমাদের সত্য সারণীর মতো নয় । যেমন, *তিনি শিক্ষিত এবং তিনি অশিক্ষিত* এর একটি সত্য এবং একটি মিথ্যা হলে তিনি *শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত* সত্য হবে । কিন্তু আমাদের সারণীতে এরূপ ক্ষেত্রে যৌগিক বচনটি মিথ্যা হয় । এই পার্থক্যের কারন হলো অঞ্চল বিভাজন । বহির্ভূক্তিমূলক বিযুক্তির ক্ষেত্রে সরল বচনগুলোর অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকে, কিন্তু অন্তর্ভূক্তিমূলক বিযুক্তির ক্ষেত্রে অঞ্চলদুটি পরস্পরকে অধিক্রমন করে । এজন্য প্রথম ক্ষেত্রে কেউ সত্যবাদী হলে তাকে আর মিথ্যাবাদী হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একজনের পক্ষে একইসাথে শিক্ষিত ও সত্যবাদী হওয়া সম্ভব । বহির্ভূক্তিমূলক বিযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিযুক্তিকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় ঃ

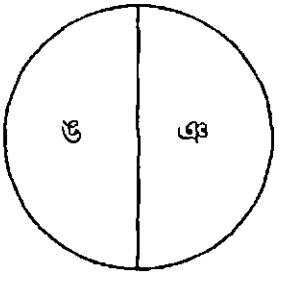

বহির্ভূক্তিমূলক বিযুক্তি

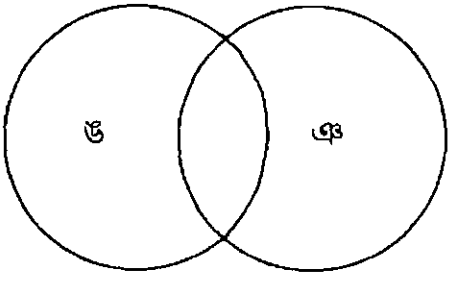

অন্তর্ভুক্তিমূলক বিযুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

এবার ইঙ্গিতের প্রসঙ্গে আসা যাক । ইঙ্গিতের ক্ষেত্রে একটি বচন থেকে যৌক্তিকভাবে আরেকটি বচন নিঃসৃত হয় । ইঙ্গিতের সত্যসারণীটি এরকম ঃ

ঙ	ঞ	ঙ ⇒ ঞ
স	স	স
স	মি	মি
মি	স	স
মি	মি	স

এখানে দেখা যায় সত্য বচন থেকে কেবল সত্য বচন, কিন্তু মিথ্যা বচন থেকে সত্য বচন ও মিথ্যা বচন উভয়ই যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হতে পারে । উদাহরণ দেয়া যেতে পারে ঃ

গরু চতুষ্পদ (সত্য)
মানুষ দ্বিপদ (সত্য)
গরু যদি চতুষ্পদ হয় তবে মানুষ দ্বিপদ (সত্য)

গরু চতুষ্পদ (সত্য)
মানুষ চতুষ্পদ (মিথ্যা)
গরু যদি চতুষ্পদ হয় তবে মানুষ চতুষ্পদ (মিথ্যা)

গরু দ্বিপদ (মিথ্যা)
মানুষ দ্বিপদ (সত্য)
গরু যদি দ্বিপদ হয় হবে মানুষ দ্বিপদ (সত্য)

গরু দ্বিপদ (মিথ্যা)
মানুষ চতুষ্পদ (মিথ্যা)
গরু যদি দ্বিপদ হয় তবে মানুষ চতুষ্পদ (সত্য)

এখানে ব্যাপারটি একটু গোলমেলে মনে হতে পারে । মিথ্যা বচন থেকে যদি সত্য ও মিথ্যা উভয় বচন নিঃসৃত হয় তাহলে নীচের বাক্যদুটি সত্য হবে ঃ

আমি যদি অদৃশ্য হই তবে কেউ আমাকে দেখতে পারে না ।
আমি যদি অদৃশ্য হই তবে সবাই আমাকে দেখতে পাবে ।

এরকম আপাত অসামঞ্জস্যের কারণ হলো যুক্তিবিদ্যার ইঙ্গিতটি *পদার্থমূলক ইঙ্গিত* যা সাধারণ ভাষার *কড়াকড়ি ইঙ্গিত* থেকে ভিন্ন । পদার্থমূলক ইঙ্গিতে দুটি বচনের মধ্যে একটি যান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে কড়াকড়ি ইঙ্গিতে দুটি বচনের মধ্যে একটি আন্তর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

এবার আমরা সমতুল্যতার সত্যসারণী নির্মান করতে পারি ঃ

ঙ	ঞ	ঙ ≡ ঞ
স	স	স
স	মি	মি
মি	স	মি
মি	মি	স

সাধারণভাবে বলতে গেলে সমতুল্যতা হলো দুটি ইঙ্গিতের সংযুক্তি । যেমন, ঙ ≡ ঞ এর মানে হলো (ঙ ⇒ ঞ) ∧ (ঞ ⇒ ঙ) । সাধারণ ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ঃ

> যদি আবুল বাবুলের বন্ধু হয় এবং বাবুল আবুলের বন্ধু হয় তবে আবুল এবং বাবুল সমতুল্য (অর্থাৎ তারা পরস্পরের বন্ধু)

সমতুল্যতার সাথে সংযুক্তি ও বিযুক্তির মতো নেতিবাচকতার একটি সম্পর্ক রয়েছে । তাদের মধ্যে মিথক্রিয়ার একটি রূপ হলো ঃ

> (ঙ ⇒ ঞ) ≡ (~ঙ ∨ ঞ) ≡ ~(ঙ ∧ ~ঞ)
>
> বক লাল হলে কাক কালো ≡ বক লাল নয় অথবা কাল কালো ≡ বক লাল এবং কাক কালো নয় এর কোনটাই নয় ।

জেফ্রি লীচ (১৯৮১ ঃ ১৬৬-১৬৭) যৌক্তিক চালকের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে প্রজ্ঞাপন, অনুলাপ, ও স্ববিরোধের ব্যাখ্যা দেন ।

প্রজ্ঞাপন ঃ প্রজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে একটি বচন সত্য হলে তার থেকে অনুমিত বচনটি অবশ্যই সত্য হবে । যেমন, *খালেদ বই পড়ে* যদি সত্য হয় তবে *খালেদ পড়ে* অবশ্যই সত্য । এক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বচনটিকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় ঃ

ঙ ⇒ ঞ

অনুলাপ ঃ অনুলাপের ক্ষেত্রে একটি বচনের পুনরাবৃত্তি ঘটে । যেমন, *যদি বরফ শীতল হয় তবে তা গরম নয়* বচনটি *বরফ শীতল* এই বচনের অনুলাপ । অনুলাপকে এভাবে দেখানো যায় ঃ

ঙ ⇒ যদি ঞ

স্ববিরোধ ঃ স্ববিরোধের ক্ষেত্রে দুটি বচন বিপরীত সত্য নির্দেশ করে । যেমন, *বরফ শীতল এবং বরফ গরম* স্ববিরোধী । যদি ঙ কোন বচন হয় তবে তার সাথে ~ঙ -এর সংযুক্তি স্ববিরোধী হবে । যেমন ঃ

ঙ ∧ ~ঙ
আকাশ নীল এবং আকাশ নীল নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই দার্শনিকগণ বাচনিক যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন বাগর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রয়াস পান । যৌক্তিক চালকের গুরুত্ব সম্পর্কে লীচ (১৯৮১ ঃ ১৬৬) বলেন ঃ

> "এই উপকরণগুলি মানুষের চিন্তাশক্তিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে কারণ এগুলোর মাধ্যমেই আমরা প্রকাশ্যভাবে বাগর্থিক বিষয়ের সম্পর্ক ও শ্রেণীসমূহকে কার্যে নিয়োজিত করি ; সেগুলো কেবল আমাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনাতেই সক্ষম করে তোলে না বরং সত্যের নিয়ন্ত্রণমূলক ধারণার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার প্রমাণাদিকে মূল্যায়ন, সে সম্পর্কে যুক্তিনির্মান এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত অনুমানে সক্ষম করে তোলে । বলতে গেলে সেগুলো হলো বাগর্থিক সংশ্রয়ের নিয়ামক উপকরণ ।"●

অর্থ স্বীকার্য

যুক্তিবিদ কারন্যাপ সর্বপ্রথম অর্থ স্বীকার্যের ধারণা প্রচার করেন । ঔপাদানিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এর জন্ম হয় এবং এটিকে সর্বাগ্রে উপনামীয় সম্পর্ক বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা হয় (Kempson 1977: 188) । উপনামিতাকে এভাবে রূপবদ্ধ করা হয় ঃ

$$x\,(A_x \Rightarrow B_x)$$

আংশিক বাংলা মিশিয়ে আমরা লিখতে পারি ঃ

$$X\ (\text{ক}_x \Rightarrow \text{খ}_x)$$

এর অর্থ হতে পারে ঃ যদি কোন কিছু ক হয় তবে তা অবশ্যই খ ।

এখানে যৌক্তিক চালক হিসাবে ইঙ্গিতকে ব্যবহার করা হয়েছে । ক ও খ -কে আমরা যে কোন উপনাম ও উর্ধ্বনাম দিয়ে অপসারণ করতে পারি । যেমন ঃ

$X\ (\text{গোলাপ}_x \Rightarrow \text{ফুল}_x)$
$X\ (\text{হাতি}_x \Rightarrow \text{পশু}_x)$
$X\ (\text{বেগুন}_x \Rightarrow \text{সব্জি}_x)$
$X\ (\text{রসগোল্লা}_x \Rightarrow \text{মিষ্টান্ন}_x)$
$X\ (\text{ধাত্রী}_x \Rightarrow \text{মহিলা}_x)$
$X\ (\text{ভাস্কর}_x \Rightarrow \text{শিল্পী}_x)$
$X\ (\text{মহাভারত}_x \Rightarrow \text{ধর্মগ্রন্থ}_x)$

● "These elements greatly increase the power of human thinking, because they are instruments with which we can explicitly manipulate the categories and relationships of semantic content; they enable us not only to describe experience, but evaluate, argue about, and draw conclusions from, the evidence of experience, using the regulative concept of truth. They are the controlling elements, as it were, of the semantic system." Geoffrey Leech, *Semantics*, p.166.

Dhaka University Institutional Repository

X (খোশগল্প করা$_x$ $\Rightarrow$ কথা বলা$_x$)

X (হাঁটা$_x$ $\Rightarrow$ নড়া$_x$)

এখানে আমরা একটি জিনিস উহ্য রেখেছি, তা হলো সার্বজনীন পরিমাপক $\forall$ যা যুক্তিতে সবার উপর প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করে । সার্বজনীন পরিমাপক প্রকাশ্য হলে আমাদের সূত্রটি দেখাবে এরকম ঃ

$\forall x$ (ক x $\Rightarrow$ খ x)

উপনাম ও উর্ধ্বনাম বসিয়ে ঃ

$\forall x$ (স্তন্যপায়ী$_x$ $\Rightarrow$ প্রাণী$_x$)

$\forall x$ (কুকুর$_x$ $\Rightarrow$ স্তন্যপায়ী$_x$)

$\forall x$ (নেড়ি$_x$ $\Rightarrow$ কুকুর$_x$)

উপরের তিনটি বিধি একত্রে একটি স্তরক্রম গঠন করে যেখানে বৃহত্ত্বের দিক দিয়ে ঃ প্রাণী > স্তন্যপায়ী > কুকুর > নেড়ি ঃ

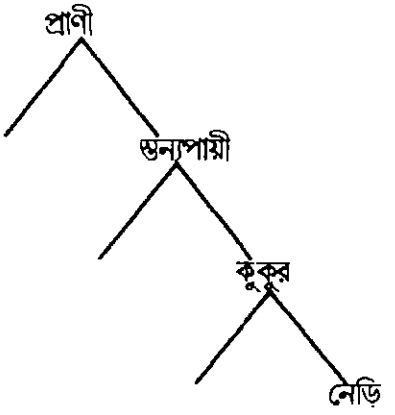

লক্ষ্যণীয়, এখানে বৃহত্ত্ব বলতে প্রাণীর আকার আকৃতি ওজন বোঝানো হচ্ছে না, বৃহত্ত্ব এখানে শ্রেণীর বৃহত্ত্ব । অর্থাৎ একটি শ্রেণীতে কি সংখ্যক ব্যক্তিএকক রয়েছে তা দিয়ে নির্ধারিত হবে শ্রেণীর বৃহত্ত্ব । যেমন *নেড়ির* যে ব্যক্তিএকক *কুকুর* -এর ব্যক্তি একক তার চেয়ে বেশি, কারণ *কুকুর* শ্রেনীটি গঠিত হয় নেড়ি এবং অন্যান্য অনেক জাতের কুকুর মিলে । তাই সংখ্যার দিক দিয়ে নেড়ির চেয়ে কুকুর বৃহত্তর এবং স্তরক্রমে কুকুরের অবস্থান নেড়ির উপরে । এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষ্যণীয়, যখন আমরা সংখ্যার কথা বলি তখন আমরা আসলে শ্রেণীর বাচ্যার্থের (বা বহির্দ্যোতনার) দিকে ইঙ্গিত করি । এই হিসাবে *কুকুর* -এর বাচ্যার্থ নেড়ির চেয়ে বেশি, *স্তন্যপায়ী* -র বাচ্যার্থ *কুকুর* -এর চেয়ে বেশি এবং *প্রাণী* -র বাচ্যার্থ স্তন্যপায়ীর চেয়ে বেশি । স্পষ্টতঃই এর সাথে সেটের ধারণা যুক্ত । সেট নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যক্তিএককের সংখ্যা দ্বারা । এজন্য স্বাভাবিকভাবে একটি সেট অন্য একটি সেটের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে । সেটের ধারণা ভালভাবে বোঝা যায় লেখচিত্রে । যেমন ক, খ, গ, ঘ যদি চারটি সেট হয় এবং স্তরক্রমিকভাবে একটি আরেকটির অন্তর্ভূক্ত হয় তবে তাকে এভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ

Dhaka University Institutional Repository

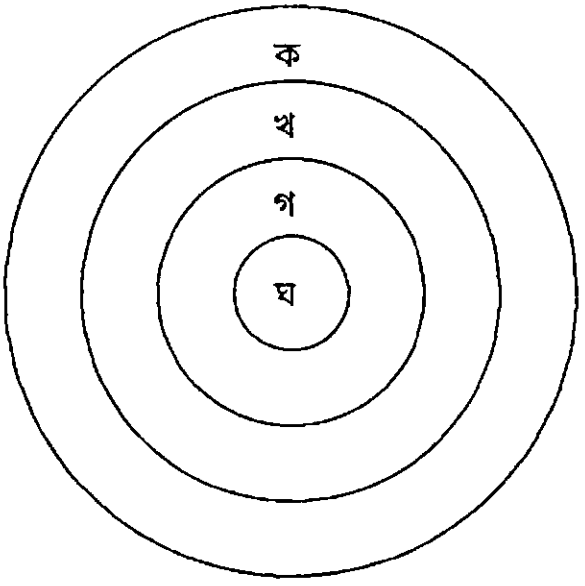

এখন পূর্বের উদাহরণের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা ক -কে প্রাণী, খ -কে স্তন্যপায়ী, গ -কে কুকুর এবং ঘ -কে নেড়ি হিসাবে কল্পনা করতে পারি । এখানে দেখা যায় ঘ গ-এর অন্তর্ভুক্ত, গ খ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং খ ক -এর অন্তর্ভুক্ত । এই অন্তর্ভুক্তিকে আমরা উপসেটের বা অতিসেটের ধারণা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি । ঘ গ-এর উপসেট, গ খ-এর উপসেট এবং খ ক-এর উপসেট । অথবা বিপরীতক্রমে গ ঘ-এর অতিসেট, খ গ-এর অতিসেট এবং ক খ -এর অতিসেট । সেট তত্ত্বে উপসেটকে $\subset$ চিহ্ন এবং অতিসেটকে $\supset$ দিয়ে প্রকাশ করা যায় । ফলে আমরা লেখতে পারি ঃ

$$ঘ \subset গ \subset খ \subset ক$$

অথবা,

$$ক \supset খ \supset গ \supset ঘ$$

এবার আমরা উপনামিতার সংজ্ঞা দিতে পারি ঃ

উপনামিতা ঃ ক হবে খ -এর উপনাম যদি কোন অর্থ স্বীকার্য ক ও খ -কে এভাবে সম্পর্কিত করে ঃ
$(\forall x\ (কx \Rightarrow খx)$ যেখানে ক-এর বহির্দ্যোতনা হবে খ-এর বহির্দ্যোতনার উপসেট । ●

কেবল উপনামিতাই নয়, অর্থ স্বীকার্যের মাধ্যমে অন্যান্য অর্থ সম্পর্কসমূহও বিশ্লেষণ করা যায় । রনি ক্যান (১৯৯৩) অর্থ স্বীকার্যের মাধ্যমে উপনামিতাসহ সহনামিতা, পরিপূরকতা, প্রতিনামিতা, বিপ্রতীপতা ব্যাখ্যা করেন । নীচে আমরা সেসব সংক্ষেপে আলোচনা করবো (উপনামিতা আমরা উপরে আলোচনা করেছি) ।

সহনামিতা ঃ ক হবে খ -এর সহনাম যদি কোন অর্থ স্বীকার্য ক ও খ -কে এভাবে সম্পর্কিত করে ঃ
$\forall x\ (কx \Leftrightarrow খx)$ যেখানে ক এবং খ -এর বহির্দ্যোতনা অভিন্ন ।

● Ronnie Cann (1993: 219) অনুসরণে ।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ⇔ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ইঙ্গিত উভয়মুখী । এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সমতুল্যতা সম্পর্ক প্রকাশ করে । উদাহরণ ঃ

$\forall x$ (রবি x ⇔ সূর্য x)
$\forall x$ (শশী x ⇔ চাঁদ x)
$\forall x$ (মৃত্তিকা x ⇔ মাটি x)
$\forall x$ (বৃক্ষ x ⇔ গাছ x)
$\forall x$ (চিত্র x ⇔ ছবি x)

প্রতিনামিতা ঃ ক হবে খ -এর প্রতিনাম যদি কোন অর্থ স্বীকার্য ক ও খ -কে এভাবে সম্পর্কিত করে ঃ $\forall x$ (ক x ⇒ ~খ x) যেখানে কোন বাগর্থিক অঞ্চলের প্রেক্ষিতে ক ও খ-এর বহির্দ্যোতনা ভিন্ন । যেমন ঃ

$\forall x$ (বড় x ⇒ ~ছোট x)
$\forall x$ (ধনী x ⇒ ~গরীব x)
$\forall x$ (আকাশ x ⇒ ~পাতাল x)
$\forall x$ (আলো x ⇒ ~অন্ধকার x)
$\forall x$ (সাধু x ⇒ ~শয়তান x)

পরিপূরকতা ঃ ক এবং খ হবে পরস্পরের পরিপূরক যদি কোন অর্থ স্বীকার্য ক ও খ -কে এভাবে সম্পর্কিত করে $\forall x$ {(কx ⇒ ~খx) ∧ (~ক x ⇒ খ x)} যেখানে ক এবং খ -এর বহির্দ্যোতনা ভিন্ন । পরিপূরকতার ক্ষেত্রে দুটি পদ কোন বাগর্থিক অঞ্চলকে অতিক্রমন ব্যতিরেকে নিঃশেষে বিভক্ত করে । ফলে এক্ষেত্রে মাঝামাঝি কোন সম্ভাবনা থাকে না (কষ্ট কল্পনা পরিহার্য) । যেমন ঃ

$\forall x$ {(মূর্ত x ⇒ ~বিমূর্ত x) ∧ (~মূর্ত x ⇒ বিমূর্ত x)}
$\forall x$ {(জীবিত x ⇒ ~মৃত x) ∧ (~জীবিত x ⇒ মৃত x)}
$\forall x$ {(বিবাহিত x ⇒ ~অবিবাহিত x) ∧ (~বিবাহিত x ⇒ অবিবাহিত x)}
$\forall x$ {(মেরুদন্ডী x ⇒ ~অমেরুদন্ডী x) ∧ (~মরুদন্ডী x ⇒ অমেরুদন্ডী x)}
$\forall x$ {(সুস্থ x ⇒ ~অসুস্থ x) ∧ (~সুস্থ x ⇒ অসুস্থ x)}

বিপ্রতীপতা ঃ ক এবং খ হবে পরস্পরের বিপ্রতীপ যদি কোন অর্থ স্বীকার্য ক এবং খ -কে এভাবে সম্পর্কিত করে ঃ $\forall x \ldots \forall z$ (ক z…ক x ⇒ খ x…খ z) যেখানে $ব_১$, $ব_২$, $ব_৩$ যদি ক টুএর বহির্দ্যোতনা হয় তবে $ব_৩$, $ব_২$, $ব_১$ হবে খ-এর বহির্দ্যোতনা । যেমন ঃ

$\forall x \forall y \forall z$ (বিক্রি করা xyz ⇒ ক্রয় করা zyx)
$\forall x \forall y \forall z$ (উপহার দেয়া xyz ⇒ উপহার পাওয়া zyx)
$\forall x \forall y$ (স্বামী xy ⇒ স্ত্রী yx)

Dhaka University Institutional Repository

$\forall x \ \forall y$ (উপরে xy $\Rightarrow$ নীচে yx)
$\forall x \ \forall y$ (সামনে xy $\Rightarrow$ পিছনে yx)

এভাবেই অর্থ স্বীকার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয় । কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে থাকবো অর্থ স্বীকার্যের মাধ্যমে কেবল শব্দার্থ ব্যাখ্যা করা যায়, বাক্যার্থ ব্যাখ্যা করা যায় না । ফলে এটি তত্ত্ব হিসাবে ঔপাদানিক বিশ্লেষণের মতোই সীমাবদ্ধ । কেম্পসন (১৯৭৭ ঃ ১৯০) এর সমালোচনায় বলেন ঃ

> "শাব্দিক অর্থ ব্যাখ্যায় অর্থ স্বীকার্যের গ্রহণযোগ্যতা বাগর্থিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে যথেষ্ট নয়, কারণ আমাদের শব্দার্থ ও বাক্যার্থের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে যা অর্থ স্বীকার্য গাঠনিকতার আয়ত্তের বাইরে ।"●

সত্যশর্ত

দার্শনিক গটলব ফ্রেজ সর্বপ্রথম বিংশ শতাব্দী শুরুর অব্যবহিত পূর্বে সত্যশর্তের ধারণা প্রচার করেন এবং বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আলফ্রেড টার্সকি একে শক্ত তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান । পরবর্তীতে ডেভিডসন, স্ট্রসন, মন্টেগ প্রমুখ দার্শনিক সত্যশর্তের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বাগর্থিক তত্ত্ব প্রগঠন করেন । সত্যশর্তের উপর ভিত্তি করে বাগর্থিক তত্ত্বের যে বিকাশ ঘটেছে আমরা তাকে বলবো **সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যা** । সর্তশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার ইতিহাসটি একটু কৌতুহলোদ্দীক । এটি গড়ে উঠেছে অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে । অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাবে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ যখন বাগর্থবিদ্যার প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন সত্যর্শমূলক বাগর্থবিদগণ তখন ঘোষণা করেছিলেন ভাষার অর্থ বিশ্লেষণ সম্ভব তবে তা উদ্দীপক-সাড়ার মাধ্যমে নয়, সত্যশর্তের মাধ্যমে (দেখুন Harrison 1979; Martinich 1990) । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার অগ্রগতি আজও অব্যাহত রয়েছে, তবে এতদিনে তার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরী হয়ে গেছে – প্রয়োগবাদী বাগর্থবিদ্যা (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । যাহোক, এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো সত্যশর্ত কি এবং এটি কিভাবে বাগর্থিক তত্ত্বে ব্যবহৃত হয়েছে ।

কোন বাক্য (কড়াকড়িভাবে বলতে গেলে *বচন*) সত্য বা মিথ্যা হওয়ার পিছনে থাকে পার্থিব ঘটনা । টার্সকি (১৯৪৪/১৯৯০ ঃ ৪৯) বলেন, "একটি বাক্য সত্য হয় যদি তা কোন বিদ্যমান ঘটনার অবস্থা বর্ণনা করে ।" (A sentence is true if it designates an existing state of affairs) । যেমন আমি যদি বলি *বইটি টেবিলের উপর* তবে বাক্যটি সত্য হবে যদি বাস্তবে আমার নির্দেশিত বইটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে টেবিলের উপর থাকে । এর অন্যথা হলে বাক্যটি মিথ্যা হবে । আমরা ধরে নেই যে নির্দিষ্ট একটি সময়ে চিত্র-ক ও চিত্র-খ পৃথিবীর দুটি ঘটনা ঃ

● "The adoption of meaning postulates to account for lexical meaning is not sufficient in itself as the basis for a theory of meaning, for we still have to explain the relation between lexical meaning and sentence meaning, and this problem of the meaning postulate formalism does not purport to account for." Ruth M. Kempson (1977), *Semantic Theory*, p.190.

Dhaka University Institutional Repository

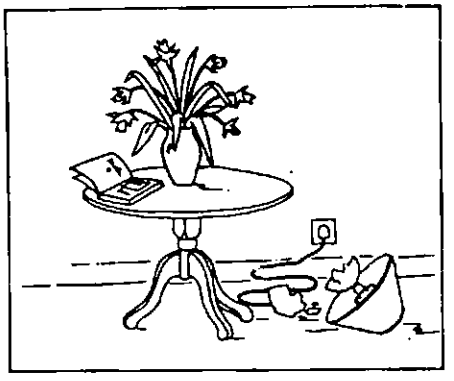

চিত্র-ক

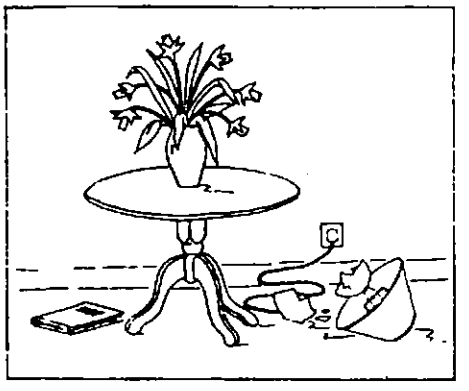

চিত্র-খ

আমাদের বাক্যটি সত্য হবে প্রথম চিত্রের প্রেক্ষাপটে, দ্বিতীয় চিত্রের প্রেক্ষাপটে নয় । কারণ প্রথমটি আমাদের বাক্য সত্য হওয়ার শর্ত পূরণ করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি তা পূরণে ব্যর্থ হয় ।

এ থেকে যে তথ্যটি বেরিয়ে আসে তা হলো একটি বাক্যের সত্যতা নির্ভর করে কিছু শর্তের উপর । এই শর্তগুলোকেই বলা হয় *সত্যশর্ত* । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদগন দাবি করেন যে কোন বাক্যের সত্যশর্তই হলো ঐ বাক্যের অর্থ । কোন বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে কোন্ শর্তাবলীর অধীনে বাক্যটি সত্য হয় । অর্থাৎ ঃ

S means that $p \equiv$ S is true iff p

এখানে S হলো বাক্য এবং p হলো সত্যশর্তের বিবৃতি । আমরা একে বাংলায় রূপান্তর করতে পারি (বাক্যকে বা এবং সত্যশর্তকে স ধরে) ঃ

বা এর অর্থ স = বা সত্য যদিদি স ●

এখানে সমতুল্যতার দ্বিতীয় অংশটি আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । *বা সত্য যদিদি স* কে উদাহরণযোগে বিস্তৃত করা যায় ঃ

তুষার সাদা সত্য যদি এবং কেবল যদি তুষার সাদা ।
Snow is white is true if and only if snow is white

এখন বৃষ্টি হচ্ছে সত্য যদি এবং কেবল যদি এখন বৃষ্টি হয় ।
It is raining is true if and only if it is raining

এ ধরনের বাক্যকে ইংরেজীতে বলা হয় T-sentence (truth sentence) । আমরা বাংলায় বলতে পারি স-বাক্য । স-বাক্যে যে ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু মনে হয় তা হলো এখানে এক প্রকাশ দুবার ব্যবহৃত হয়েছে । এজন্য এ তত্ত্বকে অনেক সময় *পৌনপুনিকতা তত্ত্ব* বলা হয় । (Harrson 1979: 128) । এই পৌনপুনিকতার কারণ হলো স-বাক্যে দুধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয় – এক ধরনের ভাষা দিয়ে কোন কিছু বলা হয় এবং অন্য ধরনের ভাষা দিয়ে প্রথম ভাষা সম্পর্কে কিছু বলা হয় । প্রথমটি হলো যাকে বলে **বস্তুভাষা** এবং দ্বিতীয়টি হলো যাকে

● *iff* (if and only if) -কে আমরা বাংলায় বলবো *যদিদি* (যদি এবং কেবল যদি) ।

Dhaka University Institutional Repository

বলে **অধিভাষা** (Ronnie Cann 1993: 16)। আমরা ইচ্ছা করলে বস্তুভাষা ও অধিভাষাকে দুটি ভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে পারি । তখন ব্যাপারটিকে আর অতটা দৃষ্টিকটু, ক্যানের ভাষার অতথ্যমূলক বা চক্রক, মনে হবে না । আমরা নীচের স-বাক্যদুটোর দিকে লক্ষ্য করতে পারি ঃ

The book is on the table সত্য যদি এবং কেবল যদি বইটি টেবিলের উপর থাকে ।
Das Buch ist auf dem Tisch সত্য যদি এবং কেবল যদি বইটি টেবিলের উপর থাকে ।

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স-বাক্যে বস্তুভাষা হিসাবে যথাক্রমে ইংরেজী ও জার্মান এবং উভয় স-বাক্যে অধিভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবহার করা হয়েছে । এখানে বস্তুভাষায় যা বলা হয়েছে অধিভাষায় তা সত্য হওয়ার শর্ত বিবৃত হয়েছে । কাজেই দেখা যায় সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যা অনুযায়ী কোন বাক্যের অর্থ হলো সেই বাক্যের সত্যশর্ত । অর্থাৎ ঃ

অর্থ = সত্য শর্ত

সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যা একদিকে বহির্দ্যোতক, অন্যদিকে অন্তর্দ্যোতক । কোন শব্দের বহির্দ্যোতনা হলো শব্দনির্দেশিত বস্তুর সেট, আর অন্তর্দ্যোতনা হলো শব্দনির্দেশিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সেট । যেমন *কুকুর* শব্দটির বহির্দ্যোতনা হলো পৃথিবীর সমস্ত কুকুর এবং অন্তর্দ্যোতনা হলো কুকুরত্ব নামক বৈশিষ্ট্য । একইভাবে কোন বাক্যের অন্তর্দ্যোতনা হলো সেই বাক্যে অন্তর্নিহিত বচন এবং বহির্দ্যোতনা হলো বাক্য নির্দেশিত পার্থিব ঘটনা । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার কাজ হলো অন্তর্দ্যোতনা ও বহির্দ্যোতনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা । রিচার্ড মনটেগের তত্ত্ব (১৯৭৪)-ও সেই চেষ্টায় নিয়োজিত । মনটেগের মতে অন্তর্দ্যোতনা অপেক্ষক হিসাবে সম্ভাব্য পৃথিবীতে সেট তাত্ত্বিক বহির্দ্যোতনার সাথে সম্পর্কিত (Harrson 1979: 91) । মন্টেগ তার তত্ত্বে মানুষের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি-র ব্যাখ্যা দেন সম্ভাব্য পৃথিবীর মাধ্যমে । তার তত্ত্ব তাই **সম্ভাব্য পৃথিবী বাগর্থবিদ্যার** পথিকৃত । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার পাঁচটি উপাদান রয়েছে (Palmer 1981: 199) ঃ

১. ভাষা নিজে (অর্থাৎ বস্তুভাষা)
২. সেই ভাষার ব্যাকরণিক বর্ণনা (অর্থাৎ অধিভাষা)
৩. অদ্ব্যর্থক বা যৌক্তিক ভাষা (যেমন iff / যদিদি)
৪. বচনের অন্তর্দ্যোতক জগত, এবং
৫. বহির্দ্যোতক জগত ।

মন্টেগের রূপায়নের দিকে তাকিয়ে আমরা অন্ততঃ আরো দুটি উপাদান যোগ করতে পারি ঃ ৬. বাচ্যার্থের কার্য এবং ৭. সম্ভাব্য পৃথিবী ।

কাজেই দেখা যায় সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর বিশ্লেষণ প্রণালী অত্যন্ত জটিল ।

সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার বড়গুণ এই যে এটি দিয়ে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণভাবে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণ করা যায় । কিন্তু এই তত্ত্বে সন্দেহেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে । এখানে মনে করা হয় যে অর্থ = সত্যশর্ত । কিন্তু অর্থ ও সত্যশর্তের এই সমীভবন আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । একটি বাক্যের অর্থ হলো বাক্যটি সত্য হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

শর্তাবলী -এ ধরনের রূপায়নে পৌনপুনিকতা ও চক্রকতা লক্ষ্য করেছেন গ্যারি কেম্প (১৯৯৮ ঃ ৪৮৩-৪৯৩) । তার যুক্তিপ্রক্রিয়াটি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

1. Cont <p> = that *p* [Cont = content or meaning]
2. Cont <p> = the TC of <p> [TC = truth conditions]
3. The TC of <p> = that Φ <p> [Φ = the property of truth]
4. Cont <p> that Φ <p> [from 3 and 2]
5. that *p* = that Φ <p> [from 4 and 1]
6. Cont <Φ<p>> = that Φ<p> [instance of 1]
7. Cont <p> = Cont <Φ<p>> [from 6 and 4]
8. Cont <Φ<p>> = that Φ<Φ<p>> [putting Φ<p> for p]
9. Cont <Φ<Φ<p>>> = that Φ<Φ<p>> [instance of 1]
10. Cont <Φ<p>> = Cont <Φ<Φ<p>>> [from 8 and 9]
11. Cont <p> = Cont <Φ<Φ<p>>> [from 10 and 7]

কাজেই এর পরিণতি হলো ঃ

γ. Cont <p> = Cont <Φ<Φ ...<p>...>>

অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি অসীমভাবে চলতে থাকবে যেখানে Φ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাবে । অতএব এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার পরিশৃঙ্খলায় ত্রুটি রয়েছে । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার আরো সীমাবদ্ধতা হলো এটি মানুষের বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করতে পারলেও মানুষের ভাষিক যোগাযোগকে ব্যাখ্যা করতে পারে না । তাই এটি বাস্তবে সাধারণ মানুষের কাছে অতটা ফলপ্রদ নয় ।

বাগর্থিক পরিবহন তত্ত্ব

সত্যশর্তের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার দান্তো (১৯৬৯) বাগর্থিক পরিবহন তত্ত্ব প্রণঠন করেন । দান্তোর মতে বাক্য হলো এক ধরনের যান যা অর্থকে বহন করে । এই অর্থ বর্ণনামূলক অর্থ । কোন বাক্যের বর্ননামূলক অর্থ একটি নিয়মের মাধ্যমে প্রদত্ত হয় যে নিয়মে ঐ বাক্যটি সত্য হওয়ার শর্তাবলী বিবৃত হয় । এখানে সত্য বলতে বুঝতে হবে ধনাত্মক বাগর্থিক মূল্য । কোন ধারণা ধনাত্মক বাগর্থিক মূল্য তখনই অর্জন করে যখন তা বাস্তব ঘটনার সাথে সংস্থাপিত হয় । বাগর্থিক পরিবহনের বর্ণনামূলক অর্থকে নিম্নোক্ত নিয়মে পরিশৃঙ্খলিত করা যায় ঃ

R: v (+) if and only if /k/

এখানে,

R = rule বা নিয়ম

v = semantical vehicle বা বাগর্থিক পরিবহন

Dhaka University Institutional Repository

(+) = positive semantical vehicle বা ধনাত্মক বাগর্থিক মূল্য
k = conditions বা শর্তাবলী অর্থাৎ সত্যশর্ত

কাজেই নিয়মটি হলো যদি /k/ বা সত্যশর্ত বজায় থাকে তবে একটি বাক্য বা তৎসংশ্লিষ্ট ধারণা v ধনাত্মক বাগর্থিক মূল্য (+) অর্জন করে অর্থাৎ সত্য হয় । অন্যদিকে, যদি সত্যশর্ত বজায় না থাকে তবে তা ঋণাত্মক বাগর্থিক মূল্য (–) অর্জন করে অর্থাৎ মিথ্যা হয় । দান্তোর মতে, কোন বাক্যকে জানা মানে বাক্যটি সত্য হওয়ার শর্তাবলীকে জানা বা জাগতিক ঘটনার সাথে নিজের জ্ঞানকে সংযুক্ত করা । কিন্তু বাক্যটিকে বোঝার জন্য তা প্রয়োজনীয় নয় । এভাবে দান্তো **জানা** ও **বোঝার** মধ্যে পার্থক্য করেন । যেমন *আকাশে আজ চাঁদ উঠেছে* এ বাক্যটি বোঝার জন্য আকাশে সত্যি সত্যি চাঁদ আছে কিনা তার জানার দরকার নেই । কিন্তু যদি কাউকে বাক্যটি জানতে হয় তবে তাকে আকাশ পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন পড়বে । এখানে জানা মানে সত্যতা জানা । তাকে বাক্যটির সত্যতা জানতে হলে তাকিয়ে দেখতে হবে আকাশে চাঁদ আছে কিনা । যদি চাঁদ থাকে তবে বাক্যটি সত্য এবং যদি না থাকে তবে বাক্যটি মিথ্যা । এভাবেই দান্তো জানা ও বোঝার মধ্যে পার্থক্য করেন ।

দান্তোর পরিবহন তত্ত্বটি কোন সুসংহত বা সুবিকশিত তত্ত্ব নয় । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার সমস্ত দোষত্রুটি এর উপর বর্তায় । তত্ত্বটিতে কিছু প্রতীক ব্যবহারের অভিনবত্ব থাকলেও এটি নতুন কোন সত্যকে তুলে ধরতে পারে না বা অর্থ ব্যাখ্যায় নতুন কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারে না । এটি তাই একটি দুর্বল বাগর্থিক তত্ত্ব ।

বাগর্থিক জ্ঞান তত্ত্ব

রিচার্ড লার্সন ও গ্যাব্রিয়েল সেগাল (১৯৯৫) তাদের সত্য শর্তমূলক বাগর্থিক জ্ঞান তত্ত্ব প্রকাশ করেন । তাদের মতে বাগর্থিক জ্ঞান মানুষের সামগ্রিক জ্ঞানের অংশবিশেষ । তাই বাগর্থতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বের অংশ । নোয়াম চমস্কির মতো তারা মনে করেন যে মানুষের ভাষা অনুষদ গঠিত হয় ভাষিক জ্ঞান বা যোগ্যতা দ্বারা এবং ভাষা অনুষদে থাকে একটি বাগর্থিক প্রকোষ্ঠ যাতে থাকে অর্থের জ্ঞান এবং যা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদির জ্ঞান থেকে পৃথক । ভাষা অনুষদে বাগর্থবিদ্যার অবস্থান লার্সন ও সেগাল একটি চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন ঃ

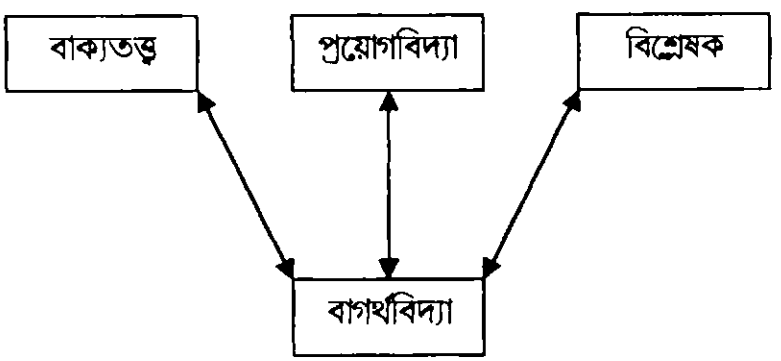

(Larson & Segal 1995: 23)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেখা যাচ্ছে বাগর্থবিদ্যা একসাথে বাক্যতত্ত্ব, প্রয়োগবিদ্যা ও বিশ্লেষকের সাথে যুক্ত । অর্থাৎ মানুষ যখন বাক্য গঠন করে, কথোপকথনে বাক্য প্রয়োগ করে এবং শ্রুত বাক্য বিশ্লেষণ করে তখন সে অর্থকে কাজে লাগায় । এভাবেই বাগর্থিক জ্ঞান অন্যান্য ভাষাজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত । লার্সন ও সেগালের মতে বাগর্থবিদ্যা একটি জ্ঞান সম্পর্কিত শাস্ত্র, তাই একে জ্ঞানাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের শাখা বলা যেতে পারে । তাদের মতে এটি একাধারে যুক্তিবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত । অন্যান্য শৃঙ্খলার সাথে বাগর্থবিদ্যার সম্পর্ক তারা এভাবে প্রদর্শন করেন ঃ

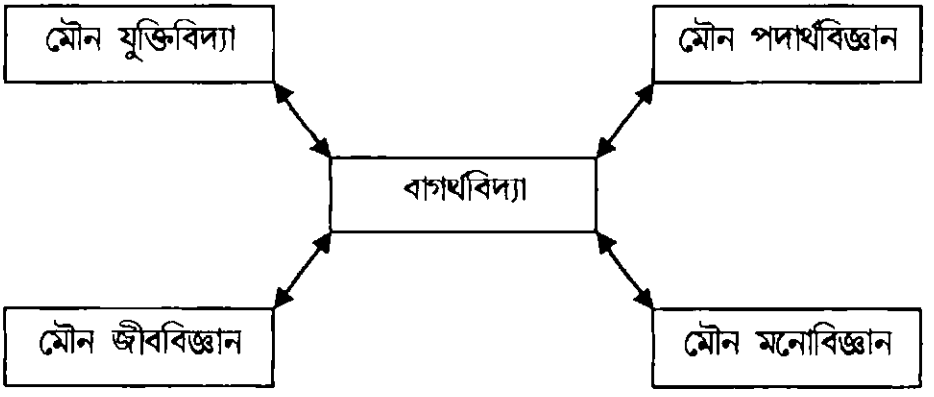

(Larson & Segal 1995: 23)

বাগর্থবিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে মৌনভাবে যুক্ত এই অর্থে যে বাগর্থবিদ্যা তাদের শাখা না হয়েও বা তাদের সাথে একীভূত না হয়েও তাদের অনুসন্ধান ও অন্তর্দৃষ্টিকে নীরবে অর্থ বিশ্লেষণের কাজে লাগায় ।

লার্সন ও সেগালের মতে বাগর্থিক তত্ত্বের কাজ হলো বাগর্থিক প্রকোষ্ঠের বিষয়াবলী বর্ণনা করা । অর্থাৎ এর কাজ হলো বাগর্থিক জ্ঞানের নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করা । এই নিয়ম ও নীতিগুলো হবে সংখ্যার দিক দিয়ে সীমিত এবং রূপের দিক দিয়ে বিরচনামূলক । লার্সন ও সেগাল জ্ঞানকে একটি প্রকল্পের আকারে প্রকাশ করেন যাকে বলা যায় T-প্রকল্প ঃ

> T-প্রকল্প ঃ কোন ভাষা L -এর জন্য বক্তার অর্থের জ্ঞান হলো অবরোহী সংশ্রয়ের জ্ঞান (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ও উৎপাদন নিয়মের সংশ্রয়) যা প্রমাণ করবে (T) রূপের উপপাদ্য, যে রূপ L -এর বাক্যসমূহের জন্য অর্থব্যাখ্যামূলক ।●

● T-hypothesis : A speaker's knowledge of meaning for a language L is knowledge of a deductive system (i. e. a system of axioma and production rules) proving theorems of the form (T) that are interpretive for sentences of L. Richard Larson and Gabriel Segal (1995), *Knowledge of Meaning: An Introduction to Semantic Theory.* p.33

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পটি আপাতদৃষ্টিতে একটু জটিল । বাচনিক যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । এ তত্ত্বের তিনটি অংশ রয়েছে ঃ

ক. প্রান্তিক গ্রন্থির স্বতঃসিদ্ধ
খ. অপ্রান্তিক গ্রন্থির স্বতঃসিদ্ধ
গ. উৎপাদন নিয়ম
১. সার্বজনীন দৃষ্টান্তীকরণ
২. সমরূপ আরোপন

প্রান্তিক গ্রন্থি ও অপ্রান্তিক গ্রন্থির ধারণাদুটি গঠনচিত্রের সাথে যুক্ত । আমরা *ব্যাপারটি এমন নয় যে ঝন্টু মন্টুকে চিনে* এই বাক্যটির বৃক্ষচিত্রের দিকে তাকাতে পারি ঃ

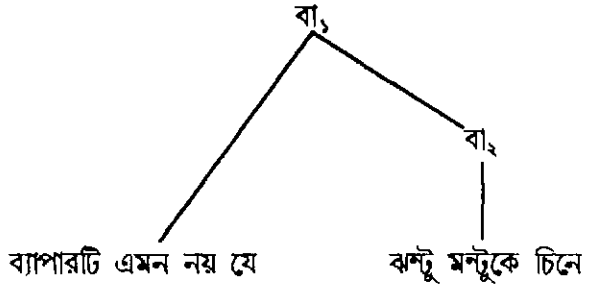

এখানে, বা = বাক্য

এখানে যে ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয় তা হলো বা$_২$ বা$_১$ -এর অন্তর্ভূক্ত । অর্থাৎ *ব্যাপারটি এমন নয় যে ঝন্টু মন্টুকে চিনে* এই বৃহত্তর বাক্যটি বিভাজিত করে প্রান্তিক পর্যায়ে ঝন্টু মন্টুকে চিনে এই সরল বাক্যটি পাওয়া গেছে । কাজেই এখানে বা$_২$ কে বলা হবে প্রান্তিক গ্রন্থি এবং বা$_১$ কে বলা হবে অপ্রান্তিক গ্রন্থি । এবার আমরা বাক্যের নিয়ম তৈরী করতে পারি ঃ

১. ক. বা → আবুল চিন্তা করে
খ. বা → বাবুল ঘুমায়
গ. বা → ঝন্টু মন্টুকে চিনে
২. ক. বা → বা এবং বা
খ. বা → বা অথবা বা
গ. বা → ব্যাপারটি এমন নয় যে বা

এবার বন্ধনী ব্যবহার করে বাক্যকে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজাতে পারি ঃ

৩. ক. (বা আবুল চিন্তা করে)
খ. (বা বাবুল ঘুমায়)
গ. (বা ঝন্টু মন্টুকে চিনে)
ঘ. (বা (বা আবুল চিন্তা করে) এবং (বা বাবুল ঘুমায়))

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. (বা (বা বাবুল ঘুমায়) এবং (বা ঝন্টু মন্টুকে চিনে))
চ. (বা (বা আবুল চিন্তা করে) অথবা (বা বাবুল ঘুমায়))
ছ. (বা (বা বাবুল ঘুমায়) অথবা (বা ঝন্টু মন্টুকে চিনে))
জ. (বা (বা আবুল চিন্তা করে) এবং (বা (বা বাবুল ঘুমায়) অথবা (বা ঝন্টু মন্টুকে চিনে)))
ঝ. (বা (বা ব্যাপারটি এমন নয় যে (বা ঝন্টু মন্টুকে চিনে))
ঞ. (বা (বা ব্যাপারটি এমন নয় যে (বা (বা আবুল চিন্তা করে) অথবা (বা বাবুল ঘুমায়)))

এ থেকে এটি প্রমানিত হয় যে, ১ এবং ২ -এর নিয়মগুলো উৎপাদনশীল ও পুনরাবৃত্তিমূলক । এবার সর্তশর্তমূলক নীতি আরোপ করে প্রান্তিক গ্রন্থির জন্য স্বতঃসিদ্ধ তৈরী করা যায় ঃ

৪. ক. বা$^{\alpha}$ সত্য যদিদি α সত্য হয় (α = যে কোন প্রান্তিক বাক্য)

উদাহরণযোগে বলা যায় –

খ *আবুল চিন্তা করে* সত্য যদিদি আবুল চিন্তা করে ।
খ. *বাবুল ঘুমায়* সত্য যদিদি বাবুল ঘুমায় ।
গ. *ঝন্টু মন্টুকে জানে* সত্য যদিদি ঝন্টু মন্টুকে জানে ।

একই অপ্রান্তিক গ্রন্থির জন্যও স্বতঃসিদ্ধ তৈরি করা যায় (বা, বা$_১$ এবং বা$_২$ -কে তিনটি কাব্য ধরে) ঃ

৫. ক. (বা বা$_১$ এবং বা$_২$) সত্য যদিদি বা$_১$ এবং বা$_২$ উভয়ই সত্য হয় ।
খ. (বা বা$_১$ অথবা বা$_২$) সত্য যদিদি বা$_১$ এবঙ বা$_২$ যে কোন একটি সত্য হয় ।
গ. (বা ব্যাপারটি এমন নয় যে বা$_১$) সত্য যদি ব্যাপারটি এমন নয় যে বা$_১$ সত্য হয় ।

এবার উৎপাদন নিয়ম প্রসঙ্গে আসা যাক । উৎপাদন নিয়মের সাহায্যে যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান ও প্রমান করা যায় । উৎপাদন নিয়ম দুটি । প্রথমটি হলো **সার্বজনীন দৃষ্টান্তীকরণ** । এটিকে এভাবে লেখা হয় ঃ

For any S, F(S)
F(α)

এটিকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এরকম ঃ

যে কোন বা এর জন্য, অ (বা)
অ (α) [●]

এই নিয়মের তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে সাধারণ নিয়মকে বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর প্রয়োগ করা যায় । যেমন ৪ এবং ৫ -এ যে নিয়মগুলো আছে এই নিয়মের ফলে আমরা তা যে কোন বাক্য বিশ্লেষণে প্রয়োগ করতে পারি ।

দ্বিতীয় উৎপাদন নিয়মটি হলো **সমরূপ আরোপন** । নিয়মটিকে এভাবে লেখা হয় ঃ

● F দিয়ে বোঝায় function; আমরা বাংলায় বলি অপেক্ষক – সংক্ষেপে অ ।

Dhaka University Institutional Repository

$F(\alpha)$
α iff β
$F(\beta)$

বাংলায় রূপান্তর করলে এটির খুব বেশি রদবদল হবে না (আমরা মনে করি সার্বজনীনভাবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে গ্রীক হরফ অপসারণ করা যুক্তিসঙ্গত বা নিরাপদ নয়) ঃ

অ (α)
α যদিদি β
অ (β)

এর অর্থ হলো যদি আমরা α সম্বলিত কোন বিবৃতি প্রমাণ করে থাকি এবং তারসাথে প্রমাণ করে থাকি যে α ও β সমতুল্য তাহলে আমরা α -কে β দিয়ে অপসারণ করতে পারবো ।

প্রান্তিক গ্রন্থির স্বতঃসিদ্ধ, অপ্রান্তিক গ্রন্থির স্বতঃসিদ্ধ এবং উৎপাদন নিয়ম এই তিনটি উপাদান মিলে তৈরী হয় অবরোহী সংশ্রয় । প্রান্তিক ও অপ্রান্তিক গ্রন্থির স্বতঃসিদ্ধকে বলা হয় অর্থব্যাখ্যামূলক নিয়ম । সার্বজনীন দৃষ্টান্তীকরণ এবং সমরূপ আরোপন এ দুটি উৎপাদন নিয়ম প্রয়োগ করে বাগর্থিক স্বতঃসিদ্ধ থেকে বাচনিক যুক্তিবিদ্যার যে কোন স-বাক্য (T-sentence) প্রমাণ করা যায় । একটি আহরণের দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটি পরীক্ষা করা যাক । আমরা প্রথমে একটি বাক্য নেই । বাক্যটি হতে পারে পূর্বোক্ত ৩চ (সংক্ষেপন হিসাবে আমরা সার্বজনীন দৃষ্টান্তীকরণ ও সমরূপ আরোপনের জন্য যথাক্রমে সাদৃ ও সআ ব্যবহার করবো) ঃ

১. (বা ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) অথবা ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়))
এবার আমরা ৫খ স্বতঃসিদ্ধের উপর সাদৃ আরোপ করলে পাবো –
২. (বা ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) অথবা ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়)) সত্য যদিদি হয় ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) সত্য অথবা ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়) সত্য
৩. ক. ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) সত্য যদিদি *আবুল চিন্তা করে* সত্য হয় (স্বতঃসিদ্ধ ৪ক ও সাদৃ প্রয়োগ করে)
খ. ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়) সত্য যদিদি *বাবুল ঘুমায়* সত্য হয় (স্বতঃসিদ্ধ ৪ক ও সাদৃ প্রয়োগ করে)
৪. ক. *আবুল চিন্তা করে* সত্য যদিদি আবুল চিন্তা করে (৪খ প্রয়োগ করে)
খ. *বাবুল ঘুমায়* সত্য যদিদি ঘুমায় (৪খ প্রয়োগ করে)
৫. ক. ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) সত্য যদিদি *আবুল চিন্তা করে* সত্য হয় (৩ক)
আবুল চিন্তা করে সত্য যদিদি আবুল চিন্তা করে (৪ক)
($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) সত্য যদিদি আবুল চিন্তা করে (৩ক, ৪ক, সআ দ্বারা)

একইভাবে

খ, ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়) সত্য যদিদি বাবুল ঘুমায় সত্য হয় (৩খ)
বাবুল ঘুমায় সত্য যদিদি বাবুল ঘুমায় (৪খ)
($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়) সত্য যদিদি বাবুল ঘুমায় (৩খ, ৪খ, সআ দ্বারা)

এবার ৫ ক ও খ -এর সিদ্ধান্ত লেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

৬. ক. ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) সত্য যদিদি আবুল চিন্তা করে
   খ. ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়) সত্য যদিদি বাবুল ঘুমায়
৭. (বা ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) অথবা ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়)) সত্য যদিদি হয় আবুল চিন্তা করে অথবা ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়) সত্য (২, ৬ক, সঅা দ্বারা)

একইভাবে ২, ৬খ ও সঅা দ্বারা ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়) কে *বাবুল ঘুমায়* -এ রূপান্তরিত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি–

৮. (বা ($_{বা}$ আবুল চিন্তা করে) অথবা ($_{বা}$ বাবুল ঘুমায়)) সত্য যদিদি আবুল চিন্তা করে অথবা বাবুল ঘুমায় ।

আহরণ প্রক্রিয়া যদি মনস্তাত্ত্বিকভাবে সঠিক হয় তাহলে বলা যায় মানুষ এই প্রক্রিয়ায় বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করে থাকে অথবা তার সত্যতা বিচার করে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যা

জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে মূলতঃ মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলশ্রুতিতে । অর্থের মানসিক রূপটি কি অর্থাৎ মানুষ কিভাবে অর্থ উপলব্ধি করে, অর্থ কিভাবে জ্ঞান বা ধারণাগত সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত মনোবিজ্ঞানীরা তার হদিস করেছেন । তাদের গবেষণার ফলাফল কেবল মনোবিজ্ঞানের জন্যই নয়, ভাষাবিজ্ঞানের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অর্থের মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনার অনুসন্ধান স্পষ্টতঃ *জ্ঞানাত্মক মনোবিজ্ঞানের* বিষয়, কিন্তু বাগর্থিক আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে এটি নিজ গুণে বাগর্থবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে । আমরা লক্ষ্য করবো মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা সূত্রপাত ঘটলেও জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যায় দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের অবদানও কম নয় । নীচে আমরা সংক্ষেপে জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় ও তত্ত্ব আলোচনা করবো ।

মানসচিত্র তত্ত্ব

মানসচিত্র তত্ত্ব অনুসারে কোন শব্দ উচ্চারণ করলে মনে যে ভাব বা চিত্র ফুটে ওঠে তা-ই হলো শব্দটির অর্থ । অর্থাৎ এ তত্ত্ব অনুসারে ঃ

অর্থ = মানসচিত্র

কেউ যদি *কুকুর* শব্দটি উচ্চারণ করে তাহলে মনে কুকুরের ছবি, *গরু* শব্দটি উচ্চারণ করলে গরুর ছবি, *বিড়াল* শব্দটি উচ্চারণ করলে বিড়ালের ছবি ভেসে উঠতে পারে । দার্শনিক জন লক সর্বপ্রথম এ তত্ত্বের কথা প্রচার করেন । তিনি বলেন যে ভাষার শব্দসমূহ কোন না কোন ভাবের সাথে যুক্ত এবং ঐ ভাবই হল শব্দের অর্থ । ভাষা ভাব আদানপ্রদানের মাধ্যম এবং সেই ভাব বাহিত হয় শব্দে বা বাক্যে । লকের কথার প্রতিধ্বনি করে সুজান ল্যাঙ্গার (১৯৫১ ঃ ৪৯) বলেন যে আমরা যখন বস্তু সম্পর্কে কথা বলি তখন মনের ভিতরে বস্তু থাকে না, থাকে বস্তুর ধারণা এবং অর্থ বলতে তাই বস্তুর ধারণা বুঝায়, সাক্ষাত বস্তু বুঝায় না । গ্লাক্সবার্গ ও জ্যাকস

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৭৫ ঃ ৫০) একই কথা বলেন, "কোন শব্দের সম্ভাব্য অর্থের সেট বলতে বোঝাবে সম্ভাব্য অনুভূতি, মানসচিত্র, ভাব, ধারণা, চিন্তা ও অনুমানের সেটকে যা কোন মানুষের মনে উদ্ভাসিত হয় যখন সে শব্দটি শ্রবন অথবা প্রক্রিয়াজাত করে।" ●

এ্যালস্টনের (১৯৬৪ ঃ ২৩-২৪) মতে, যোগাযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তত্ত্ব তিনটি বিষয়ের সাথে যুক্ত –
প্রথমত, কোন ভাব বক্তার মনে উপস্থিত থাকে।
দ্বিতীয়ত, বক্তা সেই ভাব ভাষায় প্রকাশ করেন।
তৃতীয়ত, অর্থোদ্ধার প্রক্রিয়ায় শ্রোতার মনে সেই ভাবের পুনরুদয় হয়।
সফল যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্ত প্রতিপালিত হয়। অন্যথায় যোগাযোগ ব্যার্থ হয়। যেমন অনেক ক্ষেত্রেই শ্রোতাকে এরকম কথা বলতে শোনা যায় – *তোমার কথাটি আমার কাছে স্পষ্ট নয়* কিংবা *ঠিক বুঝতে পারলাম না তুমি কি বলতে চাচ্ছো* ইত্যাদি। এর মানে হলো বক্তার মনের ভাব সফলভাবে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হয়নি।

এ তত্ত্বের একটি গুণ এই যে এর মাধ্যমে কল্পিত বস্তুর ব্যাখ্যা দেয়া যায় যা বাচ্যার্থমূলক তত্ত্বের মাধ্যমে দেয়া যায় না। যেমন ভূত, *পরী* বাস্তবে এদের অস্তিত্ব না থাকলেও আমরা বলতে পারি মানুষের মনে এদের ধারণা বা চিত্র থাকে যার ফলে আমরা সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি।

মানসচিত্র তত্ত্ব ভাষার অর্থকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই এ তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।
প্রথমত, এ তত্ত্ব অর্থ কি অনুভূতি, মানসচিত্র, ভাব, ধারণা, চিন্তা না অনুমান তা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। অর্থ একসাথে এগুলোর সবকিছু হতে পারে না, কারণ আমরা জানি এসব অভিন্ন সত্তা নয়।
দ্বিতীয়ত, এ তত্ত্ব অভিজ্ঞতামূলকভাবে যাচাইযোগ্য নয়। ধারণা, ভাব, মানসচিত্র এসব মানসিক অবস্থার কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নেই।
তৃতীয়ত, শব্দ উচ্চারণ করলে মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তাই শব্দটির অর্থ নয়। যেমন কেউ *বিড়াল* শব্দটি উচ্চারণ করলে আমাদের বাড়ীর কুচকুচে কালো হুলো বিড়ালটির ছবি আমার মনে ভেসে উঠতে পারে। তাহলে ঐ বিশেষ বিড়ালটির ছবি কি বিড়াল শব্দের অর্থ ?
চতুর্থত, মানসচিত্র যদি শব্দের অর্থ হয় তাহলে প্রশ্ন উঠবে মানসচিত্রের অর্থ কি ? তার ব্যাখ্যার অর্থ অন্য একটি মানসচিত্র দরকার হয়ে পড়বে, সেটি ব্যাখ্যার জন্য আবার আরেকটি। এভাবে অসীমভাবে চলতেই থাকবে। ফলে এ তত্ত্ব পৌনপুনিকতা দোষে দুষ্ট।
পঞ্চমত, *এবং, যদি, তবে, কিন্তু, অথবা* প্রভৃতি অব্যয়ের মানসচিত্র কি হবে তা বোঝা কঠিন। তাই এ তত্ত্ব সমস্ত শব্দের বেলায় প্রযোজ্য নয়।
ষষ্ঠত, এ তত্ত্ব শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় প্রযোজ্য হলেও বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যায় প্রযোজ্য নয়। বাক্য শব্দযোগে গঠিত হলেও বাক্যের অর্থ শব্দসমূহের অর্থের সমষ্টিমাত্র নয়। এজন্য শব্দের সাথে যুক্ত টুকরো টুকরো মানসচিত্র জোড়া দিয়ে কেউ যদি মানসচিত্র অনুক্রমের সাহায্যে বাক্যার্থ ব্যাখ্যা করতে চায় তবে তা হবে ভ্রমাত্মক।

● "The set of possible meanings of any given word is the set of possible feelings, images, ideas, concepts, thoughts, and inferences that a person might produce when that word is heard or processed." Glucksberg and Danks (1975), *Experimental Psycholinguistics*, p. 50.

Dhaka University Institutional Repository

মানসচিত্রের মাধ্যমে নীচের স্তবকের শব্দ ও বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় কি কিংবা ব্যাখ্যা করলে তা সবার কাছে একইরকম হবে কি ?●

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায় ।
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায় ।

কাজেই বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বলা যায় মানসচিত্র তত্ত্ব বাগর্থিক তত্ত্ব হিসাবে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় । দার্শনিক কোয়াইন (১৯৬১ ঃ ৪৮) খুব কড়া ভাষায় বলেন, "The idea of an idea, the idea of the mental counterpart of a linguistic form, is worth than worthless."

আদর্শরূপ তত্ত্ব

মনোবিজ্ঞানী রশ (১৯৭৫), রিপ্স (১৯৭৫) স্মিথ (১৯৭৭), প্রমুখ এ তত্ত্ব প্রচার করেন । এটি বাচ্যার্থমূলক তত্ত্বের পরিপূরক । এ তত্ত্ব অনুসারে কোন শ্রেণীবাচক শব্দের বাচ্যার্থ সুনির্দিষ্ট নয় । যেমন *পাখি* বললে উড়তে সক্ষম এমন প্রাণীকে হয়তো বুঝাবে, কিন্তু এমন পাখিও থাকতে পারে (যেমন উটপাখি) যা উড়তে পারে না এবং এমন অনেক প্রাণী আছে যেমন তেলাপোকা, ফড়িং উড়তে পারা সত্ত্বে যাদের কেউ পাখি বলবে না । তাহলে মানুষ বিশেষ শ্রেণীর বস্তু সনাক্ত করে কিভাবে ? এর উত্তরে আদর্শরূপ তত্ত্ব বলে, মানুষের মনে প্রতিটি শ্রেণীর একটি আদর্শ নমুনা থাকে যার সাথে তুলনা করে সে বিশেষ বস্তুকে বিশেষ শ্রেণীর বলে সনাক্ত করতে পারে । এই দৃষ্টান্তস্থানীয় নমুনাকে বলা হয় **আদর্শরূপ** । এই আদর্শরূপের সাথে তুলনা করে বলা যায় কোন বিশেষ প্রাণী বিশেষ শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কতটুকু দাবিদার । মানুষ আদর্শরূপের সাথে কতগুলো বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে । এই বৈশিষ্ট্য গুচ্ছকে পারিভাষিভাবে বলে বৈশিষ্ট্যরূপ (Hurford & Heasley 1983: 98) । বৈশিষ্ট্যরূপই সাধারণভাবে শ্রেণীকরণের মাপকাঠি । এটি হলো নিক্তিস্বরূপ যার ভিত্তিতে কোন বস্তু বা প্রাণীর জাতপাত নির্ধারিত হয় । বৈশিষ্ট্যরূপের নিরিখে হিসাব করে বলে দেয়া হয় কোন্‌টি কতটুকু দৃষ্টান্তস্থানীয় বা অদৃষ্টান্তস্থানীয় । যেমন আমরা পাখির বৈশিষ্ট্যরূপ হিসাবে বলতে পারি ঃ

(১) এটির ডানা আছে বা উড়তে পারে ;
(২) এটি দ্বিপদ ;
(৩) এটি স্তন্যপান করে না ;
(৪) এর আবাস জলের তলে নয় ।

● আমরা এখানে কবিতার চিত্রকল্পের কথা বলছি না যা এক ধরনের দ্যোতনা । আমরা বলছি জ্ঞানাত্মক অর্থের কথা ।

Dhaka University Institutional Repository

এই বৈশিষ্ট্যরূপের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি দোয়েল, টিয়া, ফিঙ্গে, চড়ুই, বক এসব পাখি, কারণ এগুলো আমাদের বৈশিষ্ট্যরূপের চারটি শর্তই পূরণ করে। এখন উটপাখির কথা ধরা যাক। এটি আমাদের ২, ৩ ও ৪ নং শর্ত ভালোভাবে পূরণ করলেও ১নং শর্ত আংশিকভাবে পূরণ করে, কারণ এটি উড়তে পারে না। ফলে এটি দৃষ্টান্তস্থানীয় পাখি নয়, দৃষ্টান্তস্থানীয় পাখি থেকে একটু দূরে। আবার উড়তে পারলেও তেলাপোকা, মশা, মাছি, প্রজাপতি আমাদের ২নং শর্ত লঙ্ঘন করে। ফলে এসব পাখি শ্রেণী থেকে বাদ পড়বে। আবার ১, ২ ও ৪ নং শর্ত মানলেও ৩নং শর্ত লঙ্ঘন করে বলে বিজ্ঞানীরা বাদুড়কে পাখি বলেন না (যদিও অনেক সাধারণ মানুষের কাছেই এটি পাখি)। আবার ১ ও ৩ নং শর্ত পূরণ করলেও ৪ নং শর্ত লঙ্ঘনের দায়ে সমুদ্রের উড়ুক্কু মাছ পাখি বলে গণ্য হবে না। কাজেই দেখা যায় আদর্শরূপ ও বৈশিষ্ট্যরূপ মানুষের জাগতিক বোধ ও জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ আদর্শরূপ ও বৈশিষ্ট্যরূপকে কাজে লাগিয়েই বলতে পারে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য কতটুকু দৃষ্টান্তস্থানীয়। এ সম্পর্কিত নিয়মটি হলো ঃ *কোন শ্রেণীর একটি সদস্য যতো বেশি দৃষ্টান্তস্থানীয় সেটি ততো বেশি আদর্শরূপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।*[●]

রশ আসবাবপত্র, ফল, পাখি ও পরিধেয় এসবের আদর্শরূপ নিয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন এবং দৃষ্টান্তস্থানীয়তার একটি ক্রম তৈরী করেন। ক্লার্ক ও ক্লার্কের বই থেকে আমরা সেই ক্রমের তালিকাটি তুলে ধরছি যেখানে প্রতিটি শ্রেণীর আটটি করে দ্রব্যের নাম উপর থেকে নীচে অধিক-কম দৃষ্টান্তস্থানীয়তার মাত্রায় সাজানো আছে ঃ

আসবাবপত্র	*ফল*	*পাখি*	*পরিধেয়*
চেয়ার	আপেল	রবিন	প্যান্ট
ড্রেসার	আলুবোখারা	সোয়ালো	কোট
ডেস্কনপোর্ট	চেরি	ঈগল	পাজামা
টুল	তরমুজ	কাক	চপ্পল
ল্যাম্প	ফিগ	ফিজ্যান্ট	বুট
আলমারি	প্রুন	রাজহাঁস	টুপি
রেডিও	নারকেল	মুরগি	পার্স
ছাইদানি	জলপাই	পেঙ্গুইন	ব্রেসলেট

(Clark & Clark 1977: 464)

আমাদের দেশে আদর্শরূপ নিয়ে কোন সমীক্ষা এখনো হয়নি। হলে জানা যেতো আমাদের ভূখন্ডে আমাদের পরিবেশে দৃষ্টান্তস্থানীয়তার ক্রমটি কিরকম।

দৃষ্টান্তস্থানীয়তার মাত্রাকে বৃত্তচিত্রে প্রদর্শন করা যায় যেখানে কেন্দ্রীয় বৃত্তে অবস্থিত থাকবে আদর্শরূপ এবং কোন সদস্য যতোবেশি অদৃষ্টান্তস্থানীয় হবে তা ততোবেশি দূরবর্তী বৃত্তে অবস্থান নেবে। এইচিনসন (১৯৮৭ ঃ ৫৪) বিভিন্ন ধরনের পাখিকে এরকম একটি বৃত্তচিত্রে প্রদর্শন করেন ঃ

● "The more typical the member the more similar it is to the prototype of the category." Robert H. Clark & Eve V. Clark (1977), *Psychology and Language*, p. 465.

Dhaka University Institutional Repository

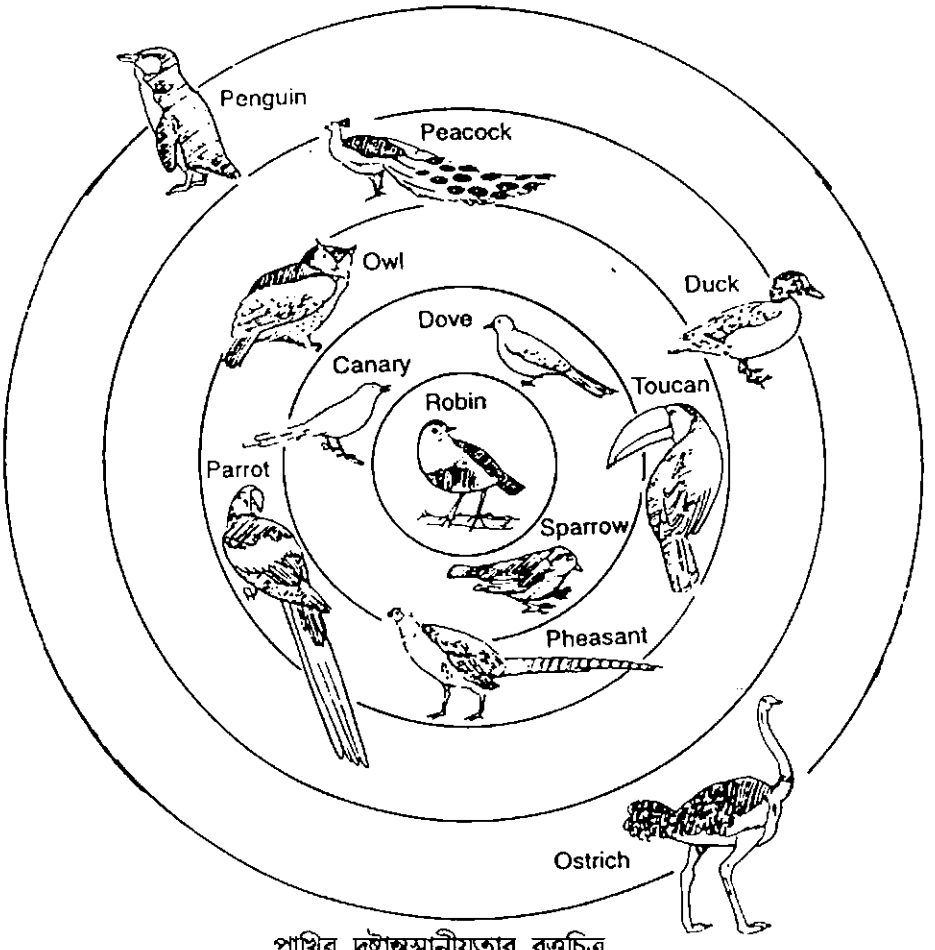

পাখির দৃষ্টান্তস্থানীয়তার বৃত্তচিত্র

প্রতিটি মানুষের মনে এভাবে শ্রেণী সম্পর্কে একটি ধারণা থাকে এবং ব্যক্তিভেদে আদর্শরূপ ও বৈশিষ্ট্যরূপে পার্থক্য দেখা দেয় । যেমন আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে দৃষ্টান্তস্থানীয় পাখি যেরকম অন্যের দৃষ্টিতে সেরকম না-ও হতে পারে । আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে দৃষ্টান্তস্থানীয় পাখি হতে পারে বাবুই, আরেকজনের কাছে তা হতে পারে ময়না কিংবা চিল । কারণ প্রতিটি লোক আদর্শরূপের জন্য তাদের নিজের মতো করে বৈশিষ্ট্যরূপ নির্ধারণ করতে পারেন । যেমন শুধু আকার আকৃতির বিচারে নীচের পাখি গুলোর মধ্যে কোনটি কতটুকু দৃষ্টান্তস্থানীয় তা নির্ধারণ করতে বললে একেকজন একেক ভাবে করবেন (দুজনের বিচার যে একইরকম হতে পারে আমরা সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছিনা । সেক্ষেত্রে উভয়ের আদর্শরূপ ও দৃষ্টান্তরূপ সমাপতিত হয়) ঃ

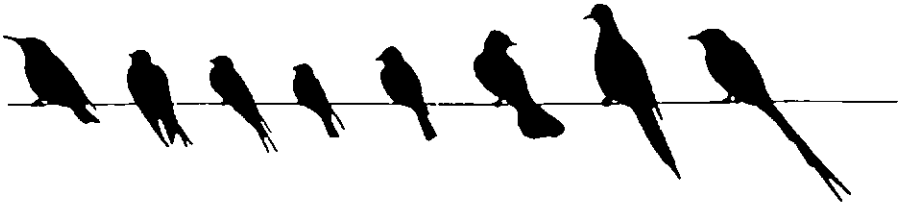

কোন্ পাখিটি সবচেয়ে দৃষ্টান্তস্থানীয় ?

Dhaka University Institutional Repository

হ্যাচ ও ব্রাউন (১৯৯৫ ঃ ৫২) আদর্শরূপ সম্পর্কে চারটি দাবি প্রাসঙ্গিক মনে করেন। এগুলো হলো ঃ

১. অদৃষ্টান্তস্থানীয় সদস্যের তুলনায় দৃষ্টান্তস্থানীয় সদস্যদের অধিকতর সহজে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়।
২. শিশুরা দৃষ্টান্তস্থানীয় সদস্যদের প্রথমে জানে।
৩. কাউকে কোন শ্রেণীসদস্যের নাম উল্লেখ করতে বললে সে প্রথমে আদর্শরূপের কথা বলে।
৪. আদর্শরূপ জ্ঞানাত্মক নির্দেশন বিন্দুরূপে কাজ করে, অর্থাৎ এর নিরিখে মানুষ ধারণাগত অঞ্চলে বিশেষ ব্যক্তি বা প্রাণীর অবস্থান নির্ণয় করে। আদর্শরূপের একটি স্তরক্রমিক মাত্রা রয়েছে। যেমন ফলের আদর্শরূপ হতে পারে আম, আমের আদর্শরূপ হতে পারে ফজলি, আবার ফজলির আদর্শরূপ হতে পারে রাজশাহীর ফজলি। সম্পর্কটি এভাবে দেখানো যায় ঃ

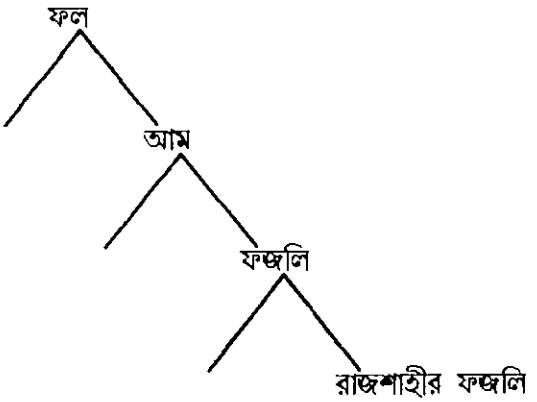

স্তরক্রমকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় ঃ ঊর্ধ্বস্তর, মৌলিক স্তর এবং অধঃমৌলিকস্তর। যেমন হাঁটাকে মৌলিক স্থানে রেখে আমরা নড়াচড়া সংক্রান্ত শব্দকে তিনটি স্তরে সাজাতে পারি ঃ

ঊর্ধ্বস্তর ঃ নড়া
মৌলিক স্তর ঃ হাঁটা, দৌড়ানো লাফানো, পাক খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া।
অধঃমৌলিকস্তর ঃ আস্তে হাঁটা, হনহন করে হাঁটা, উদ্দেশ্যহীনাভাকে হাঁটা, খুড়িয়ে হাঁটা, বুকটান করে হাঁটা, বিড়ালের মতো হাঁটা।

স্টেজের উপর কোন মডেলকে ক্যাটওয়াক করতে দেখে কেউ বলতে পারে -- লোকটি নড়ছে অথবা লোকটি হাঁটছে অথবা লোকটি বিড়ালের মতো হাঁটছে। যতোই উপর দিকে যাওয়া যায়, বর্ণনা ততোই সুনির্দিষ্ট হয়। অনেক ভাষাবিজ্ঞানী দাবি করেন যে শিশুরা মৌলিক বা উর্ধ্ব স্তরের শব্দ প্রথমে আয়ত্ত করে। কিন্তু শিশুরা অধঃমৌলিকস্তরের শব্দ প্রথমে শিখে এর স্বপক্ষেও প্রমানের অভাব নেই (Hatch & Brown 1995: 55)।

এটি অনেক সময় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে যে একটি সদস্য কোন্ শ্রেণীতে পড়বে। যেমন কাকে আমরা *ঘটি* বলবো ? সেটি কি গোল না লম্বাটে হবে, হাতা থাকবে না থাকবে না, মাটি নির্মিত হবে না ধাতু নির্মিত হবে, আয়তনে কতটুকু বড় বা ছোট হবে, সেটিতে কি পানি না অন্য কিছু রাখা যাবে ? আবার এর সাথে লোটা, জগ ও মটকির পার্থক্য কি হবে ? এগুলো ঠিক অংকের হিসাবে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। কাজেই আমাদের মানতে হবে *ঘটি* শব্দটি অস্পষ্ট। কোন কোন গবেষক দাবি করেন যে প্রাকৃতিক ভাষার সব শব্দের অর্থই কম বেশি অস্পষ্ট। অর্থের এই অস্পষ্টতাকেই অনেকে বলেন **ঝাপসাভাব** (Hatch & Brown

Dhaka University Institutional Repository

1995: 58; Hofman 1993: 297; Leech 1981: 119) । আদর্শরূপের দিকে তাকালেও আমরা এই ঝাপসাভাব দেখতে পাবো । খচ্চর কি গাধা না ঘোড়া তা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক চলতে পারে । গদ্য ও পদ্যের সীমানা রেখাটি কোথায় তা নির্ধারণ করা যে কতো দুঃসাধ্য তা সাহিত্যিক মাত্রই জানেন । দুটি শ্রেণীর সীমান্তবর্তী অঞ্চল সব সময়ই ঝাপসা । এজন্য আমাদের আদর্শরূপ থেকে একটু ভিন্ন অথবা দুটি আদর্শরূপের মাঝামাঝি কোন নমুনা দেখলে আমরা তার শ্রেণীকরণে বিরাট সমস্যায় পড়ি । আমরা নীচের ছবির দিকে লক্ষ্য করি ঃ

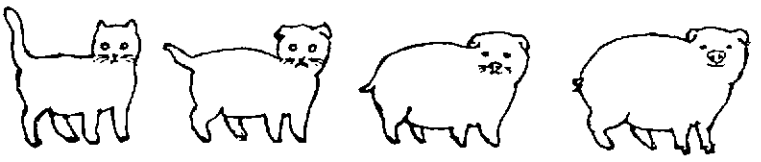

এখনকার চতুর্থ চিত্রটির মতো কোন প্রাণী দেখিয়ে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এটি বিড়াল না কুকুর না ভেড়া তবে সত্যিই সে মুশকিলে পড়বে । কাজেই আমরা দেখছি বিড়াল, কুকুর, ভেড়া ইত্যাদি **ঝাপসা শ্রেণী** এবং তাদের অর্থও **ঝাপসা অর্থ** । খুঁটিয়ে বিবেচনা করলে শেষ পর্যন্ত এটাই প্রমানিত হবে যে অর্থ ঝাপসা । এবং আদর্শরূপ তত্ত্বও এভাবে স্পষ্ট থেকে ঝাপসা হয়ে আসে এবং তার মহিমা হারায় ।

আমরা দেখলাম যে এ তত্ত্ব মানুষের সাংসারিক জ্ঞানের সাথে যুক্ত এবং এটি শিশুর ভাষা শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে । তবে এটি ভাষার অর্থ ব্যাখ্যার ব্যাপকভিত্তিক কোন তত্ত্ব নয় । ফলে এর গ্রহণযোগ্যতাও সীমিত ।

বাগর্থিক অন্তরক

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী অসগুড এবং তার সহযোগী সুকি ও টানেনবৌম পঞ্চাশের দশকে আনুভূতিক অর্থ পরিমাপ করার জন্য বাগর্থিক অন্তরক নামে একটি পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করেন । তারা তাদের বিষয়ব্যক্তিদের বিভিন্ন শব্দ দেন এবং সেই শব্দগুলোকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুযুক্ত মাপনরেখায় স্থাপন করতে বলেন । মাপনরেখায় ধনাত্মক মেরুতে ছিল সদর্থক গুণ । যেমন ভাল, সুখী, দ্রুত, শক্ত, মিষ্টি ইত্যাদি এবং ঋণাত্মক মেরুতে ছিল নঞর্থক গুণ, যেমন মন্দ, দুঃখী, ধীর, নরম, তিক্ত ইত্যাদি ।

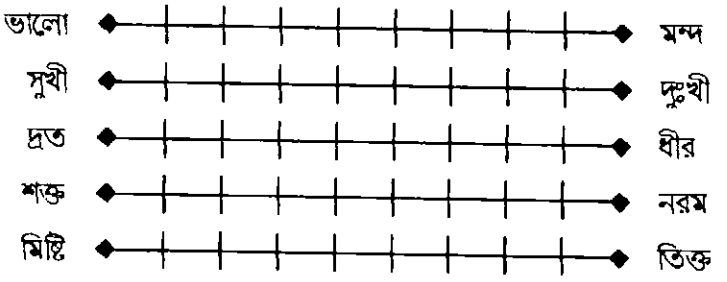

মাপনরেখা

Dhaka University Institutional Repository

এটি খুব স্বাভাবিক যে *চিনি* -র অবস্থান হবে মিষ্টি-তিক্ত রেখার বাম মেরুতে এবং *আপেল* -এর অবস্থান হবে মাঝামাঝি কোথাও এবং *ঔষধ* র অবস্থান হবে ডান মেরুতে । এভাবে *মা* -এর অবস্থান হতে পারে উল্লিখিত প্রথম রেখার বামে, দ্বিতীয় রেখার বামে, তৃতীয় রোখার মাঝামাঝি, চতুর্থ রেখার ডানে এবং পঞ্চম রেখার বামে । বিষয়ব্যক্তি যখন কোন শব্দ মাপনরেখায় স্থাপন করে তখন সে শব্দটির প্রতি তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে । এই প্রতিক্রিয়া থেকেই পরিমাপ করা হয় শব্দের আনুভূতিক মূল্য । অসগুড ও অন্যান্য (১৯৫৭) তাদের বিশটি মাপনরেখাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন এবং রেটিং অনুসারে শব্দের আনুভূতিক মূল্যের হিসাব করেন । তাদের তিনটি শ্রেণী ছিল নিম্নরূপ ঃ

মূল্যায়ন (যেমন ঃ সুন্দর – কুৎসিত)
শক্তিমত্তা (যেমন ঃ সাহসী – ভীরু)
কার্যকলাপ (যেমন ঃ সক্রিয় – নিষ্ক্রিয়)

মূল্যায়ন, শক্তিমত্তা ও কার্যকলাপকে তারা ফ্যাক্টর বা উৎপাদক হিসাবে গণ্য করেন এবং দেখান যে কোন শব্দেরই আনুভূমিক মূল্য অন্য একটি শব্দের সমান নয় ।

বাগর্থিক অন্তরক এভাবেই পরিসংখ্যানমূলক প্রক্রিয়ায় মানুষের আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে শব্দের আনুভূতিক অর্থ নির্ণয় করে । একই প্রক্রিয়ায় বাক্যের আনুভূতিক অর্থও পরিমাপ করা সম্ভব । হফম্যান (১৯৯৩ ঃ ৩০২) বলেন, "শব্দ উপদানের আনুভূতিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে বাক্যের আনুভূতিক মূল্য অনুমানের জন্য একটি সংশ্রয় নির্মান করা সম্ভব ।"[১]

কিন্তু এই তত্ত্বের সম্ভাবনার চেয়ে সীমাবদ্ধতাই অধিকাংশ সমালোচকের দৃষ্টি কেড়েছে । ক্যারল, ভাইনরাইখ প্রমূখ দেখিয়েছেন যে এই তত্ত্ব দ্যোতনার বাইরে জ্ঞানাত্মক বা ধারণাগত অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারে না । লুরিয়া (১৯৮২ ঃ ৭৩) বলেন, "ব্যক্তিনিষ্ঠ বিবেচনার উপর প্রভূত নির্ভরশীল বলে এবং অসগুড কর্তৃক বিকশিত বাগর্থিক অন্তরক শব্দের আনুভূতিক অর্থের সাথে জড়িত বলে এই পদ্ধতির গুরুত্ব সীমাবদ্ধ ।"[২] ক্লার্ক ও ক্লার্ক (১৯৭৭ ঃ ৪৩৩) এর সমালোচনা করে বলেন, "যদিও দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেগগত প্রতিক্রিয়ার পঠনে বাগর্থিক অন্তরক কাজে লেগেছে, তথাপি শব্দার্থের অনুধাবন, উৎপাদন ও আত্তীকরণ কিভাবে ঘটে তার ব্যাখ্যায় এটির সফলতা নগণ্য ।"[৩]

---

[১] "It ought to be possible, however, to construct a system for predicting the affective value of a sentence based on the affective value of its component words." Th. R. Hofmann, (1993). *Realms of Meaning: An Introduction to Semantics*. p. 302.

[২] "The importance of this method is also limited by its heavy reliance on subjective judgement and by the fact that the semantic differential developed by Osgood is concerned with the affective meaning of the word." Alexander R. Luria (1982), *Language and Cognition*, p. 73.

[৩] "Although the semantic differential has been useful in studying attitudes and emotional reactions, it has had little success in explaining how word sense is involved in comprehension production and acquisition." Robert H. Clark & Eve V. Clark (1977) *Psychology and Language*, p. 433.

Dhaka University Institutional Repository

বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া

মনোবিজ্ঞানী মিলার এবং জনসন-লেয়ার্ড (১৯৭৬) এই তত্ত্বের প্রধান প্রচারক। এই তত্ত্ব অনুসারে কোন শব্দের অর্থ হলো একটি কর্মপ্রক্রিয়া – এক গুচ্ছ মানসিক কাজ যার মাধ্যমে কোন শব্দ তার নির্দেশিত বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয়। এই তত্ত্ব কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ঔপাদানিক বিশ্লেষণকে কাজে লাগায়। যেমন, *পুরুষ* শব্দের অর্থকে উপাদানে বিশ্লেষণ করলে পাই ঃ ছেলে + প্রাপ্তবয়স্ক + মানব। এই তিনটি উপাদান কিভাবে কর্ম প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় তা বোঝার জন্য নীচের সারণীর দিকে তাকাই ঃ

পদক্ষেপ ১	ক কি মানব ? যদি হ্যাঁ হয় তবে ২ -এ যাও যদি না হয় তবে ৫ -এ যাও
পদক্ষেপ ২	ক কি প্রাপ্তবয়স্ক ? যদি হ্যাঁ হয় তবে ৩ -এ যাও যদি না হয় তবে ৫ -এ যাও
পদক্ষেপ ৩	ক কি ছেলে ? যদি হ্যাঁ হয় তবে ৪ -এ যাও যদি না হয় তবে ৫ -এ যাও
পদক্ষেপ ৪	যদি কর্মপ্রক্রিয়া সফল হয় তবে ক একজন পুরুষ
পদক্ষেপ ৫	যদি কর্মপ্রক্রিয়া ব্যর্থ হয় তবে ক একজন পুরুষ নয়

এখানে দেখা যায় পুরো কর্মপ্রক্রিয়াটি কম্পিউটার প্রগ্রামের মতো ধাপে ধাপে সাজানো। *পুরুষ (ক)* অর্থাৎ ক পুরুষ কিনা এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে মোট পাঁচটি পদক্ষেপ লেগেছে। প্রথম তিনটি পদক্ষেপে পুরুষ -এর তিনটি বাগর্থিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপ্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এবং শেষের দুটি পদক্ষেপে ইতিবাচক বা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পুরো কর্মপ্রক্রিয়াটি মানসিক। বাস্তবের যে কোন বস্তুর সনাক্তকরণে বা শ্রেণীকরণে মানুষ এই কর্মপ্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ক্লার্ক ও ক্লার্ক (১৯৭৭ ঃ ৪৪২) বলেন, "প্রতিটি কর্ম প্রক্রিয়া একটি বাস্তব মানসিক কার্য যা অনুধাবন, অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ইচ্ছাপ্রকাশের মাধ্যমে মৌলিক মানসিক কার্যসমূহের সাথে যুক্ত হয়।"[৩] এই কর্মপ্রক্রিয়া তাই মানুষের সংবেদন বা ধারণাগত সংশ্রয়ের অংশ যার মাধ্যমে সে জাগতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে। ক্লার্ক ও ক্লার্কের মতে কর্মপ্রক্রিয়ামূলক তত্ত্ব তিনটি দাবি সামনে উপস্থিত করে।

প্রথমত, একটি ভাষায় যে সমস্ত শ্রেণীর নামকরণ করা হয় সেগুলো নির্ভর করে সেই ভাষার ব্যবহারকারীরা জগতকে কিভাবে দেখে তার উপর।

---

[৩] "Each procedure is an actual mental operation that links up directly with the primitive mental operations used in perceiving, attending, deciding and intending." Robert H. Clark & Eve V. Clark (1977) *Psychology and Language*, p. 442.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, শিশুর শব্দব্যবহারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা নির্ভর করে ইতোমধ্যে সে শব্দের সাথে কিরূপ ধারণাগত উপাদান যুক্ত করতে পেরেছে তার উপর ।

তৃতীয়ত, যে বাগর্থিক উপাদান কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো সকল ভাষায় উপস্থিত ।

এই দাবিসমূহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তিপ্রমান উপস্থাপিত হয়েছে । অনেক সমালোচকই কর্মপ্রক্রিয়ামূলক বাগর্থবিদ্যা সম্পর্কে সন্দিহান । তারা এর চারটি সীমাবদ্ধতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ।

প্রথমত, এটি প্রসঙ্গমূলক ভেদরূপ ব্যাখ্যায় অতটা কার্যকর নয় । যেমন বিশেষ পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গে একজন পুরুষ চিহ্নিত হতে পারে পেশীশক্তিসম্পন্ন বা দুর্বল, দীর্ঘকায় বা বেটে, লম্বাচুলো বা খাটোচুলো, তেজী বা ভীরু, পরিশ্রমী বা আলসে ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যে । কিন্তু বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া *মানুষ (ক)* এর মধ্যে এসব বিষয় কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করবে তার কোন নির্দেশনা নেই ।

দ্বিতীয়ত, এটি সাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিপন্থী অর্জিত জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না । যেমন পারদ ধাতব পদার্থ, তিমি স্তন্যপায়ী বলে মাছ নয়, বাদুর পাখি নয়, প্রভাত তাঁরা ও সন্ধ্যা তাঁরা একই গ্রহ – বৈজ্ঞানিকভাবেপ্রাপ্ত এ সমস্ত জ্ঞানের সাথে বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । কারণ এরূপ বিশেষ জ্ঞান আমাদের আটপৌরে অভিজ্ঞতার বিরোধী বলে এদের বাগর্থিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করা কঠিন ।

তৃতীয়ত, এটি দিয়ে প্রাত্যহিক কথোপকথন ব্যাখ্যা করা যায় না । শিশুর জ্ঞানে *বাঘা* বিড়াল হতে পারে অথবা *বিড়াল* বাঘা হতে পারে কারণ বড়রা হয়তো শিশুকে তাই শিখিয়েছে । একজন পদার্থবিজ্ঞানী সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনায় বলতে পারেন যে আলো সরলরেখায় চলে, যদিও তিনি জানেন আলোকরশ্মি প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণের টানে বেঁকে যেতে পারে । কারো মধ্যে পাগলামির লক্ষণ ধরা পড়লে লোকজনকে বলতে শোনা যায় *তার মাথার তার ছিঁড়ে গেছে* যদিও মাথায় তার আছে বলে কেউ বিশ্বাস করেন না । বক্তা ও শ্রোতার কথাবার্তায় তথ্যের এই বিচ্যুতি বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া অনুমোদন করে না ।

চতুর্থত, বাগর্থিক প্রক্রিয়া শ্রেণীসমূহের ঝাপসা সীমান্তরেখায় অকার্যকর । যেমন, *শশাকে* আমরা কখনো সব্জি কখনো ফল বলে গন্য করি, *হিজরা* না মেয়ে না ছেলে তবে উভয়লিঙ্গ নয়, একজন ষোড়শী যুবতীও হতে পারে কিশোরীও হতে পারে । বাগর্থিক প্রক্রিয়ায় দেখাতে হবে যে এগুলো দুটি শ্রেণীর মাঝামাঝি । কিন্তু আদতে তা কিভাবে দেখানো হবে তা স্পষ্ট নয় ।

কাজেই দেখা যায় বাগর্থিক প্রক্রিয়া অর্থসংশ্লিষ্ট অনেক জাগতিক ঘটনাই ব্যাখ্যা করতে পারে না । তত্ত্ব হিসাবে এটি অনেক অশিথিল । তারপরও আমরা বলতে পারি যে অর্থের বৃত্তিমূলক অভিক্ষেপে বাগর্থিক প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ।

পান্ডুলিপি তত্ত্ব

মনোবিজ্ঞানী শ্যাঙ্ক (১৯৮৪) এবং এ্যান্ডারসন (১৯৮৩) ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় পান্ডুলিপি তত্ত্ব প্রচার করেন । এ তত্ত্বকে **ধারণাগত নির্ভরশীলতা তত্ত্ব**ও বলা হয় । এ তত্ত্ব অনুসারে পান্ডুলিপি হলো ঘটনার সাধারণ *টেমপ্লেট* যাতে ধারণাসমূহ অবস্থিত থাকে, যে ধারণাসমূহ ঘটনা সংঘটনের সময় পান্ডুলিপির সাথে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে । আমরা অনেক রকম পান্ডুলিপির কথা চিন্তা করতে পারি, যেমন *শ্রেণীকক্ষ পান্ডুলিপি, আদালতকক্ষ পান্ডুলিপি,*

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতাল পান্ডুলিপি, কাঁচাবাজার পান্ডুলিপি, অফিসকক্ষ পান্ডুলিপি, চা-চক্র পান্ডুলিপি ইত্যাদি । প্রতিটি পান্ডুলিপিতেই থাকে কিছু ভূমিকা । যেমন, শ্রেণীকক্ষ পান্ডুলিপিতে থাকে শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষকসহকারী, ইত্যাদি ভূমিকা, আদালতকক্ষ পান্ডুলিপিতে থাকে বিচারক, বাদী, বিবাদী ইত্যাদি ভূমিকা, হাসপাতাল পান্ডুলিপিতে থাকে ডাক্তার, রোগী, নার্স ইত্যাদি ভূমিকা । এই ভূমিকাগুলো প্রাথমিকভাবে ধারণা, এবং কোন ভাষায় প্রাপ্ত শব্দ এই ধারণাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে । ভূমিকা এবং শব্দের এই সম্পর্ক ISA সংকেত দ্বারা প্রকাশিত হয় । যেমন ঃ

শব্দ	সংযোগ	ধারণা
শিক্ষক	ISA	শিক্ষক
ছাত্র	ISA	ছাত্র
ডাক্তার	ISA	ডাক্তার
রোগী	ISA	রোগী

এভাবে যদি লেখা হয় ঃ *রাজীব ISA শিক্ষক* তাহলে বুঝতে হবে এর অর্থ হলো রাজীব একজন শিক্ষক ; যদি লেখা হয় *কামাল ISA বিচারক*, তাহলে বুঝতে হবে এর অর্থ হলো কামাল একজন বিচারক । এখানে শিক্ষক, বিচারক এগুলো হলো ধারণা এবং রাজীব, কামাল এরা হলো সেই ধারণার দৃষ্টান্ত । কোন কোন পেশায় বিশেষ পোষাকের প্রয়োজন হয় । তখন ভূমিকা ও পোষাককে HASA সংকেত দিয়ে সংযুক্ত করা হয় । যেমন ঃ

বিচারক	HASA	রোব
নার্স	HASA	ইউনিফর্ম
নৃত্যশিল্পী	HASA	ঘাঘরা
বর	HASA	পাগড়ি

বিশেষ ভূমিকার সাথে বিশেষ বস্তু বা যন্ত্রের যোগ থাকতে পারে । এগুলোকে বলা হয় PROPS । ভূমিকা ও PROPS -এর সম্পর্কও HASA সংকেত দিয়ে প্রকাশিত হয় । যেমন ঃ

শিক্ষক	HASA	ব্ল্যাকবোর্ড
ডাক্তার	HASA	স্টেথিস্কোপ
অফিসার	HASA	ডেস্ক
কসাই	HASA	ছুঁড়ি

এতে অবশ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সাধারন মানুষ *কসাই* নাম শুনলেই কেন শিউরে ওঠে এবং নির্দয় লোককে কেন কসাইয়ের সাথে তুলণা করা হয় । পান্ডুলিপির ভিতরে কার্যাবলী সময়ানুক্রমে সম্পন্ন হয় । এ কার্যাবলীই টেমপ্লেটকে সচল করে তোলে এবং তাকে একটা বাস্তব ভিত্তি দান করে । যে কোন কার্যের বর্ণনার জন্য ভাষা থেকে শব্দ বাছাই করতে হয় যাকে বলা হয় *পরিশৃঙ্খলা* । পরিশৃঙ্খলায় দেখানো হয় কোন ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি শব্দ কিভাবে ঐ ধারণার সাথে সংশিষ্ট অন্যান্য শব্দের সাথে সম্পর্কিত । এখানে ক্ষেত্র তত্ত্বের ধারণাটি কাজে লাগে । আমরা *সঞ্চালন* ক্রিয়াপদটির ধারণাগত ক্ষেত্রের দিকে তাকাতে পারি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

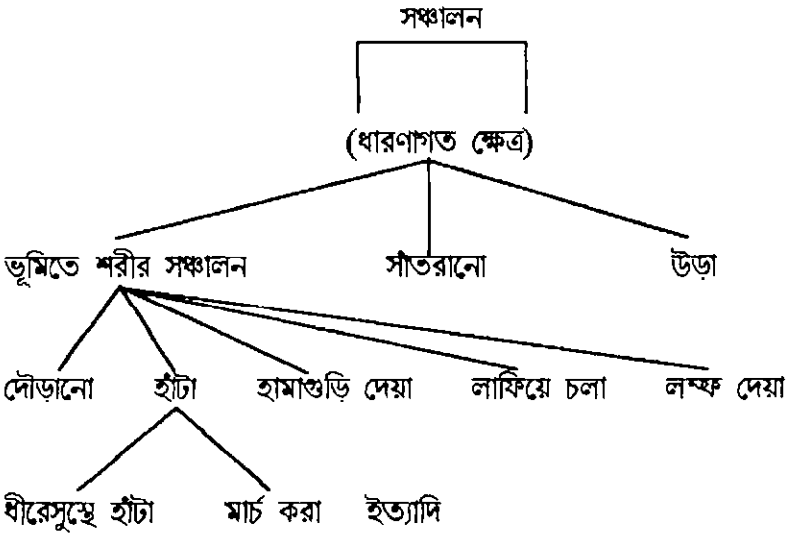

সঞ্চালন পরিশৃঙ্খলা

Hatch & Brown 1995: 148)

শ্রেণীকক্ষ পান্ডুলিপিতে সঞ্চালন কার্য আছে । শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াতে পারেন, তিনি চকডাস্টার ডেস্কের উপর রাখতে পারেন, কিংবা ছাত্রদের কাছ থেকে খাতা সংগ্রহ করতে পারে এবং পড়ে আবার ফেরত দিতে পারে । এসব সঞ্চালন কার্য । একটি দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রাখাকে বলে পাদার্থের ভৌত স্থানান্তর যা চিহ্নিত হয় PTRANS দ্বারা এবং অন্য কোন দ্রব্য এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির কাছে যাওয়াকে বলে স্বত্বের স্থানান্তর যা চিহ্নিত হয় ATRANS দ্বারা । শ্রেণীকক্ষের ভিতর শুধু দ্রব্যেরই স্থানান্তর হয় না, ধারণারও স্থানান্তর হয় – ছাত্র থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষক থেকে ছাত্রের মধ্যে । ধারণার এক আধার থেকে আরেক আধারে যাওয়াকে বলে *তথ্যের মানসিক স্থানান্তর* যা চিহ্নিত হয় MTRANS দ্বারা । প্রতিটি পান্ডুলিপিতে আবার *মূল্যায়ন* নামে একটি অংশ রয়েছে যাতে ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে চলমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন হয়ে থাকে । শ্রেণীকক্ষেও শিক্ষক ও ছাত্র ক্লাশ চলার সময় যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন ক্লাশ কেমন হচ্ছে এবং তার প্রেক্ষিতে নিজেদের কাজকে পরিস্থিতির সাথে মানানসই করে তোলেন । এবার আমরা শ্রেণীকক্ষ পান্ডুলিপিকে অতিসরলায়িতভাবে নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি ঃ

ভূমিকা	শিক্ষক	ISA	ছাত্র
	HASA		HASA
	চকডাস্টার রেজিস্টার খাতা	মূল্যায়ন	ইউনিফর্ম বইখাতা
সঞ্চালন	PTRANS	ATRANS	MTRANS

শ্রেণীকক্ষ পাণ্ডুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব জীবনে একই ব্যক্তি বিভিন্ন পান্ডুলিপিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন । শ্রেণীকক্ষে কেউ ছাত্র হতে পারেন, খেলার মাঠে ক্রিকেটার হতে পারেন, সংগঠনের নেতা হতে পারেন ইত্যাদি । এভাবে ভূমিকার স্থানান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন পান্ডুলিপির মধ্যে মিথক্রিয়া ঘটে এবং তারফলে জটিল সংশ্রয়ের সৃষ্টি হয় । কোন বিশেষ কার্যের মাধ্যমেও পান্ডুলিপিসমূহের মধ্যে মিথক্রিয়া হতে পারে । যেমন টাকা আদানপ্রদান কার্যের সাথে অনেক পান্ডুলিপি একই সাথে জড়িত, যথা – ব্যাংক, জীবনবীমা, দোকান, সিনেমা হল, কাউন্টার ইত্যাদি । এরকম পরস্পরসম্পৃক্ত কতগুলো ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত হয় পান্ডুলিপিগুচ্ছ । *সৃষ্টিশীল কর্ম পান্ডুলিপিগুচ্ছ* -এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত *লেখালেখি, ছবি আঁকা, বয়নকার্য, ভাস্কর্য তৈরী* ইত্যাদি । তেমনি *সমস্যা সমাধান পান্ডুলিপিগুচ্ছ* -এর মধ্যে পড়ে *চিকিৎসা, প্রকৌশল, শিক্ষকতা, ওকালতি* ইত্যাদি । এভাবে বিচার করলে দেখা যায় মানুষের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল কর্ম ও প্রতিষ্ঠানই পান্ডুলিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ।

নিঃসন্দেহে ধারণার সংগঠন সম্পর্কে পান্ডুলিপি তত্ত্বের বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার । অভিধান প্রণয়ন, অফিস প্রশাসন, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং অনেক ক্ষেত্রেই এ তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সুফল পাওয়া গেছে । কিন্তু এই তত্ত্বের অসুবিধা হলো এটি ধারণার সংগঠন সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ কথা বললেও ভাষার অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলে না । ধারণার সাথে ভাষার সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু ধারণা মানে অর্থ নয় এবং ধারণার বিশ্লেষণ মানে অর্থের বিশ্লেষণ নয় । তাই বিভিন্ন গুণ থাকা সত্ত্বেও বাগর্থিক তত্ত্ব হিসাবে এর মূল্য খুব বেশি নয়।

ধারণাগত সংগঠন প্রকল্প

পান্ডুলিপি তত্ত্বের বিকল্প হিসাবে জ্যাকেনডফ (১৯৮৫) ধারণাগত সংগঠন প্রকল্প প্রস্তাব করেন । জ্যাকেনডফ বলেন, ধারণাগত সংগঠনে কোন পান্ডুলিপি তথ্য থাকে না বরং থাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অবধারণমূলক তথ্য । PTRANS, ATRANS, MTRANS এগুলো বিশ্লেষণ করা হবে পান্ডুলিপিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং বাগর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে । এই বিশ্লেষণ হবে ধারণাগত স্তরে, তবে সেখানে ক্রিয়াশীল হবে অবধারণমূলক তথ্য যা ইন্দ্রিয়ক্রিয়ামূলক সংশ্রয় ও ব্যবহারজ্ঞান থেকে আগত । কাজেই জ্যাকেনডফের তত্ত্বে বাগর্থিক সংগঠন ধারণাগত সংগঠনের অংশ যা ভাষিক সংগঠনের সাথে যুক্ত । জ্যাকেনডফ put (রাখা) ক্রিয়াপদ দিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে । ইংরেজীতে put শব্দটি এই বাক্যতাত্ত্বিক তথ্য ধারণ করে যে এটি একটি ক্রিয়া, এর পূর্বে বিশেষ্যবাচক উদ্দেশ্য এবং পরে একটি বিশেষ্যবাচক কর্ম ও একটি প্রেপজিশনাল শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হবে ঃ

$$\text{put } [-N, +V] \\ NP_i \ ____ \ NP_j \ PP_k$$

এর সাথে যুক্ত থাকে একটি ধারণাগত সংগঠন যা এখানে দুইটি বাঁধক সমন্বয়ে গঠিত – একটি বিষয়বস্তুগত, অন্যটি বৃত্তিগত । বিষয়বস্তুগত বাঁধক দেখায় যে put একটি ঘটনা যেখানে একটি বস্তু বিশেষ পথে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায় ঃ

$$[_{event}\ GO\ (\ [_{thing}\ ^{\alpha}]_j \quad {}_{path} \begin{bmatrix} [FROM\ (\ [_{place}]_i\ )] \\ [TO\ (\ [_{place}\ ^{\tau}]\ )_k \end{bmatrix})]$$

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তিগত বাঁধক দেখায় যে রাখার কাজটি কারণিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে একটি সত্তা ইচ্ছামূলকভাবে কারণগত সূত্রে অন্য একটি সত্তার উপর ক্রিয়া করে ঃ

$$[_{event}\ CAUSE\ (\ [\ thing^{\beta}\ ]_{i}\ ,\ [_{event}\ ACT\ (\ [\ thing\ ]^{\beta}\ ,\ [\ thing\ ]^{\alpha}\ )\ ]\ )\ ]$$

এই তত্ত্বে বিষয়বস্তুগত বাঁধক অবধারণের সাথে সম্পর্কিত এবং তা স্থান, উৎস্য প্রভৃতি বাগর্থিক ভূমিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে । অন্যদিকে বৃত্তিগত বাধক ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এবং তা কর্তা, কর্ম প্রভৃতি বাগর্থিক ভূমিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে । এভাবে জ্যাকেনডফের ধারণাগত সংগঠন প্রকল্প একটি বাগর্থিক তত্ত্বের সূত্রপাত করে যা বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হয়েও বাক্যতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন ।

জ্যাকেনডফ তার পরিশৃঙ্খলায় i, j, k প্রভৃতি নিম্নাক্ষর ব্যবহার করেছেন । এই নিম্নাক্ষরের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের সম্পর্ক বোঝা যায় । যেমন i নিম্নাক্ষর বাক্যতাত্ত্বিক স্তরে বিশেষ্যবাচক উদ্দেশ্যকে সূচিত করেছে, বিষয়বস্তুগত বাঁধক স্তরে এটি উদ্দেশ্যকে সূচিত করেছে এবং বৃত্তিগত বাঁধক স্তরে এটি কাজের কর্তাকে সূচিত করেছে । *শিক্ষক বইটি টেবিলের উপর রাখলেন* যদি আমরা এই বাক্যটি বিবেচনা করি তাহলে দেখবো আলোচ্য প্রকল্পের রূপায়ন অনুসারে এখানে *শিক্ষক* শব্দটির ত্রিবিধ পরিচয় রয়েছে – এটি একাধারে উদ্দেশ্যে, উৎস্য ও কর্তা ।

জ্যাকেনডফের মতে, সকল ভাষার ধারণাগত সংগঠন অভিন্ন, কিন্তু এককে ভাষা এককেভাবে সেই ধারণাগত সংগঠনকে শব্দে রূপ দেয় । কাজেই ভাষায় ভাষায় যে বিস্তর পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা বাহিরের, অন্তরে সব ভাষা একই ধারণাগত সংগঠনকে লালন করে । চমস্কি (১৯৮১, ১৯৮৬) ও মোটামুটি একই মতামত পোষন করেন । তার মতে সব ভাষারই অন্তর্সংগঠন এক, বাহিরের হাজারো পার্থক্য সত্ত্বেও । তিনি সকল ভাষায় সাধারণভাবে বিদ্যমান মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুচ্ছের নাম দেন **বিশ্বজনীন ব্যাকরণ** । চমস্কির বিশ্বজনীন ব্যাকরণের পরিচয় দিতে গিয়ে ভি. জে. কুক (১৯৮৮ ঃ ১) বলেন, "মানুষ যে ভাষাই ব্যবহার করুক না কেন তাদের মধ্যে ভাষাজ্ঞানের অংশবিশেষ সাধারণভাবে বিদ্যমান । এটিই হলো বিশ্বজনীন ব্যাকরণ ।"• তবে চমস্কির দাবি মূলতঃ বাক্যিক সংগঠনের উপর, আর জ্যাকেনডফের দাবি বাগর্থিক সংগঠনের উপর । চমস্কির সার্বজনীনতা তাই বাক্যতত্ত্বের অংশ, কিন্তু জ্যাকেনডফের তত্ত্ব অধিকতর ব্যাপক, এটি চমস্কির ভাষা সংগঠনের বিশ্বজনীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু বিপরীতক্রমে তা সত্য নয় ।

জ্যাকেনডফের ধারণাগত সংগঠন প্রকল্পটি অভিনবত্বে ভরা । এর দাবিসমূহ যুক্তিগ্রাহ্য, বিশ্লেষণ প্রনালী সূক্ষ্ম এবং সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী । তবে এ তত্ত্ব নিয়ে চরম মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি । সমালোচকদের পুঙ্খনাপুঙ্খ বিচার ও বাস্তব কার্যকারিতা যাচাইয়ের পরই বলা সম্ভব হবে এর সবলতা দুর্বলতা কোথায় ও কতটুকু । তবে তুলনামূলক বিচারে এটুকু মনে হয় এটি একটি উঁচুমানের বাগর্থিক তত্ত্ব যা ভাষা, অর্থ ও ধারণার মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করে ।

• "All human beings share part of their knowledge of language; regardless of which language they speak, UG (universal grammar) is their common inheritance." V. J. Cook (1988), *Chomsky's Universal Grammar*, p. 1.

Dhaka University Institutional Repository

বাগর্থিক আপেক্ষিকতা বনাম বাগর্থিক সার্বজনীনতা

বাগর্থিক আপেক্ষিকতা অনুসারে প্রতিটি ভাষা সম্প্রদায়ের ধারণাগত সংগঠন ভিন্ন । ভাষাসমূহের মধ্যে বাহ্যিক অমিল যেমন রয়েছে আভ্যন্তরীণ অমিলও তেমনি রয়েছে । ভাষার উপর রয়েছে সংস্কৃতির প্রভাব । যেহেতু একেক ভাষার উপর একেক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে, তাই প্রতিটি ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার পরিচয়বাহী । মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী বোয়াস, ব্লুমফিল্ড, হকেট প্রমুখের লেখায় বাগর্থিক আপেক্ষিকতার সমর্থন পাওয়া যায় । তবে বাগর্থিক আপেক্ষিকতার সবচেয়ে বড় দাবি হাজির করেন এডওয়ার্ড সাপির এবং বেঞ্জামিন লী হোয়র্প যাদের প্রস্তাবনা একসাথে **সাপির-হোয়ার্প প্রকল্প** নামে নামে প্রসিদ্ধ । সাপির এবং হোয়ার্প দাবি করেন যে প্রতিটি ভাষা তার নিজস্ব জগত সৃষ্টি করে, ফলে প্রতিটি ভাষার বাগর্থিক সংগঠনও স্বতন্ত্র । যেহেতু ভাষার মাধ্যমে মানুষ জগতকে উপলব্ধি করে ও জগত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাই দুটি ভাষা সম্প্রদায়ের জগতদৃষ্টি ভিন্ন হতে বাধ্য । বাগর্থিক আপেক্ষিকতাবাদীরা বর্ণবিষয়ক শব্দাবলী ও জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীর মাধ্যমে তাদের দাবির যথার্থতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান । একই বর্ণালীকে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে, ফলে বিভিন্ন ভাষার বর্ণবিষয়ক শব্দবলীও ভিন্ন । প্রতিটি ভাষার জ্ঞাতিবিষয়ক শব্দাবলীও স্বতন্ত্র, কারণ একেক ভাষা একেক সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত ।

বাগর্থিক আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধ মতবাদ হলো বাগর্থিক সার্বজনীনতা । বাগর্থিক সার্বজনীনতাবাদীরা বাগর্থিক আপেক্ষিকতার বিরোধিতা করে বলেন যে সকল ভাষার অন্তর্গত ধারণাগত সংগঠন অভিন্ন । ধারণাগত সংগঠনকে একেক ভাষা একেকভাবে রূপায়িত করে, ফলে বাহ্যিক অবয়বে ভাষায় ভাষায় পার্থক্য সূচিত হয় । বাগর্থিক সার্বজনীনতার পক্ষে আছেন গ্রীনবার্গ, চমস্কি, ক্যাটজ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী (Lehrer 1974: 150) । বাগর্থিক সার্বজনীনতার উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন স্বদেশ (১৯৭২) এবং ভিয়ার্তসবিকা (১৯৮০) । এখানে আমরা তাদের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করবো ।

স্বদেশ সর্বপ্রথম ২০০ মৌলিক ধারণার একটি তালিকা তৈরী করেন এবং বলেন যে এই ধারণাগুলো সকল ভাষায় বিদ্যমান । এটি বিভিন্ন আন্তভাষিক গবেষণায় কাজে লাগানো হয় এবং দেখা যায় যে এর অনেকগুলিই সঠিক অর্থে সার্বজনীন নয় । ফলে ধারণার সংখ্যা নেমে আসে ১০০ তে (Hatch & Brown 1995: 117) । নীচে আমরা স্বদেশের কাটছাট করা তালিকাটি তুলে ধরছি বাংলা শব্দ দ্বারা ঃ

১. আমি	১১. এক	২১. কুকুর	৩১. হাড়
২. তুমি	১২. দুই	২২. উকুন	৩২. তেল
৩. আমরা	১৩. বড়	২৩. গাছ	৩৩. ডিম
৪. এই	১৪. লম্বা	২৪. বীজ	৩৪. শিং
৫. ঐ	১৫. ছোট	২৫. পাতা	৩৫. লেজ
৬. কে	১৬. মেয়ে	২৬. মূল	৩৬. চর্ম (প্রক্রিয়াজাত
৭. কি	১৭. ছেলে	২৭. ছাল	পশু চামড়া)
৮. না	১৮. ব্যক্তি	২৮. চামড়া	৩৭. চুল
৯. সকল	১৯. মাছ	২৯. মাংস	৩৮. মাথা
১০. অনেক	২০. পাখি	৩০. রক্ত	৩৯. কান

Dhaka University Institutional Repository

৪০. চোখ	৫৬. কামড়ানো	৭২. সূর্য	৮৮. সবুজ
৪১. নাক	৫৭. দেখা	৭৩. চাঁদ	৮৯. হলুদ
৪২. মুখ	৫৮. শোনা	৭৪. তারা	৯০. সাদা
৪৩. দাঁত	৫৯. জানা	৭৫. জল	৯১. কালো
৪৪. জিহবা	৬০. ঘুমানো	৭৬. বৃষ্টি	৯২. রাত
৪৫. নখ	৬১. মরে যাওয়া	৭৭. পাথর	৯৩. গরম
৪৬. পা	৬২. হত্যা করা	৭৮. বালি	৯৪. ঠান্ডা
৪৭. হাঁটু	৬৩. সাঁতড়ানো	৭৯. মাটি	৯৫. পূর্ণ
৪৮. হাত	৬৪. ওড়া	৮০. মেঘ	৯৬. নতুন
৪৯. পেট	৬৫. হাঁটা	৮১. ধোঁয়া	৯৭. ভালো
৫০. গলা	৬৬. আসা	৮২. আগুন	৯৮. গোল
৫১. বুক	৬৭. শোয়া	৮৩. ছাই	৯৯. শুকনা/শুষ্ক
৫২. হৃদয়	৬৮. বসা	৮৪. পোড়া/পোড়ানো	১০০. নাম
৫৩. কলিজা	৬৯. দাঁড়ানো	৮৫. পথ	
৫৪. পান করা	৭০. দেয়া	৮৬. পর্বত	
৫৫. খাওয়া	৭১. বলা	৮৭. লাল	

আমাদের এখানে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যে আমরা কোন শব্দের তালিকা উপস্থিত করেছি, এটি ধারণার তালিকা যা শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বদেশের দাবি অনুসারে প্রতিটি ভাষাতেই এই ধারণাগুলো প্রকাশের জন্য একক শব্দ রয়েছে। যেমন বাংলা ভাষায় আমরা ধারণাগুলোকে একক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। শুধু আমরা দুই জায়গায় (৩৬ ও ৮৪) একটু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। ইংরেজীসহ অন্যান্য কিছু ভাষা যারা মানুষের চামড়া ও পশুর চামড়ার মধ্যে পার্থক্য করে এবং দুটি ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে (যেমন ইংরেজীর ক্ষেত্রে skin/leather), বাংলা ভাষায় সেখানে দুটি ধারণার জন্য একটিমাত্র শব্দ রয়েছে – *চামড়া* (আমরা তালিকায় পশুর চামড়াকে চর্ম বলেছি দুটি ধারণার পার্থক্য বোঝানোর জন্য; কিন্তু বাস্তবে বাংলা ভাষায় শব্দদুটি পরস্পরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে)। বাংলা ভাষায় *পোড়া* ও *পোড়ানো* শব্দদুটি দুই ভিন্ন ধারণাকে প্রকাশ করে ; ব্যাকরণিক বিশ্লেষণে প্রথমটি অকর্মক ও দ্বিতীয়টি সকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় দুটি ধারণাই burn শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়। আমরা নিশ্চিত নই তালিকায় burn বলতে কোন্ বিশেষ ধারণাকে বোঝানো হয়েছে। তবে এটি নিশ্চিত যে শব্দটি একসাথে দুটি ধারণা বোঝাতে তালিকায় ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ তাহলে স্বদেশের সার্বজনীনতার সংজ্ঞা অনুসারে এটি আর মৌলিক ধারণা থাকে না। কাজেই আমরা মনে করি তালিকার ৮৪ নম্বর ধারণাটি আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ভিয়ার্ত্সবিকা বাগর্থিক সার্বজনীনতা নিয়ে বিশ বৎসর গবেষণা করেন। তিনি বলেন যে ধারণাগত সংগঠনের মূলে রয়েছে ১৩টি *আদিম* যা আর ক্ষুদ্র পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় না এবং এই ১৩টি আদিম দিয়ে অন্যান্য সব ধারণার বিশ্লেষণ করা যায়। এই ১৩টি আদিম ও তাদের বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণ নিয়ে গঠিত হয় *প্রাকৃতিক বাগর্থিক অধিভাষা*। ভিয়ার্ত্সবিকার ১৩টি মৌলিক বাগর্থিক আদিম নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

I (আমি)
you (তুমি)
someone (কেউ)
something (কিছু)
world (পৃথিবী)
this (এই)
want (চাওয়া)
not want (না চাওয়া)
think of (কোনকিছু নিয়ে ভাবা)
say (বলা)
imagine (কল্পনা করা)
be part of (অংশ হওয়া)
become (হওয়া)

এই ১৩টি আদিম এবং প্রাকৃতিক প্রজাতির নামসমূহ (যেমন কুকুর, আপেল) ব্যবহার করে ভাষার যে কোন ধারণার অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব এবং ভিয়ার্তসবিকার দাবি অনুসারে এতে অর্থ বিশ্লেষণের চক্রক অনুপপত্তি এড়ানো সম্ভব হয় । তিনি অ্যাপ্রেসজান (১৯৭৪) -এর উক্তিতে তার দাবির সমর্থন খুঁজে পান ঃ

> "একটি অর্থ যতো প্রাথমিক পর্যায়ের হয় ততোই তার বিভিন্ন ভাষায় একক শব্দে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ঃ প্রাথমিক অর্থগুলো স্পষ্টতঃই পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় একক শব্দে প্রকাশিত হয় । প্রাথমিক অর্থগুলোর সংমিশ্রনের স্তরেই কেবল বিভিন্ন ভাষায় বাগর্থিক সংশ্রয়ের বৈচিত্র্য ও অসমতা সৃষ্টি হয় ।"[৩]

স্বদেশ ও ভিয়ার্তসবিকার তত্ত্ব নিঃসন্দেহে বাগর্থিক সার্বজনীনতার পক্ষে জোরালো দাবি উপস্থাপন করে । কিন্তু বাগর্থিক সার্বজনীনতার যে কোন উদ্যোগ সফল হতে হলে তাকে বাগর্থিক আপেক্ষিকতার দাবিসমূহ অপ্রমান করতে হবে । কিন্তু সে লক্ষ্য অর্জনে জটিলতা রয়েই গেছে । ভাষা এবং ভাষাব্যবহারকারীর উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাবকে সহজে নাকচ করা যায় না । বার্লিন ও কে (১৯৬৯) বিশটি ভাষা ও তাদের ভাষাব্যবহারকারীদের নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে যদিও ঐ সমস্ত ভাষায় বর্ণবিষয়ক শব্দাবলী ভিন্ন তথাপি যারা সেসব ব্যবহার করেন তাদের বর্ণ সম্পর্কে ইন্দ্রিয়নুভূতি একই রকম । একটি ভাষায় কোন বিশেষ বর্ণের জন্য শব্দ না থাকলেও ভাষাব্যবহারকারীরা ঐ বর্ণের সাথে অন্য বর্ণের পার্থক্য সনাক্ত করতে পারে । অর্থাৎ ধারণাগত পর্যায়ে সবার জ্ঞানই এক । কিন্তু নৃতত্ত্ববিদদের জ্ঞাতি আপেক্ষিকতার বিরুদ্ধে এখনো কোন বড় চ্যালেঞ্জ গড়ে উঠেনি । এই অবস্থায় আমরা বলতে পারি বাগর্থিক আপেক্ষিকতা ও সার্বজনীনতা উভয়ই অংশত বৈধ ও অংশত অবৈধ ।

---

[৩] "The more elementary a given meaning is, the greater the range of the language in which it can be expressed by a single word: elementary meanings are apparently expressed by single words in most languages of the world. The diversity and lack of congruence of the semantic systems of different languages arise at the level of combination of elementary meanings." A. Wierzbicka 1980 *Lingua Mentalis*, cited in Hatch & Brown (1995: 116)

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সংগঠন তত্ত্ব

মনোভাষাবিজ্ঞানী ম্যাকনীল (১৯৭৯) সংকেত সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা, চিন্তা ও বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় করেন। তার তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে তিনি পিয়ার্সের সংকেতের ধারণা গ্রহণ করেন এবং প্রতীক, প্রতিমূর্তি ও সূচক এই তিন ধরনের সংকেতের সাহায্যে বাগর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রয়াস পান।

ম্যাকনীলের বাগর্থিক সংগঠন বোঝার জন্য পিয়ার্সের সংকেতের ধারণার সাথে আগে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। পিয়ার্স সংকেতকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। নীচে আমরা তাদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

প্রতীক ঃ প্রতীক বলতে সেই সংকেতকে বুঝায় যা ব্যাখ্যাত না হলে তার চরিত্র হারায়। মানুষের ভাষা এই হিসাবে প্রতীকের পর্যায়ে পড়ে, কারণ ভাষার উপর যদি কোন অর্থ আরোপ করা না হয় তবে তার কোন গুরুত্ব থাকে না।

প্রতিমূর্তি ঃ প্রতিমূর্তি বলতে সেই সংকেতকে বুঝায় যার নির্দেশিত বাস্তবে অস্তিত্বশীল না হলে তা গুরুত্ব হারায় না। যেমন সংখ্যালিপি, জ্যামিতিক চিত্র, ছবি ইত্যাদি। সংখ্যা, জ্যামিতিক সংগঠন বিমূর্ত ধারণা এবং ছবি কল্পিত বস্তুরও হতে পারে। প্রতিমূর্তিকে অর্থপূর্ণ করার জন্য এদের শশরীর উপস্থিতির প্রয়োজন নেই।

সূচক ঃ সূচক বলতে সেই সংকেতকে বুঝায় যা নির্দেশিতের অভাবে গুরুত্ব হারায় কিন্তু যা ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন ভাঙ্গা কাঁচের জানালা ঢিলের সূচক হতে পারে ; ঢিলের ব্যাপারটি বাদ দিলে ভাঙ্গা কাঁচের জানালা কোন কিছু প্রতীকায়িত করে না। এখন কেউ ব্যাখ্যা করুক আর না করুক ভাঙ্গা কাঁচের জানালার সাথে ঢিলের সম্পর্ক থাকবেই।

পিয়ার্সের মতো ম্যাকনীলও মনে করেন সংকেত তিনটি উপাদানে গঠিত ঃ সংকেতযান, ব্যাখ্যক ও বস্তু। **সংকেতযান** হলো শব্দ/বাক্য, চিত্র, মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রভৃতি যা সংকেতের অর্থকে বহন করে নিয়ে যায়। **ব্যাখ্যক** হলো সংকেতযানকে ব্যাখ্যা করার ফলাফল যা সচরাচর চেতন মনের ক্রিয়া। **বস্তু** হলো জাগতিক পদার্থ বা ঘটনা যার সাথে ব্যাখ্যক সংকেতযানকে সম্পর্কিত করে। বস্তু ভৌত হতে পারে, মানসিক হতে পারে, অর্থাৎ এটি মূর্ত বা বিমূর্ত যে কোন কিছু হতে পারে। কাজেই দেখা যায় সংকেতযান, ব্যাখ্যক ও বস্তুর মধ্যে একটি ত্রয়ী সম্পর্ক বিদ্যমান। *সংকেতযান ব্যাখ্যককে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে সংকেতযানের সাথে বস্তুর যে সম্পর্ক, ব্যাখ্যকের সাথে বস্তুর সেই একই সম্পর্ক স্থাপিত হয়।*[১] এটিই হলো সংকেতের যন্ত্রপ্রক্রিয়া। সংকেতযান, ব্যাখ্যক ও বস্তুর এই যন্ত্রপ্রক্রিয়াকে ম্যাকনীল নিম্নরূপ উপস্থাপন করেন ঃ

সূচক ঃ	O → S ——— I প্রকৃত সংযোগ	কোন বস্তু দেখে ব্যাখ্যাকারীর মনে একটি সংবেদনের ফলাফল জন্মে
প্রতিমূর্তি ঃ	O → S ——— I সাদৃশ্য	বস্তুসদৃশ্য কোন আকার গঠনের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকারীর মনে একটি সংবেদনের ফলাফল জন্মে

[১] "The sign which determines the interpretant to be related to the object in the same way as the sign vehicle is related to the object." McNeill (1979), *The Conceptual Basis of Language*. p.40

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীক ঃ $O \rightarrow S$ ----- I নির্দেশিত বস্তুর একটি সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে ব্যাখ্যাকারীর মনে
নিয়ম একটি সংবেদনের ফলাফল জন্মে

এখানে, O = বস্তু
S = সংকেতযান
I = ব্যাখ্যক

উপরে যে যন্ত্রপ্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুধাবনমূলক । কিন্তু এর বিপরীতে সংকেতসংগঠনে একটি উৎপাদনমূলক প্রক্রিয়াও বর্তমান । এখানেও তিনটি উপাদান বিদ্যমান, তবে এক্ষেত্রে ব্যাখ্যকের পরিবর্তে থাকে উৎপাদক । একটি ব্যাপারে এখানে সর্তক হওয়া প্রয়োজন, তা হলো উৎপাদক বলতে উৎপাদনকারী ব্যক্তিকে বোঝাবে না বরং ব্যক্তির মনে বা মস্তিষ্কে যে মানসিক বা স্নায়ুগত প্রক্রিয়া কাজ করে তাকে বোঝাবে । সংকেতযান, উৎপাদক ও বস্তুর মধ্যেও একটি ত্রয়ী সম্পর্ক বিদ্যমান । এখানে যে যন্ত্রপ্রক্রিয়াটি কাজ করে তা হলো ঃ *বস্তু উৎপাদককে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে বস্তুর সাথে সংকেতযানের যে সম্পর্ক উৎপাদকের সাথে সংকেতযানের সেই একই সম্পর্ক স্থাপিত হয়* ।● ম্যাকনীল এই সম্পর্ককে নিম্নরূপে প্রদর্শন করেন ঃ

সূচক ঃ P ----- $O \rightarrow S$ কোন কিছু দেখে উৎপাদনকারীর মনে একটি প্রকাশের প্রক্রিয়া সূচিত
প্রকৃত সংযোগ হয়

প্রতিমূর্তি ঃ P ----- $O \rightarrow S$ বস্তুসদৃশ্য কোন আকার গঠনের মাধ্যমে উৎপাদনকারীর মনে একটি
সাদৃশ্য প্রকাশের প্রকিয়া সূচিত হয়

প্রতীক ঃ P ----- $O \rightarrow S$ নির্দেশিত বস্তুর একটি সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদনকারীর মনে
নিয়ম একটি প্রকাশের প্রক্রিয়া সূচিত হয় ।

এখানে, P = উৎপাদক
O = বস্তু
S = সংকেতযান

ব্যাখ্যক ও উৎপাদক পরস্পরসম্পর্কিত । সংকেতের যন্তপ্রক্রিয়ায় উৎপাদক ইনপুট এবং ব্যাখ্যক আউটপুট হিসাবে কাজ করে । সেই হিসাবে উৎপাদকের অবস্থান ব্যাখ্যকের পূর্বে । কাজেই এবার পুরো সংকেতসংগঠনকে সংক্ষেপে এভাবে দেখানো যায় ঃ

P ----- $O \rightarrow S$ ----- I

● "The productant as an input introduces exactly the same relation between the object and the sign vehicle that the interpretant duplicates as an outcome." Ibid. p.42

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যক ও উৎপাদক দুটি ঘনিষ্ট সম্পর্কিত প্রক্রিয়া যাদের জন্য একই মনস্তাত্ত্বিক মালমশলা ব্যবহৃত হয় । দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া না বলে বরং বলা যেতে পারে এরা একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক যাদের অভিমুখ বিপরীত । তাদেরকে একরূপ কল্পনা করে যদি আমরা তার মধ্যস্থতায় সংকেত ও বস্তুর সম্পর্ক স্থাপন করি তবে তার ফলাফল হবে আমাদের পরিচিত মৌলিক ত্রিভূজ ঃ

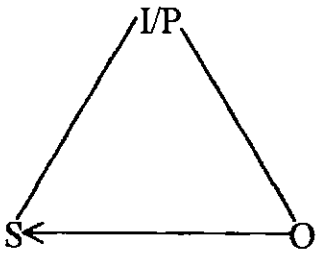

সংকেত সংগঠন

এভাবে দেখা যায় সংকেত সংগঠন তত্ত্ব ভাষা, চিন্তন ও জগতের মধ্যে একটি ত্রয়ী সম্পর্ক চিত্রিত করে । একে আমরা অগডেন ও রিচার্ডসের ত্রিভূজতত্ত্বের একটি উন্নত সংস্করণ বলতে পারি যাতে ত্রয়ী সম্পর্কের একটি সুষ্ঠ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । সর্বোপরি, সংকেত সংগঠন একটি বাগর্থিক প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে যা নির্দেশন তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে ।

অস্পষ্টতা

বাস্তব জীবনে প্রায়ই এরকম অভিযোগ শোনা যায় – *তার কথাগুলো স্পষ্ট নয়* কিংবা *তার বক্তব্য অস্পষ্টতায় ভরা* । অস্পষ্টতা তাই একটি বাস্তব সমস্যা । অনেকের মতে অস্পষ্টতা ভাষার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য । ভাষার প্রকৃতিই এমন যে তাতে কিছু না কিছু অস্পষ্টতা থাকবেই । অস্পষ্টতা এক ধরনের উপলব্ধির ব্যাপার, তাই সমস্যাটি চরিত্রগতভাবে মানসিক । যখন কেউ এমন অবস্থায় পড়ে যে সে কোন কিছুর উপর সুনির্দিষ্ট অর্থ আরোপ করতে পারে না অথবা একটি শব্দ বা বাক্য বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তখন আমরা তাকে অস্পষ্টতা বলতে পারি । যেমন, *মধ্যবয়সী* শব্দটি অস্পষ্ট কারণ ষাট বছরের একটি লোককে মধ্যবয়সী বলা যাবে কি যাবে না তা স্পষ্ট নয়, কারণ তাকে বৃদ্ধ বলেও দাবি করা যেতে পারে । বিভিন্ন কারণে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হতে পারে ।

প্রথমত, ঝাপসা শ্রেণীর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এক ধরনের অস্পষ্টতা বিরাজ করে । যেমন *টমেটো* ফল না সব্জি, বাঁশ গাছ না তৃণ তা স্পষ্ট করে বলা যায় না ।

দ্বিতীয়ত, অজ্ঞতাজনিত অনিশ্চয়তা অস্পষ্টতার জন্ম দিতে পারে । যেমন, *অন্য গ্রহে মানবাকার প্রাণী আছে* এই বাক্যটি অস্পষ্ট কারণ আমাদের পক্ষে মহাকাশের সমস্ত গ্রহ ঘুরে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । একইভাবে *ব্রহ্মান্ড অসীম* এটি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের উৎস্য । *আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক* প্রভৃতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, শব্দ বা বাক্যের দ্ব্যর্থকতার কারণে অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে । যেমন *ঘরে চাল নেই* এ বাক্যটি অস্পষ্ট কারণ এখানে *চাল* শব্দটির দুটো অর্থ হতে পারে । চাউল (যা প্রক্রিয়াজাতকরে খাওয়া হয়) এবং ছাদ (সচরাচর, টিনের) যা দ্বারা ঘরের আচ্ছাদন দেয়া হয় । একইভাবে নীচের ইংরেজী বাক্য দুটিও দ্ব্যর্থকতাজনিত কারণে অস্পষ্ট ঃ

Flying plane can be dangerous.
Visiting relatives can be nuisance.

এখানে (Flying plane) -এর অর্থ হতে পারে *বিমান চালানো* বা *উড়ন্ত বিমান* এবং (Visiting relatives) -এর অর্থ হতে পারে *আত্মীয়ের বাসায় বেড়ানো* বা *আত্মীয়ের বেড়ানো* ।

চতুর্থত, অনেকার্থকতাও একইভাবে অস্পষ্টতার জন্ম দেয় । অনেকার্থকতার ক্ষেত্রে একটি শব্দের সাথে একাধিক অর্থ যুক্ত থাকে ।

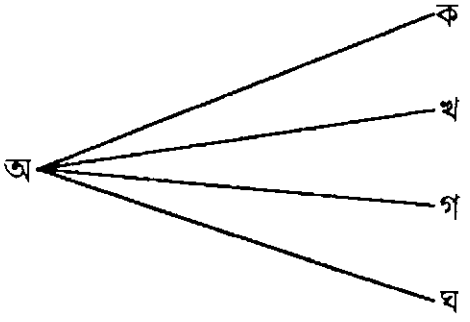

অনেকার্থকতা

এখানে অ শব্দ এবং ক, খ, গ, ঘ তার অর্থ । যেমন বাংলায় *মাথা* শব্দটি অনেকার্থক – এর অর্থ হতে পারে শির, বুদ্ধি, অগ্রভাগ, মোজাজ ইত্যাদি । কাজেই আমরা বলতে পারি মাথা শব্দটি অস্পষ্ট । তবে এ ধরনের অস্পষ্টতা হ্রাস পায় শব্দের বাক্যে প্রয়োগের মাধ্যমে । *মাথা* শব্দটি বিচ্ছিন্নভাবে যতোটা স্পষ্ট নীচের বাক্যগুলোতে সম্ভবতঃ ততোটা অস্পষ্ট নয় ঃ

গরু মাথায় দুটি শিং ।
ছাত্রটির মাথা ভালো ।
গাছের মাথায় একজোড়া পাখি বসে আছে ।
আগে মাথা ঠান্ডা করো ।

পঞ্চমত, রূপকগত প্রসারণ অস্পষ্টতার উৎস্য হিসাবে কাজ করতে পারে । যেমন *সূচীভেদ্য অন্ধকার, পিনপতন নীরবতা* প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ অস্পষ্ট, কারণ কিরকম অন্ধকার হলে সূচ তাকে ভেদ করতে পারবে না কিংবা কিরকম নীরবতা হলে পিন পতনের শব্দ শোনা যাবে এবং তা কতদূর থেকে তা স্পষ্ট নয় । একইভাবে নীচের কবিতাংশে *মরণ রথের চাকার ধ্বনি* শব্দগুচ্ছ অস্পষ্ট ঃ

মরণ রথের চাকার ধ্বনি ঐরে আমার কানে আসে
পূবের হাওয়া তাই নেমেছে পারুল বনে দীঘল ঘাসে ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠত, গুরুগম্ভীর ধোঁয়াশাপূর্ণ শব্দপ্রয়োগের ফলে কথা অস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হতে পারে । আধ্যাত্মিক আলোচনায় প্রায়ই এধরনের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয় । রবীন্দ্রনাথের *হিংটিংছট* থেকে এধরনের অস্পষ্টতার একটি মোক্ষম উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুন
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদে দ্বিগুণ বিগুণ
বিবর্তন আবর্তন সন্নর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মাবিদ্যুৎ
ধারণা পরমাশক্তি সেথায় উদ্ভূত
ত্রয়ীশক্তি ত্রিত্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিংটিংছট ।

সপ্তমত, মানুষ অনেক সময় ইঙ্গিত বা মারপ্যাঁচ দিয়ে কথা বলে থাকে । এর ফলেও শ্রোতার মনে অস্পষ্টতার উপলব্ধি হয় । যেমন ঘরের মধ্যে বিশেষ পরিস্থিতিতে কেউ যখন বলে *খুব গরম লাগছে* তখন এর ইঙ্গিতটি হতে পারে সে চাচ্ছে কেউ ফ্যান ছেড়ে দিক অথবা জানালা খুলে দিক । বিশেষ পরিস্থিতিতে *আগামীকাল আমার পরীক্ষা আছে* এর অর্থ হতে পারে তুমি আমাকে বিরক্ত করো না অথবা তুমি এখন এখান থেকে চলে যাও । কাজেই *খুব গরম লাগছে* এবং *আগামীকাল আমরা পরীক্ষা আছে* এধরনের উক্তি অস্পষ্ট । তেমনি প্রেমিকপ্রেমিকার এ ধরনের কথাও ইঙ্গিতে ভরা এবং অস্পষ্ট ঃ

সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিমঞ্চে চমৎকার নাটক আছে ।
তোমার ঠোঁট দুটো খুব সুন্দর ।
আজ বাসায় কেউ নেই ।

অষ্টমত, সাংকেতিক ভাষার ব্যবহারেও কথা অস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে । বিশেষ পেশা বা গোষ্ঠীর লোকজন কথোপকথনে নিজস্ব সংকেতিকভাষা ব্যবহার করতে পারে যা অন্যের কাছে অস্পষ্ট মনে হবে । *সোডিয়াম ক্লোরাইড* বললে একজন রসায়নবিদ বোঝেন কিন্তু সাধারণ মানুষ বোঝেন না যে তা খাবার লবন । ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (১৯৯৩) দেখিয়েছেন কিভাবে অপরাধজগতে সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার হয় । নীচে তার বই থেকে কিছু মজার সাংকেতিক শব্দ অর্থসহ উদ্ধৃত করছি ঃ

কে. পি. – কেটে পড়ো
দেঁতো পুঁটি – খুঁদে মাস্তান
ল্যাঙ মারা – প্রেম করে বিয়ে করা
voice change – কিশোরের যৌবনপ্রাপ্তি
টি. সি. ম্যানেজার – টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার

Dhaka University Institutional Repository

মেল – যে মেয়ে জোর কদমে হাঁটে
কেরোশেডিং – কেরোসিনের অভাব
চামচার হ্যান্ডেল – চামচার চামচা
চন্দ্রবিন্দু হওয়া – মরে যাওয়া
পেঁপেচোর – প্রফেসর
missile – সিগারেট
এম.বি.বি.এস – মা বাবার বেকার সন্তান
ঢুকু – সিঙ্গেল চোর
চেয়ার – নিষ্ক্রিয় সমকামী
ময়লাখোর – সক্রিয় সমকামী
বাবাজি – একশো চাকার নোট
seventy – দেশি মদ
পেয়ারেলাল – যে লোক তার স্ত্রীর অসুদপায়ে অর্জিত টাকার উপর নির্ভর করে
মাছি – পুলিশ, পুলিশের গুপ্তচর
বি. এইচ. এম. এইচ – বড় হলে মাল হবে
গরম গরম / খাই খাই – কামপ্রবন মেয়ে

নবমত, কোন কোন অস্পষ্টতা সংজ্ঞাকরণের সাথে সম্পৃক্ত । এমন অনেক ধারণা আছে যাদের কোন সর্বজনস্বীকৃত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, ফলে অস্পষ্টতা দেখা দেয় । *ধর্ম* -এর কথা ধরা যাক । আমরা একে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবো এবং কি কি শর্ত প্রতিপালন করলে আমরা বলবো যে এটি ধর্ম এবং ওটি ধর্ম নয় । ব্যাপারটি তলিয়ে দেখা যাক । প্রথমে আমরা আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈয়ার করতে পারি যার প্রেক্ষিতে বলা সম্ভব হবে কোন কিছু ধর্ম কিনা বা কি মাত্রায় ধর্ম । আমরা নিম্নলিখিত নয়টি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করতে পারি (Alston 1964:88) ঃ

১. অতিপ্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাস (যেমন ঈশ্বর, দেবতা, ফেরেশতা) ।
২. পবিত্র এবং অপবিত্র জিনিসের মধ্যে পার্থক্যকরণ ।
৩. পবিত্র জিনিস কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান ।
৪. ঐশ্বরিক সত্তা দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক বিধান ।
৫. বিশেষ ধরনের ভয়, শ্রদ্ধা, অপরাধবোধ, রহস্যবোধ যা আধ্যাত্মিক ধারণা বা কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ।
৬. প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের অন্যান্য প্রক্রিয়া ।
৭. একটি বিশ্বের ধারণা যেখানে সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ চিত্রিত ।
৮. বিশ্বের ধারণার আলোকে জীবন পরিচালনা ।
৯. একটি সামাজিক গোষ্ঠী যারা বিশেষ নীতিমালার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ ।

এসমস্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে স্পষ্টতঃই বলা যায় *ইসলাম, খ্রীষ্টবাদ, হিন্দুবাদ* প্রভৃতি ধর্ম । কিন্তু *বৌদ্ধধর্ম* -এর ব্যাপারে কি বলবো ? এর মধ্যে তা কোন অতিপ্রাকৃতিক সত্তায় (১ নং বৈশিষ্ট্য) বিশ্বাস নেই । তাহলে কি এটি

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম নয় ? আমরা যদি মনে করি ১ নং বৈশিষ্ট্য বা শর্ত শিথিলযোগ্য অর্থাৎ ধর্মের জন্য অতিপ্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাস অপরিহার্য নয় তাহলে *বৌদ্ধধর্ম* ধর্ম হিসাবে গণ্য হবে । কিন্তু তখন কি *মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদ* প্রভৃতিকেও ধর্ম বলে মানতে হবে না ? *মানবতাবাদকে* আমরা কি বলবো – ধর্ম না নিছক মতবাদ ? *সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র* এগুলোও কি কোনভাবে বা কিছু মাত্রায় ধর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে ? সম্রাট আবর *দীন-ই-ইলাহী* প্রচার করেছিলেন, যদিও তা সফল হয়নি । একে কি আমরা ধর্ম হিসাবে মেনে নিবো ? সকল দার্শনিকের এবং ব্যাপক অর্থে প্রতিটি মানুষের রয়েছে স্বতন্ত্র জীবনদর্শন যাকে আমরা মাঝে মাঝে ব্যক্তিধর্ম বলি, তা কি আসলে ধর্ম ? এসমস্ত প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট জবাব নেই, এতে বোঝা যায় *ধর্ম* শব্দটি কতটা অস্পষ্ট । ঠিক একইভাবে *সত্য ন্যায়, মুল্য, সমাজ, জাতি* প্রভৃতি শব্দও সংজ্ঞাজনিত অনির্দিষ্টতার কারণে অস্পষ্ট ।

দশমত, কোন কোন শব্দ অস্পষ্ট হয়ে উঠে পরিমান বা মাত্রাগত অনির্দিষ্টতার কারণে । যেমন শহর (city) এবং নগর (town) এর মধ্যে পার্থক্যটি কোথায় ? কেউ হয়তো বলতে পারেন জনসংখ্যার দিক দিয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য হয় । একটি শহরে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার লোক থাকবে, এর নীচে হলে তা হবে নগর । কিন্তু পঞ্চাশ হাজারের একটি লোক কম হলে শহর নগর হয়ে যাবে আর উপপঞ্চাশ হাজার নয়শত নিরানব্বই জনের চেয়ে একটি লোক বেশি হলে নগর শহর হয়ে যাবে তা কি খুব একটা গ্রহণযোগ্য ? *টিবি, টিলা, পাহাড়, পর্বত* -এর পার্থক্যটি কোথায় ? সবাই হয়তো বলবে টিবির চেয়ে টিলা উঁচু, টিলার চেয়ে পাহাড় উঁচু এবং পাহাড়ের চেয়ে পর্বত উঁচু কিংবা এভাবে এরা পরস্পরের চেয়ে পরিমানগতভাবে বড় । কিন্তু কেউ কি সঠিরভাবে বলতে পারবে ঠিক কতফুট উঁচু হলে কোনকিছুকে আমরা টিবি, টিলা, পাহাড় বা পর্বত বলবো, কিংবা কোন্‌টির জন্য কি পরিমান মৃত্তিকা, বালিকণা বা পাথর প্রয়োজন । একটুকু এদিক ওদিক হলেই কি তাদের পরিচয় পাল্টে যাবে ? কেউ কি মেনে নিবে একটি বালিকণা কম বা বেশি হওয়ার কারণে একটি স্তূপ পাহাড় এবং অন্যটি পর্বত বলে গণ্য হবে ? ঠিক একইভাবে *ধনী / দরীদ্র, ঠান্ডা / গরম, অনেক / স্বল্প, আস্তে / জোরে* প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বিভাজনরেখা অত্যন্ত অনির্দিষ্ট, যদিও চরম ক্ষেত্রে তাদের সনাক্ত করতে কোন অসুবিধা নেই ।

অস্পষ্টতা দূর করার জন্য অনেকরকম প্রস্তাব আছে । তার মধ্যে পরিমানবাচক পদ্ধতিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এক্ষেত্রে কোন কিছুর পরিমান বা মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে বিশেষ পরিমান বা মাত্রার হলে কোনকিছুকে এই বা ওই বলে গণ্য করতে হবে । যেমন দরীদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনীর পার্থক্য নির্ণয়ে বলা যেতে পারে কারো বাৎসরিক আয় বারো লাখ টাকার উপরে হলে সে ধনী, বারো লাখ টাকার নীচে কিন্তু ষাট হাজার টাকার উপরে হলে সে মধ্যবিত্ত এবং ষাট হাজার টাকার নীচে হলে সে দরিদ্র । একইভাবে বলা যেতে পারে কারো বয়স আঠারো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে হলে সে যুবক, একচল্লিশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে হলে মধ্যবয়সী এবং ষাট বছরের উপরে হলে বৃদ্ধ বলে গণ্য হবে । যদিও সব ক্ষেত্রে এভাবে অস্পষ্টতা দূরীকরণ সম্ভব নয়, তথাপি এরকম পরিমানবাচক সুনির্দিষ্টকরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । কোন বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত বা সুশৃঙ্খল আলোচনার জন্য এটি একান্ত আবশ্যক । এর প্রায়োগিক গুরুত্বও কম নয় । যেমন ডাক্তার কারো শরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার উপরে গেলে একে জ্বর বলে চিহ্নিত করেন এবং তদনুযায়ী ঔষধ দেন । সরকার নাগরিকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট আয় অনুযায়ী কর আদায় করে থাকেন । আমদানী রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্ধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত বিশেষ শ্রেণীর দ্রব্যের উপর বিশেষ পরিমান শুল্ক আদায় করা হয় । বিচারকগণও অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সুসংজ্ঞায়িত প্রচলিত আইনের অধীনে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন ।

একটি ব্যাপার আমাদের খেয়াল করা প্রয়োজন যে অস্পষ্টতা অবাস্থিত হতে পারে, কিন্তু সব পরিস্থিতিতে তা অনাকাঙ্খিত নয় । সাহিত্যে allusion বা *ইঙ্গিতে উল্লেখ* একটি উঁচুমানের শিল্প হিসাবে বিবেচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

অস্পষ্টতা অনেক সময় কোন্দল বা তিক্ততা থেকে রক্ষা করে । কারো পান খাওয়ার অভ্যাসের সমালোচনা করে যদি বলা হয় *পান খাওয়ার বিশ্রি অভ্যাসটা ছেড়ে দিন মশায়* তাহলে তা তিক্ততায় ইন্ধন যোগাতে পারে । কিন্তু যদি ঘুরিয়ে বলা হয় *আমি শুনেছি পান খেলে নাকি কি সব সমস্যা হয়* তাহলে আর তিক্ততার ভয় থাকে না । যুদ্ধাবস্থায় অস্পষ্টতা একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায় । পাকভারত যুদ্ধের সময় ভারত যদি বলে *আগামীকাল ঠিক দশটা দশ মিনিটে কাশ্মীর বিমান ঘাঁটি থেকে ইসলামাবাদের উপর দশটি পৃথ্বী ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করা হবে* তাহলে পাকিস্থান হয়ত তার আগেই কাশ্মীর বিমান ঘাঁটি আক্রমন করে বসে থাকবে । যুদ্ধ পরি স্থিতিতে তাই অস্পষ্ট কথায় প্রতিপক্ষকে শাসানো হয়, যেমন – *উচিত শিক্ষা দেয়া হবে, আক্রান্ত হলে আমরাও ছেড়ে দেবো না, যুদ্ধের জন্য আমরাও প্রস্তুত আছি* ইত্যাদি । পরিশেষে, কোন কোন বিষয় আছে যেখানে অস্পষ্টতা শুধু আকাঙ্খিতই নয়, এটি নৈতিকতার মাপকাঠি । যৌন বিষয়ে খোলামেলা আলাপকারীকে আর যাই বলুক কেউ অন্ততঃ ভদ্র বলবে না ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যা

চমস্কির রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের পথ ধরে বাগর্থবিদ্যার যে ধারাটি বিকশিত হয়েছে আমরা তাকে বলি রূপান্তর মূলক বাগর্থবিদ্যা । রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যা দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে – একটি ব্যাখ্যামূলক এবং অপরটি সঞ্জননী । চমস্কি নিজে বাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার সমর্থক । তার সাথে আছেন ক্যাট্‌জ, ফোডর প্রমূখ । অন্যদিকে সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার এ্যাডভোকেটরা হলেন ম্যাকলে, ল্যাকফ, পোস্টাল, রস প্রমূখ । আরো অনেক বাগর্থবিদই কোন না কোন পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, যদিও প্রত্যেকের প্রস্তাবনাতেই কিছু নিজস্বতা আছে । আমরা রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যাকে ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যা ও সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা এই দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো এবং তাদের বিকাশের ধারায় বিভিন্ন বাগর্থবিদদের অবদান নির্ণয় করবো । কিন্তু তার আগে আমরা রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যার পটভূমি স্বল্প পরিসরে বিধৃত করবো ।

রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যার পটভূমি

চমস্কির Syntactic Structures (1957)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ভাষাবিজ্ঞানের ময়দানটি ছিল মূলতঃ সংগঠনবাদীদের দখলে যারা বাগর্থবিদ্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন । চমস্কিই প্রথম ঘোষণা করেন যে সামগ্রিক ভাষা সংগঠনে বাগর্থিক সংগঠনের একটি স্থান রয়েছে । বাগর্থিক তত্ত্ব সামগ্রিক ভাষিক তত্ত্বের একটি অংশ এবং সেই বাগর্থিক তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধানই বাগর্থবিদদের কাজ । যদিও চমস্কি তার রূপান্তরমূলক ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্বের স্বনির্ভরতা ও বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দেন তথাপি তিনি বাগর্থিক তত্ত্বায়নের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানান । তিনি বলেন, "অন্য কথায় বিচ্ছিন্ন ও ব্যাকরণপ্রদর্শিত ভাষার বাক্যতাত্ত্বিক কাঠামো বাগর্থিক বর্ণনাকে সমর্থন করবে আমাদের তাই চাওয়া উচিত এবং রৌপিক সংগঠনের যে তত্ত্ব এমন ব্যাকরণের দিকে চালিত হয় যা এই প্রয়োজন আরো ভালোভাবে মিটায় তাকেই আমাদের স্বাভাবিকভাবে উচ্চমূল্য দেয়া উচিত ।" ●

রূপান্তরমূলক ব্যাকরণে চমস্কি ভাষাকে দুটি স্তরে বিশ্লেষণ করার প্রস্তাব করেন – অন্তঃবর্তী ও বহিঃবর্তী । তিনি অন্তবর্তী স্তরের নাম দেন **গভীর সংগঠন** এবং বহিঃবর্তী স্তরের নাম দেন **উপরি সংগঠন** । গভীর সংগঠন রূপান্তরমূলক নিয়মের মাধ্যমে উপরি সংগঠনের সাথে যুক্ত হয় । তিনি দেখান উপরি সংগঠনে দুটি বাক্য গভীর সংগঠনে একটি বাক্যের সাথে যুক্ত হতে পারে (সমার্থকতার ক্ষেত্রে) এবং উপরি সংগঠনে একটি বাক্য গভীর সংগঠনে দুটি বাক্যের সাথে যুক্ত হতে পারে (দ্ব্যর্থকতার ক্ষেত্রে) । এ থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে বাক্য বিশ্লেষণে অর্থের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ।

● "In other words we should like the syntactic framework of the language that is isolated and exhibited by the grammar to be able to support semantic description, and we shall naturally rate more highly a theory of formal structure that leads to grammars that meets this requirement more thoroughly." Noam Chomsky (1957), *Syntactic Structures*, p.102

Dhaka University Institutional Repository

চমস্কির Syntactic Structures -এ বাক্যতত্ত্বের সাথে বাগর্থতত্ত্বের সংযুক্তির কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। ফলে অনেকেই নতুনভাবে তাত্ত্বিক রূপায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তারা একদিকে বাক্যতত্ত্ব ও বাগর্থতত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয় এবং অন্যদিকে তার মাধ্যমে সামগ্রিক ভাষিক কাঠামোর ভিতর অর্থের স্থান পাকাপোক্তকরণে প্রয়াসী হন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ক্যাটজ এবং ফোডর। ক্যাটজ এবং ফোডরের যৌথ প্রয়াসে ১৯৬৩ সালে বের হয় The Structure of a Semantic Theory যা ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার শুভসূচনা করে।

ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যা

ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার মূল বিষয়টি ছিল বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যাত হবে উপরি সংগঠনে গভীর সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে। নীচে ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার প্রধান প্রবক্তাদের তত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

ক্যাটজ ও ফোডরের তত্ত্ব ঃ ক্যাটজ ও ফোডর (১৯৬৩) -এর মতে বাগর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য হলো মানুষের ভাষিক যোগ্যতার বিশেষ দিক যা অর্থের উপলব্ধি বা নির্ধারণের সাথে যুক্ত তার ব্যাখ্যা প্রদান করা। একটি বাগর্থিক তত্ত্ব নিম্নলিখিত উপায়ে বক্তাদের অর্থনির্ধারনমূলক ক্ষমতার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকে (Katz & Fodor 1963: 169) ঃ

১. কোন বাক্যের অর্থ কি ও কয়টি তা নির্ধারণের মাধ্যমে,
২. বাগর্থিক অসামঞ্জস্য সনাক্তকরণের মাধ্যমে,
৩. বিভিন্ন বাক্যসমুহের মধ্যে বাক্যান্তর সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এবং
৪. অন্য যে কোন বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বা সম্পর্ক যা ব্যাখ্যামূলক ক্ষমতায় কোন ভূমিকা রাখে তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে।

ক্যাটজ ও ফোডর ভাষার বাগর্থিক বর্ণনার জন্য দুই ধরনের উপাদানের কথা বলেন – একটি অভিধান এবং একগুচ্ছ প্রক্ষেপন নিয়ম। অভিধানে শব্দ বা এন্ট্রির অর্থের বর্ণনা থাকে এবং প্রক্ষেপন নিয়মে সেই শব্দগুলো কিভাবে ব্যকরণসম্মতভাবে দ্ব্যর্থকতা উৎপাদন না করে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হবে তার বর্ণনা থাকে।

ক্যাটজ ও ফোডরের মতে প্রতিটি এন্ট্রিতে থাকে ঃ (১) একটি বাক্যিক শ্রেণীকরণ, (২) একটি বাগর্থিক বর্ণনা, ও (৩) তার ব্যবহারগত সঙ্গতির বিবৃতি। বাক্যিক শ্রেণীকরণে অন্তর্ভূক্ত থাকে বাক্যতাত্ত্বিক চিহ্নকের একটি অনুক্রম, যেমন – বিশেষ্য, বিশেষ্য মূর্ত, ক্রিয়া, ক্রিয়া সকর্মক ইত্যাদি। বাগর্থিক বর্ণনায় অন্তর্ভূক্ত থাকে বাগর্থিক চিহ্নকের একটি অনুক্রম যার উপর প্রক্ষেপন নিয়ম ক্রিয়া করে দ্ব্যর্থকতা হ্রাস করে। একটি এন্ট্রির অনেকার্থকতা বাগর্থিক চিহ্নকের (বাচি) পথে শাখাবিভক্তির আকারে প্রকাশিত হয়, যেমন ঃ

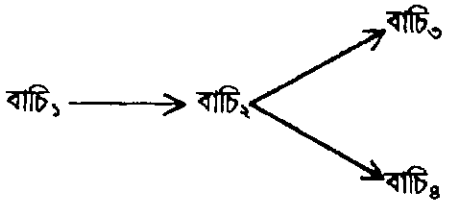

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার অভিধান থেকে এবার আমরা *কিশোর* শব্দটিকে বিশ্লেষণ করতে পারি । ব্যাকরণিকভাবে এটি বিশেষ্য (যেমন- দুরন্ত কিশোর) অথবা বিশেষণ (যেমন- কিশোর বয়স / উপন্যাস) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে । বাগর্থিকভাবে এটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে মানুষ প্রাপ্তবয়স্কও নয়, শিশুও নয় (আমরা লিঙ্গভেদ উপেক্ষা করছি) । ফলে আমরা লিখতে পারি ঃ

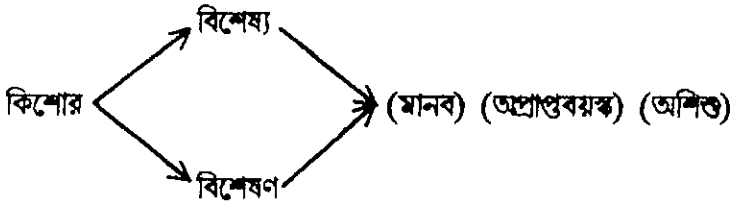

এবার যদি আমরা *একটি কিশোর দৌড়াচ্ছে* এই বাক্যের কিশোরের কথা ধরি তাহলে দেখবো এখানে *কিশোর* বাক্যের বা বাক্যস্থ ক্রিয়ার কর্তা । বাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহের অর্থ বর্ণনায় সময় তাই এরূপ তথ্যও বাগর্থিক চিহ্নকের সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন । ফলে আলোচ্য বাক্যে *কিশোর* -এর অর্থের বর্ণনা হবে এরকম ঃ

কিশোর → বিশেষ্য → (মানব) (অপ্রাপ্তবয়স্ক) (অশিশু) < উদ্দেশ্য >

কৌণিক বন্ধনীর ভিতর আবদ্ধ এ ধরনের নিয়মকে বলা হয় **সঙ্গতিবিধি** । কাজেই দেখা যায় কোন শব্দের বাক্যতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক চিহ্নক, এবং সঙ্গতিবিধি শব্দটির বাক্যে ব্যবহারের উপর কিছু বিধিবিধান আরোপ করে যাতে শব্দের সমবায়ে সুনির্দিষ্ট অর্থযুক্ত ব্যকরণসম্মত বাক্য তৈরী হয় । প্রক্ষেপন নিয়মের সাহায্যে এই বিধিবিধান আরো নিশ্চিত হয় । এবার প্রক্ষেপন নিয়ম কিভাবে কাজ করে দেখা যাক । বিশ্লেষণের জন্য আমরা The man hits the colourful ball এই ইংরেজী বাক্যটি নিতে পারি । এর বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এতে The man উদ্দেশ্য এবং hits the colourful ball বিধেয় । উদ্দেশ্য গঠিত একটি ডিটারমিনার ও একটি মূর্ত বিশেষ্য সহযোগে । বিধেয়টি একটি ক্রিয়া শব্দগুচ্ছ যা একটি সকর্মক ক্রিয়া ও একটি বিশেষ্য শব্দগুচ্ছ নিয়ে গঠিত । বিশেষ্য শব্দগুচ্ছটি আবার একটি ডিটারমিনার, একটি বিশেষণ ও একটি মূর্ত বিশেষ্য নিয়ে গঠিত । বাক্যটির গঠনচিত্র এভাবে দেখানো যায় ঃ

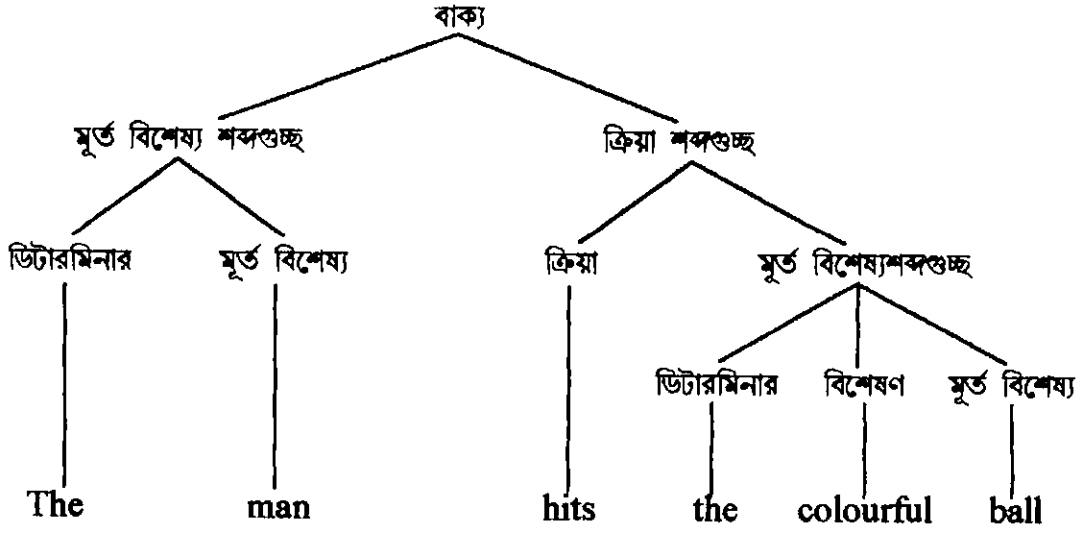

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই আমরা প্রান্তিক গ্রন্থি হিসাবে পাচ্ছি – The, man, hits, the, colourful, ball । এই শব্দগুলো যাতে অব্যাকরণসম্মতভাবে সম্মিলিত না হয় তার জন্য রয়েছে উপশ্রেণীকরণ নিয়ম, যেমন ঃ

$S \rightarrow NP + VP$
$VP \rightarrow V + NP$
$NP \rightarrow (Det) + (Adj) + N$
$V \rightarrow$ hits
$N \rightarrow$ man, ball
$Adj \rightarrow$ colourful
$Det \rightarrow$ the

এই নিয়মগুলো অব্যকরণসম্মত বাক্যের উৎপাদন রোধ করে বটে, কিন্তু এগুলো অসমঞ্জস বাক্যের উৎপাদন রোধ করতে পারে না । ফলে উক্ত নিয়মগুলো লঙ্ঘন না করেও আমরা এ ধরনের বাক্য পাই (এগুলো এই অর্থে অসমঞ্জস যে এগুলো আমাদের কাম্য বাক্য নয়) ঃ

The ball hits the colourful man.
The colourful ball hits the man.
The colourful man hits the ball

এ ধরনের বাক্যের উৎপাদন রোধ করে আমাদের কাম্য বাক্যটি পেতে হলে যা করতে হবে তাহলো প্রতিটি শব্দের বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা । যেমন বলা প্রয়োজন hit এখানে অন্বেচ্ছাকৃত আঘাত বোঝাচ্ছে, colourful এখানে বস্তুর চাকচিক্য বোঝাচ্ছে ইত্যাদি । যেমন ক্যাট্‌জ ও ফোডর দেখান ঃ

colourful → বিশেষণ → (বর্ণ) → [রঙচঙে] <নিষ্প্রাণ ভৌত বস্তু>
colourful → বিশেষণ → (মূল্যায়ন) → [বৈশিষ্ট্যমন্ডিত] <নান্দনিক বস্তু>

hits → ক্রিয়া → সকর্মক ক্রিয়া → (কাজ) → (তাৎক্ষণিকতা) → (বলপ্রয়োগ) → [সংঘর্ষ হওয়া] <উদ্দেশ্য ঃ [ভৌত বস্তু], কর্ম ঃ [ভৌত বস্তু]>
hits → ক্রিয়া → সকর্মক ক্রিয়া → (কাজ) → (তাৎক্ষণিকতা) → (বলপ্রয়োগ) → [আঘাত করা] <উদ্দেশ্য ঃ [মানুষ বা উচ্চস্তরের প্রাণী], কর্ম ঃ [ভৌতবস্তু]>

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দেখা যায় কোন কোন বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য প্রথম বন্ধনীর ভিতর এবং কোনো কোনোটি চৌকো বন্ধনীর ভিতর আবদ্ধ । কড়াকড়িভাবে বললে, প্রথম শ্রেণীর বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো বাগর্থিক চিহ্নক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য গুলো হলো প্রভেদক যা শব্দের স্বাতন্ত্রিকতার নির্দেশক ।

যাহোক, এভাবে শব্দপথ দেখানো থাকলে নির্দিষ্ট বাক্যের জন্য শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ বেছে নেয়া যায়, যার ফলে অনাকাঙ্খিত বাক্যের উৎপাদন বন্ধ হয় । যেমন এক্ষেত্রে আমরা hits এর জন্য বেছে নেবো দ্বিতীয় পথটি এবং colourful এর জন্য বেছে নেবো প্রথম পথটি, যার ফলে বাক্যের উদ্দেশ্যরূপে ball আসতে পারবে না এবং man এর সাথে colourful ব্যবহৃত হতে পারবে না । তার ফলেই কেবল আমরা আমাদের নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত ব্যাকরণসম্মত কাম্য বাক্যটি লাভ করবো ।

ক্যাট্জ ও ফোডর (১৯৬৩) এভাবেই বাক্যের অর্থের একটি মোটামুটি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করেন । এই তত্ত্বের উপর এরপর কাজ করেন ক্যাট্জ ও পোস্টাল (১৯৬৪) । তারা বলেন যে গভীর সংগঠন হলো একটি বাক্যের বাগর্থিক ব্যাখ্যার জন্য যে সব মালমশলা প্রয়োজন তার চিত্রায়ন । এর ফলে গভীর সংগঠন থেকে একদিকে যেমন ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বেড়িয়ে আসবে, অন্যদিকে তেমনি বেড়িয়ে আসবে বাগর্থিক ব্যাখ্যা । কোন বাক্যের অর্থনির্ধারণের জন্য গভীর সংগঠনই ইনপুট হিসাবে কাজ করবে । তাদের এ বক্তব্যে চমস্কি (১৯৬৪ ঃ ১০) সমর্থন প্রদান করেন এবং বলেন ঃ

> এভাবে বাক্যতাত্ত্বিক উপাদান প্রতিটি বাক্যের জন্য (প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি ব্যাখ্যার জন্য) আবশ্যিভাবে সরবরাহ করবে একটি বাগর্থিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য গভীর সংগঠন এবং একটি ধ্বনিবৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য উপরি সংগঠন এবং এদুটি পৃথক সংগঠনের সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান করবে । ●

এর প্রতিফলন ঘটে চমস্কির Aspects of the Theory of Syntax (1965)-এ । এতে তিনি রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের যে প্রমিত রূপ নির্ধারণ করেন তাতে বাগর্থবিদ্যার অবস্থান সুসংগত হয় । প্রমিত তত্ত্বের কাঠামোটি সংক্ষেপে এরকম ঃ একটি ব্যাকরণের থাকবে তিনটি উপাদান ঃ বাক্যতাত্ত্বিক উপাদান, বাগর্থিক উপাদান এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান বাক্যতাত্ত্বিক উপাদান গঠিত হবে একটি ভিত্তি এবং একটি রূপান্তরমূলক উপাদানের সমন্বয়ে । ভিত্তি আবার গঠিত হবে একটি শ্রেণীমূলক উপউপাদান এবং একটি শব্দকোষ সমবায়ে । ভিত্তি সঞ্জনন করবে গভীর সংগঠন । একটি গভীর সংগঠন বাগর্থিক উপাদানে প্রবেশ করবে এবং বাগর্থিক ব্যাখ্যা অর্জন করবে । গভীর সংগঠন আবার রূপান্তরমূলক নিয়মের সাহায্যে উপরি সংগঠনে মানচিত্রায়িত হবে যা ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদানের নিয়মাবলী মারফত ধ্বনিবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হবে (চমস্কি ১৯৬৫ ঃ ১৪১) । প্রমিত তত্ত্বের সংগঠনকে নিম্নরূপ চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় (Lyons 1977: 412) ঃ

● "Thus the syntactic component must provide for each sentence (actually, for each interpretation of each sentence) a semantically interpretable *deep structure* and a phonetically interpretable *surface structure*, and in the event that these are distinct, a statement of the relation between these structures." Noam Chomsky (1964), *Current Issues in Linguistic Theory*, p. 10.

Dhaka University Institutional Repository

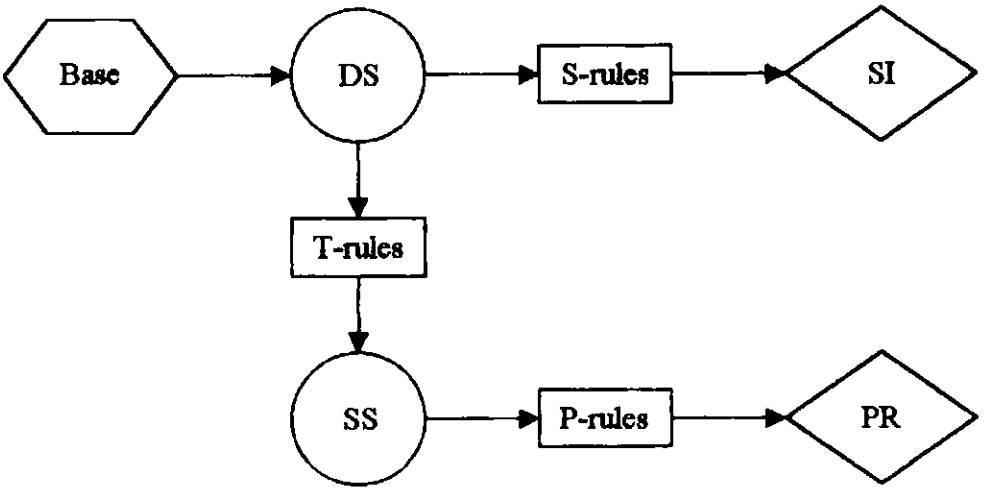

প্রমিত তত্ত্বের সংগঠন

এখানে Base = ভিত্তি
DS = গভীর সংগঠন
SS = উপরি সংগঠন
S-rules = বাগর্থিক নিয়মাবলী
T-rules = রূপান্তরমূলক নিয়মাবলী
P-rules = ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মাবলী
SI = বাগর্থিক ব্যাখ্যা
PR = ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা

প্রমিত তত্ত্বের গভীর সংগঠনের রূপায়নটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এটি একাধারে বাগর্থিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ভিত্তিরূপে কাজ করে। এর উপর একদিকে কাজ করে বাগর্থিক নিয়মাবলী (ক্যাটজ ও ফোডরের প্রক্ষেপন নিয়মাবলী) এবং অন্যদিকে কাজ করে রূপান্তরমূলক নিয়মাবলী। ফলে এর উপর বোঝা অনেক। প্রমিত তত্ত্বে গভীর সংগঠনের সংজ্ঞা অনুসারে ঃ

(১) এটি হলো শব্দগুচ্ছ সংগঠন নিয়মের আউটপুট,
(২) এটি হলো রূপান্তরমূলক নিয়মের ইনপুট,
(৩) এই স্তরে উদ্দেশ্য, বিধেয়, ক্রিয়া, কর্ম প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক বিধৃত হয়,
(৪) এই স্তরে শব্দীয় উপাদান প্রবিষ্ট হয়,
(৫) এই স্তরের উপর সঙ্গতিবিধি ক্রিয়াশীল হয়,
(৬) এই স্তরে দ্ব্যর্থকতাকে চিহ্নিত করা হয়, এবং
(৭) এই স্তর বাগর্থিক উপাদানের জন্য ইনপুটস্বরূপ।

গভীর সংগঠনের এরূপ জটিল চিত্রায়নের পরিণতি হলো এই যে এটি তার খাঁটি বাক্যতাত্ত্বিক চরিত্র হারায় (যে খাঁটি বাক্যতাত্ত্বিক চরিত্রের প্রতি চমস্কি মৌলিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন) এবং বাগর্থিক সংগঠনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় (Kempson 1977: 164)।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে চমস্কি, ক্যাট্‌জ ও পোস্টালের অবস্থান এক সমতলে। তারা সকলেই একমত যে অর্থ নির্ধারিত হওয়া উচিত গভীর সংগঠন থেকে ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ায়। অনেকে একত্রে তাদের তত্ত্বকে বলেন *চমস্কি-ক্যাট্‌জ-পোস্টাল মডেল*, সংক্ষেপে **সিকেপি মডেল** (দ্রষ্টব্য King 1976: 74)। তবে ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যায় ক্যাট্‌জ ও ফোডর (১৯৬৩) -এর তত্ত্বটি বেশি আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। ভাইনরাইখ (১৯৭২ ঃ ৪২-৪৩) -এর মতে ক্যাট্‌জের তত্ত্বের তিনটি বড় সমস্যা হলো ঃ প্রথমত, এটি আচরণবাদী সমীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, এটি ভাষা ব্যবহারকারীদের বুদ্ধির মাত্রাভেদকে উপেক্ষা করে। এবং তৃতীয়ত, এটি ভাষিক বিচ্যুতিকে কেবল শ্রোতার সাথে সম্পৃক্ত করে বিবেচনা করে। তাই তিনি বলেন, "এভাবে দেখা যায় যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে অভিপ্রায়মূলক কৌশলে ব্যাখ্যা করতে ক্যাট্‌জের তত্ত্ব সম্পূর্ণ অক্ষম।"●

আব্রাহাম ও কেইফার (১৯৬৬ ঃ ১৬-১৯) ক্যাট্‌জ ও ফোডরের তত্ত্বের সপ্তবিধ দুর্বলতা নির্ধারণ করেন এবং বলেন যে অর্থের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব সফল নয়। ক্যাট্‌জ ও ফোডরের তত্ত্বের নানারূপ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বাগর্থবিদ্যার জন্য তার তত্ত্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই সর্বপ্রথম বাগর্থিক তত্ত্বকে একটি সামগ্রিক ভাষিক তত্ত্বের অধীনে এনে বিশ্লেষণের প্রয়াস পান। তিনি তার মিশনে সম্পূর্ণ সফল না হলেও তার আংশিক সাফল্যকে অস্বীকার করা যায় না। তার তত্ত্ব বাগর্থবিদ্যার গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। তাই বাগর্থিক তত্ত্ব হিসাবে পূর্ণাঙ্গ না হলেও ক্যাট্‌জ ও ফোডরের তত্ত্ব বাগর্থবিদ্যার লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ (Hayes 1976: 51)।

ক্যাট্‌জ (১৯৬৬) এবং পরবর্তী অবস্থা ঃ ক্যাট্‌জ (১৯৬৬) দার্শনিক সমস্যা সমাধানে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন এবং তাতে বাগর্থিক তত্ত্বের ভূমিকা নির্ধারণ করেন। এতে ভাষিক তত্ত্বের সংগঠনটি প্রমিত তত্ত্বের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। এখানে একটি ভিত্তি নিয়ে গঠিত বাক্যতাত্ত্বিক উপাদান শব্দগুচ্ছ সংগঠন নিয়মের সাহায্যে কোন বাক্যের বাক্যতাত্ত্বিক বর্ণনা পেশ করে। সেই বাক্যের বাক্যতাত্ত্বিক বর্ণনা থেকে রূপান্তরমূলক নিয়মের সাহায্যে একদিকে বাক্যের অন্তর্নিহিত গঠনচিত্র এবং অন্যদিকে বাক্যের সর্বশেষ আহরিত গঠনচিত্র নিঃসৃত হয়। বাক্যের অন্তর্নিহিত গঠনচিত্র থেকে ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ায় বাগর্থিক উপাদান এবং বাক্যের সর্বশেষ আহরিত গঠনচিত্র থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান বেরিয়ে আসে। সবশেষে বাগর্থিক উপাদান এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান একত্রে অর্থোপলব্ধি ও উচ্চারণের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। এটি নীচের চিত্রে প্রদর্শিত হলো (Katz 1966: 150) ঃ

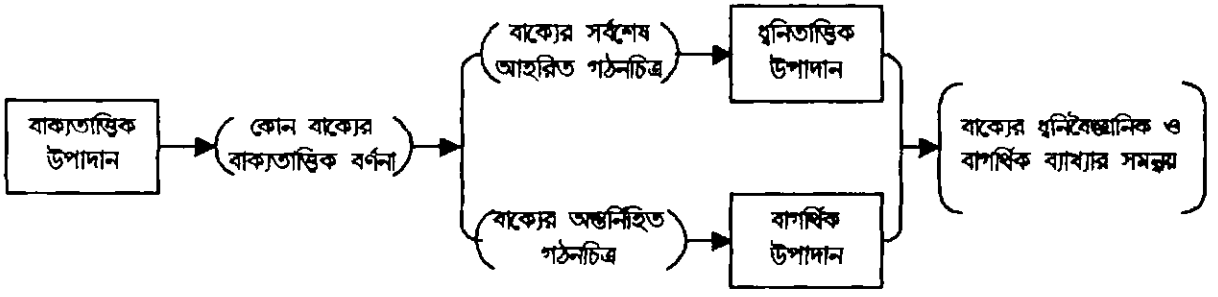

● "Katz's theory is thus completely powerless to deal with intentional deviance as a communicative device." Uriel Weinreich (1972), *Explorations in Semantic Theory*, p.43

Dhaka University Institutional Repository

প্রমিত তত্ত্বে আমরা দেখেছি গভীর সংগঠন ও উপরি সংগঠন স্পষ্টরূপ নির্ধারিত ছিল এবং বাগর্থিক উপস্থাপনার সাথে উপরি সংগঠনের কোন সংযোগ ছিল না। কিন্তু আলোচ্য রূপায়নে গভীর সংগঠন ও উপরি সংগঠন স্পষ্টরূপে চিহ্নিত নয় এবং বাগর্থিক উপাদানকে উপরি সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়। তদুপরি, প্রমিত তত্ত্বে ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা এবং বাগর্থিক উপস্থাপনার অভিমুখ ছিল ভিন্ন। কিন্তু পরিবর্তিত রূপায়নে এরা একই অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। এই তত্ত্বটিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অধিক সুষ্ঠু বলে মনে হয়। বাস্তবে মানুষের মস্তিষ্কে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও বাগর্থিক উপস্থাপনা যুগপৎ সাধিত হয়, বিচ্ছিন্নভাবে নয়।

এখানে বাগর্থিক ব্যাখ্যার প্রক্রিয়াটি মোটামুটি ক্যাট্‌জ ও ফোডর (১৯৬৩) -এর মতোই। বাগর্থিক উপাদানের দুটি অংশ – অভিধান এবং প্রক্ষেপন নিয়ম। অভিধান গঠিত হয় শব্দ বা এন্ট্রির দ্বারা যেখানে এদের অর্থের বর্ণনা থাকে। প্রতিটি শব্দের অর্থ এমনভাবে বর্ণিত হবে যাতে তার উপর প্রক্ষেপন নিয়ম ক্রিয়া করতে পারে। অভিধানে একটি শব্দের অর্থ বর্ণিত হবে এভাবে ঃ প্রথমে শব্দের আক্ষরিক বা বানানমূলক উপস্থাপনা থাকবে, তারপর থাকবে একটি তীরচিহ্ন, তারপর একগুচ্ছ বাক্যতাত্ত্বিক চিহ্নক (যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ, সকর্মক, অকর্মক ইত্যাদি), সবশেষে থাকবে এক বা একাধিক শাব্দিক পাঠ (অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট অর্থ)। প্রতিটি শাব্দিক পাঠে থাকবে বাগর্থিক চিহ্নক (অর্থাৎ শব্দটির অর্থের বর্ণনা) ও সঙ্গতিবিধি (অর্থাৎ কোন শব্দ কোন্ অবস্থান বা কার সাথে ব্যবহৃত হতে পারবে বা পারবে না তার বর্ণনা)। যেমন অভিধানে bachelor শব্দটির বর্ণনা এরকম (Katz 1966: 155) ঃ

bachelor → বিশেষ্য ঃ
ক. (ভৌত বস্তু), (জীবন্ত), (মানব), (ছেলে), (প্রাপ্তবয়স্ক), (অবিবাহিত); <সঙ্গতিবিধি>
খ. (ভৌত বস্তু), (জীবন্ত), (মানব), (যুবক), (*নাইট* উপাধিধারী), (অন্যকারো মানের অধীনে চাকুরীরত); < সঙ্গতিবিধি >
গ. (ভৌত বস্তু), (জীবন্ত), (মানব), (স্নাতক ডিগ্রিধারী); < সঙ্গতিবিধি >
ঘ. (ভৌত বস্তু), (জীবন্ত), (জন্তু), (ছেলে), (সীলমাছ), (প্রজননকালে সঙ্গীহীন) <সঙ্গতিবিধি>

এখানে সঙ্গতিবিধি উল্লেখ করা হয়নি ; কেবল বাক্যে ব্যবহারের সময় তা বর্ণিত হয় (দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৪৬-১৪৭)। একটি বাক্যের শব্দসমূহের উপর প্রক্ষেপন নিয়ম প্রযুক্ত হয়। প্রক্ষেপন নিয়ম শাব্দিক পাঠতালিকা থেকে সঠিক অর্থটি বেছে নেয় এবং তা দিয়ে শব্দগুচ্ছ ও বাক্যের অর্থ নির্ণয় করে। প্রক্ষেপন নিয়ম গঠনচিত্রের নিম্নদেশ (প্রান্তিক গ্রন্থি) থেকে তার কাজ শুরু করে এবং ক্রমানুয়ে উপরের দিকে (অপ্রান্তিক গ্রন্থি – বাক্য পর্যন্ত) যায়। পুরো বাক্যের উপর তার কাজ শেষ হলে আমরা পাই সেই বাক্যের বাগর্থিক উপস্থাপনা। প্রক্ষেপন নিয়ম গঠনচিত্রের গ্রন্থিসমূহে পাঠ আরোপের সময় বিভিন্ন বাগর্থিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে – এতে কোন্ উপাদান অসমঞ্জস, কোন্‌টি দ্ব্যর্থক বা অদ্ব্যর্থক, কোন্‌টি সমার্থক বা স্বতন্ত্র তা বের হয়ে আসে। ক্যাট্‌জ ছয়টি বাগর্থিক সম্পর্কের নিয়ম উল্লেখ করেন যেগুলো নিম্নরূপ (Katz 1966: 171) ঃ

(১) C বাগর্থিকভাবে অসমঞ্জস হবে যদি এবং কেবল যদি এর সাথে কোন পাঠ যুক্ত করা সম্ভব না হয়।
(২) C বাগর্থিকভাবে অদ্ব্যর্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এর সাথে একটিমাত্র পাঠ যুক্ত হয়।
(৩) C বাগর্থিকভাবে দ্ব্যর্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এর সাথে একাধিক পাঠ যুক্ত হয়।
(৪) C_1 এবং C_2 সমার্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এদের সাথে যুক্ত পাঠ পরস্পরকে অধিক্রমন করে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) C_1 এবং C_2 সম্পূর্ণ সমার্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এদের সাথে যুক্ত পাঠ পরস্পরকে পুরোপুরি অধিক্রমন করে ।

(৬) C_1 এবং C_2 বাগর্থিকভাবে স্বতন্ত্র হবে যদি এবং কেবল যদি এদের সাথে যুক্ত পাঠসমূহের অন্তত একটি পরস্পরের থেকে পৃথক হয় ।

এখানে, C = যে কোন গ্রন্থি (বাক্য বা বাক্যীয় উপাদান)

এভাবে ক্যাটজ (১৯৬৬) বাগর্থিক তত্ত্বে পূর্বের চেয়ে অধিক সৌষ্ঠব ও ব্যাপকতা আনয়ন করেন । এরপর ক্যাটজ ১৯৬৭ ও ১৯৭২ -এ আরো কিছু সংশোধনী এনে তার বাগর্থিক তত্ত্বকে আরো উন্নত করার প্রয়াস পান । আমরা এখানে তার দু'একটি বিষয় উল্লেখ করবো । ক্যাটজ (১৯৬৭) সাম্পর্কিক বিশেষণ (যেমন বড়, ছোট, লম্বা, খাটো, ভারী, হালকা) ব্যাখ্যার জন্য *সাম্পর্কিক বাগর্থিক চিহ্নকের* প্রচলন করেন, কারণ এগুলো কেবল বাগর্থিক চিহ্নক দ্বারা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না । সংশ্লিষ্ট একটি নিয়ম হলো এরকম ঃ

$$\left(\left[\begin{matrix}\text{greater}\\ \text{less}\end{matrix}\right] \quad \text{in} \quad \left[\begin{matrix}\text{size}\\ \text{weight}\end{matrix}\right] \quad \text{than} \quad (\text{an average } \Sigma)\right)$$

এখানে Σ নির্ধারিত হবে বাক্যে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট শব্দ দ্বারা । যেমন *আমার হাতিটি বৃহৎ* এই বাক্যে *বৃহত্ত* কেবল হাতির উপর প্রযোজ্য হবে । কাজেই Σ হবে হাতির স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব । Σ তাই হাতির একটি বাগর্থিক চিহ্নকের সমরূপ হবে । স্তরক্রমিক অবস্থানে এটি হবে সবচেয়ে নীচের বাগর্থিক চিহ্নক । যেমন (Catz 1967: 187) ঃ

(ভৌত বস্তু)
↑
(জীবন্ত)
↑
(প্রাণী)
↑
(স্তন্যপায়ী)
↑
(হাতি)

ক্যাটজ (১৯৭২) বাগর্থিক চিহ্নকের ক্ষেত্রে উধ্বলিপির ধারণা প্রচলন করেন । এরফলে শব্দসমূহের মধ্যে প্রতিনামীয় ও অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় । যেমন *ছেলে, মেয়ে, চাচা, চাচী* এদের বাগর্থিক চিহ্নক এভাবে উপস্থাপিত হবে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে ঃ (প্রাণী) (লিঙ্গ$^{ছেলে}$)
মেয়ে ঃ (প্রাণী) (লিঙ্গ$^{মেয়ে}$)
চাচা ঃ (মানব) (আত্মীয়) . . . (লিঙ্গ$^{ছেলে}$)
চাচী ঃ (মানব) (আত্মীয়) . . . (লিঙ্গ$^{মেয়ে}$)

উপরের উর্ধ্বলিপি থেকে বোঝা যায় ছেলে/মেয়ে এবং চাচা/চাচী-র পার্থক্য শুধু লিঙ্গে, অন্যসব বাগর্থিক চিহ্নকের দিক থেকে শব্দজোড় অভিন্ন (Lehrer 1974: 154) ।

ভাইনরাইখের তত্ত্ব ঃ ইউরিয়েল ভাইনরাইখ (১৯৭২) ক্যাটজ ও ফোডরের তত্ত্বের সমালোচনা করে একটি বিকল্প ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব প্রগঠন করেন । তার মতে একটি বাগর্থিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হলো পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত বাক্যের উপাদানসমূহের অর্থ থেকে কিভাবে পুরো বাক্যের অর্থ আহরিত হয় তা বিশ্লেষণ করা ।
ভাইনরাইখের তত্ত্ব অনুসারে একটি ব্যাকরণের ভিত্তি গঠিত হয় একগুচ্ছ পুনরাবৃত্তিমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন শাখাবিভক্তি নিয়মের সমন্বয়ে । এই নিয়মগুলো ব্যাখ্যাত হয় তিন ধরনের প্রতীকের দ্বারা – *শ্রেণী প্রতীক, জটিল প্রতীক* এবং *ফাঁপা প্রতীক* । শ্রেণী প্রতীকের মধ্যে পড়ে বিশেষ্য শব্দগুচ্ছ, ক্রিয়া, বিশেষণ ইত্যাদি । জটিল প্রতীক হলো বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রেণী প্রতীক । ফাঁপা প্রতীক হলো রূপমূল বা শব্দ আরোপনের নির্দেশ । ফাঁপা প্রতীক তিনটি – □, △ এবং ⊙ এবং এগুলোতে সকল শ্রেণী প্রতীক মানচিত্রায়িত হয় । ভিত্তি প্রান্তিকপূর্ব সারি উৎপাদন করে । প্রান্তিকপূর্ব সারি গঠিত হয় ফাঁপা প্রতীকের অনুক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বা জটিল প্রতীকের বৃক্ষচিত্র সহযোগে । যেমন (Weinreich 1972: 81) ঃ

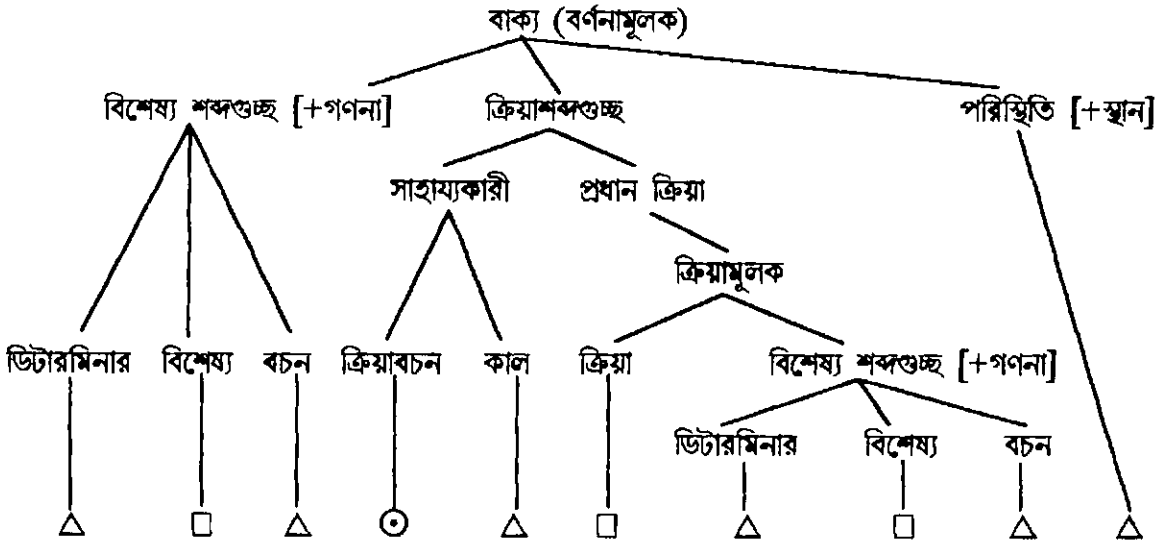

□ অপসারিত হতে পারে বৃহৎ শ্রেণীর (যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া) রূপমূল দ্বারা, △ অপসারিত হতে পারে ক্ষুদ্র শ্রেণীর (যেমন ডিটারমিনার, বচন, কাল) রূপমূল দ্বারা এবং ⊙ কোন রূপমূল দ্বারা অপসারিত হতে পারে না । ভিত্তি থেকে উৎপাদিত অভিধানের শব্দাবলীসহ প্রান্তিকপূর্ব সারি শাব্দিক নিয়মাবলীর ইনপুট ।

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান হলো অবিন্যস্ত রূপমূলের সমষ্টি । অভিধানের একেকটি শব্দ বা এন্ট্রি ত্রিত্ব (P, G, μ) হিসাবে রূপায়িত, যেখানে P হলো ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, G হলো বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং μ হলো বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য । শাব্দিক নিয়ম প্রতীকসমূহের উপর ক্রিয়া করে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করে । কাজেই শাব্দিক নিয়মের আউটপুট হিসাবে বেড়িয়ে আসে একটি সাধারণীকৃত গঠনচিত্র যেখানে সন্নিবেশিত থাকে রূপমূলের সারি এবং ফাঁপা প্রতীক । যেমন (Weinreich 1972: 97) ঃ

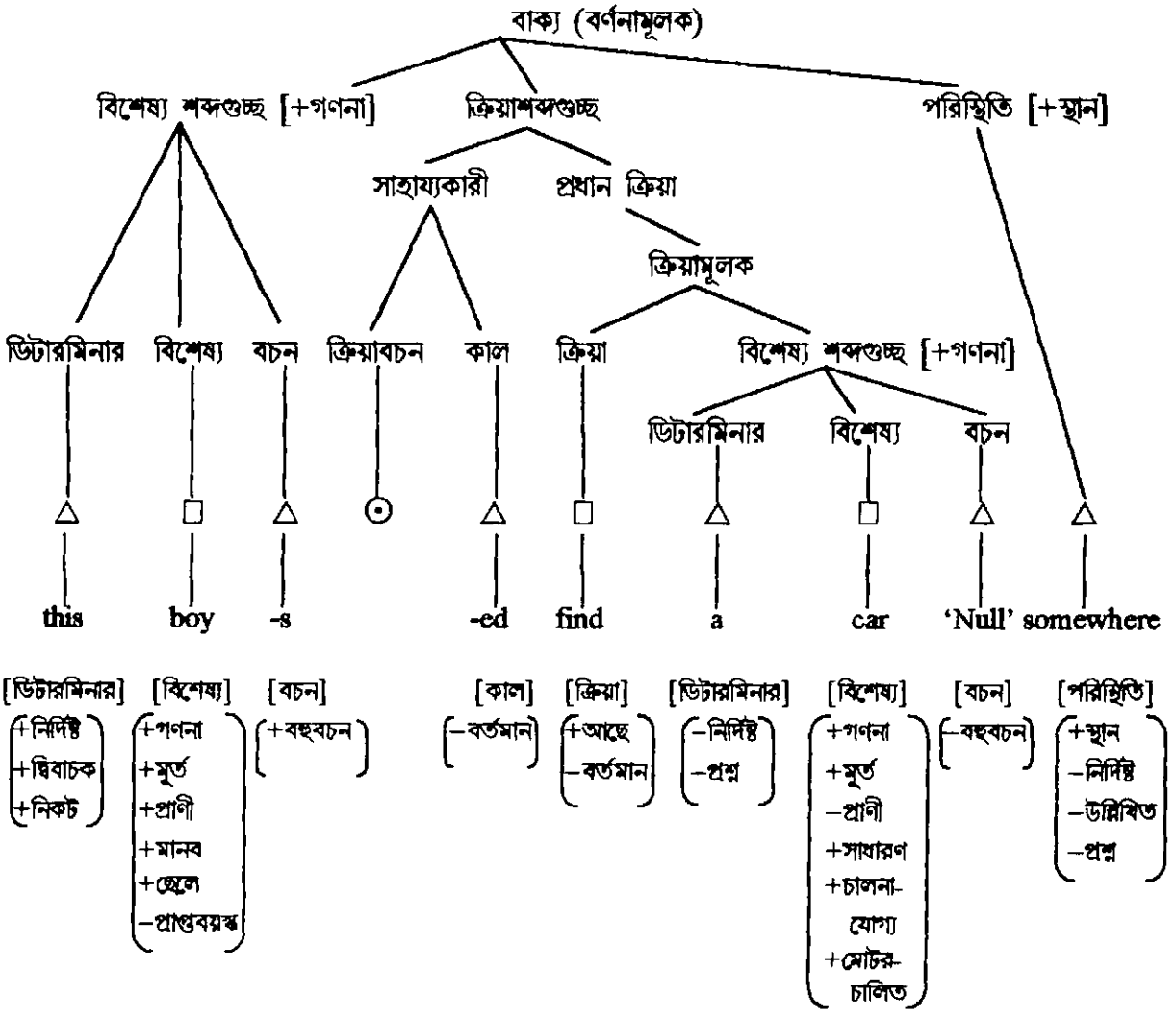

সাধারণীকৃত গঠনচিত্র এরপর দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হয় । একদিকে এর উপর প্রযোজ্য হয় ব্যাকরণের রূপান্তরমূলক নিয়ম ও রূপধ্বনিমূলীয় নিয়ম যার ফলে তা উপনীত হয় উপরি সংগঠনের ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরে । অন্যদিকে সাধারণীকৃত গঠনচিত্র বাগর্থিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে । এই প্রক্রিয়ার দুটি অংশ – *বাগর্থিক গনক* এবং *বাগর্থিক মূল্যায়ক* । গনকের কাজ হলো বৃক্ষচিত্রের শাখাসমূহে বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বন্টন করা, বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য সমূহের স্ববিরোধ সনাক্ত করা, পৌনপুনিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্রীভূত করা, কতক বৈশিষ্ট্য এক রূপমূল থেকে অন্য রূপমূলে স্থানান্তর করা এবং অন্তর্নিহিত গঠনচিত্রের অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেয়া । মূল্যায়কের

Dhaka University Institutional Repository

কাজ হলো পরিপার্শ্বের উপর নির্ভর করে বাক্যের স্বাভাবিকতা বা বিচ্যুতি নির্ণয় করা এবং বাক্যের একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যা ধ্বনিক ঘটনার সাথে যুগপৎ হবে, অথবা একটি অর্থহীন সংকেতনা নির্গত করা যা কোনভাবে ব্যাখ্যাত হবে না। এভাবে আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী বাক্য পাই ঃ

These boys found a car somewhere.

পুরো ভাষিক প্রক্রিয়াটিকে একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় ঃ

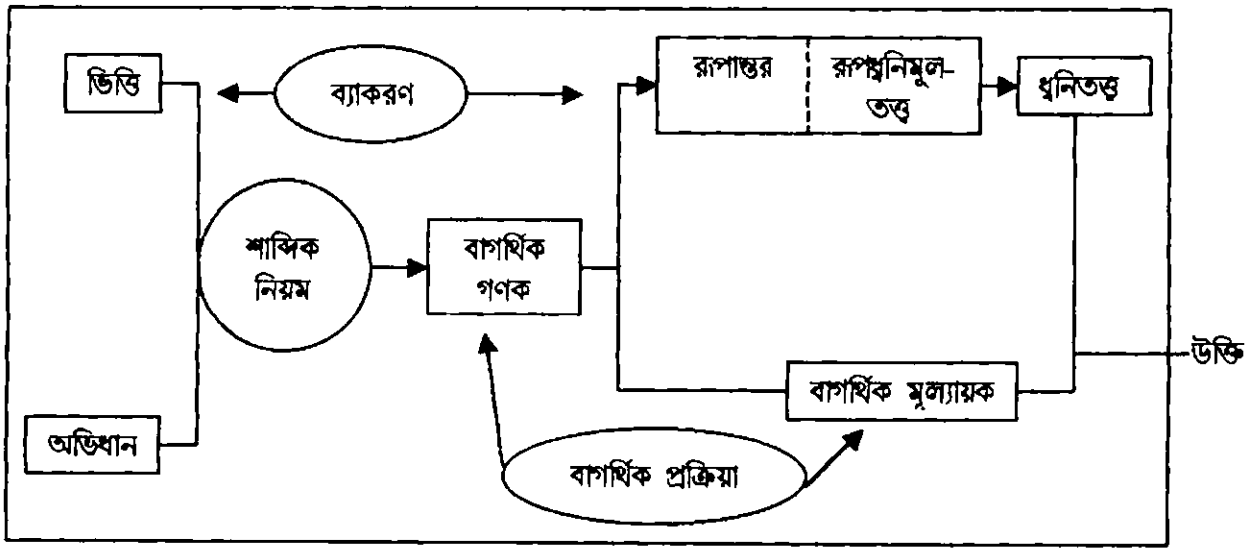

ভাইনরাইখের তত্ত্বের সংগঠন

(Weinreich 1972: 83)

ক্যাটজের তত্ত্বের সাথে ভাইনরাইখের তত্ত্বের তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। ভাইনরাইখ তাত্ত্বিক বর্ণনায় কিছু অভিনবত্ব এনেছেন, যেমন প্রক্ষেপন নিয়মের পরিবর্তে ভাইনরাইখ বাগর্থিক গনক ও বাগর্থিক মূল্যায়কের প্রস্তাব করেছেন। ভাইনরাইখ দাবি করেন বাগর্থিক মূল্যায়ক এতটা শক্তিশালী যে এর মাধ্যমে ভাষার শৈলিগত অর্থ (আলংকরিক অর্থসহ)ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বাগর্থিক মূল্যায়কের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেহরার (১৯৭৪ ঃ ৫৮) বলেন ঃ

> "ভাষিক তত্ত্বে বাগর্থিক ব্যাখ্যার এই দিকটি অন্তর্ভুক্ত করে ভাইনরাইখ সম্ভবতঃ ঠিক কাজটিই করেছেন। এটি বর্ণনামূলক কাজে অধিকতর পারঙ্গম। এর দ্বারা বিচার করা সম্ভব বিভিন্ন পদশ্রেণীর শব্দব্যবহারে অভিনবত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হয় কিনা এবং যদি হয়ে থাকে, তখন কোন ধরনের শর্তাবলী ব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।" ●

● "Weinreich is probably correct in integrating this aspect of semantic interpretation into linguistic theory. Considerably more descriptive work must be done to discover whether novel uses of words in different word classes are consistently interpreted or not, and if so, what conditions control the interpretation." A Lehrer (1974), *Semantic Fields and Lexical Structure*, p. 58.

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা

সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার মূল বিষয় হলো উপরি সংগঠন বাগর্থিকভাবে মানচিত্রায়িত গভীর সংগঠন থেকে নির্গত হবে । সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন ম্যাকলে, রস, ল্যাকফ প্রমুখ । নীচে আমরা তাদের তত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করবো ।

ম্যাকলের তত্ত্ব ঃ ম্যাকলে (১৯৬৮) ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার বিপরীতে সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার সূত্রপাত করেন । তিনি বলেন যে গভীর সংগঠন থেকে ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ায় বাক্যের অর্থ আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই, বরং গভীর সংগঠনই হবে বাগর্থিক উপস্থাপনা এবং তা থেকে নিয়মসম্মতভাবে উপরিসংগঠন আহরিত হবে । এতে বাগর্থতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের মধ্যে দূরত্ব বিলুপ্ত হবে এবং তারা অভিন্ন নিয়মাবলীর সংশ্রয়ে সংবদ্ধ হবে । ম্যাকলের এই উক্তির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী । যদি একসেট নিয়ম আভ্যন্তর বাগর্থিক সংগঠন থেকে বহিঃস্থ বাক্যতাত্ত্বিক সংগঠন সঞ্জনন করে তবে বাগর্থিক উপাদান ব্যাকরণের সঞ্জননী যন্ত্রপ্রক্রিয়ার একটি অংশে পরিণত হয় । এবং বাগর্থিক উপাদানের এই সঞ্জননী ক্ষমতার ধারণা থেকেই **সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা** নামটি এসেছে (King 1976: 75; Mathews 1979: 76) ।

কাজেই নতুন রূপায়নে ভিত্তি ও গভীর সংগঠন বাগর্থিক উপস্থাপনার সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং প্রক্ষেপন নিয়ম বিলুপ্ত ঘোষিত হয় । বাগর্থিক উপস্থাপনা থেকে রূপান্তরমূলক নিয়মে উপরি সংগঠন উৎপাদিত হবে এবং উপরি সংগঠন থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মে ধ্বনিবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আহরিত হবে । এই হল সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার মূল বক্তব্য । সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার সংগঠনটি নীচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় (Leech 1981: 346) ঃ

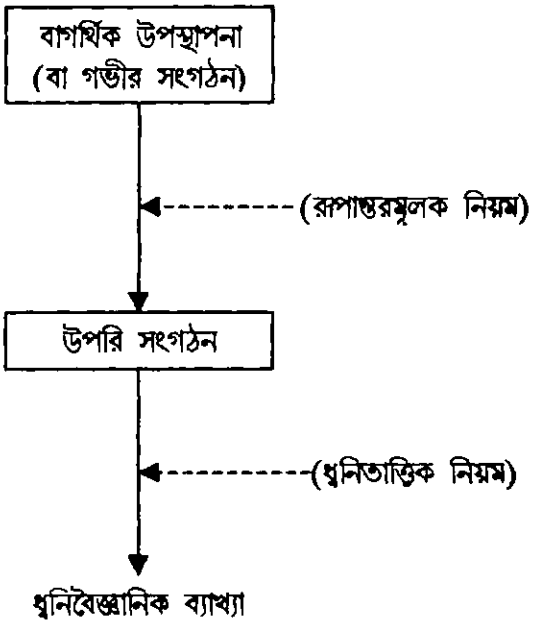

সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার সংগঠন

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকলে বলেন যে, সঙ্গতিবিধি বাক্যতাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়, বরং বাগর্থিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য । উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখান যে ইংরেজী count শব্দটির সঙ্গতিবিধিতে বর্ণিত থাকতে পারে এটি কেবল বহুবচন কর্মের উপর প্রযোজ্য হবে । কিন্তু I counted the crowd এ বাক্যে crowd সঠিক অর্থে বহুবচন নয়, বরং তা গুচ্ছতা প্রকাশ করে যা বাগর্থ সংশ্লিষ্ট । কাজেই বাক্যে কোন শব্দ সঙ্গতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা বাগর্থিক উপস্থাপনা থেকেই নির্ধারিত হবে । ম্যাকলে (১৯৬৮ ঃ ১৩৪) বলেন, "তদনুসারে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে সঙ্গতিবিধি কেবল বাগর্থিক উপস্থাপনার প্রেক্ষিতেই সংজ্ঞায়িত হতে পারে এবং কোন গঠক সঙ্গতিবিধি পালন না লঙ্ঘন করলো তা নির্ধারণের জন্য কেবল বাগর্থিক উপস্থাপনা পরীক্ষা করলেই হবে, আর কিছু দরকার নেই ।"● কাজেই বাড়তি সঙ্গতিবিধির ও উপশ্রেণীকরণের কোন প্রয়োজন নেই ।

রূপান্তরের কোন্ স্থানে বা পর্যায়ে শাব্দিক উপকরণ প্রবিষ্ট হবে তা সঞ্জননী বাগর্থিবিদ্যার জন্য একটি বড় সমস্যা । এ ব্যাপারে ম্যাকলে মত প্রকাশ করেন যে শব্দীয় উপকরণ প্রবেশ করানো হবে রূপান্তর বা আহরণমূলক প্রক্রিয়ার শুরুতে নয় বরং বিভিন্ন স্থানে । তিনি বলেন শব্দকে ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিখন্ডীকরণ করা যায় এবং বাচনিক কলনে উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিধৃত করা যায় । যেমন kill (হত্যা করা) -কে বলা যায় একটি ঘটনা যেখানে ধ্রুবক y ঘটনার পূর্বে জীবিত ছিল কিন্তু এখন সে আর জীবিত নাই এবং x ঘটনার কারণ হিসাবে কাজ করেছে । বৃক্ষচিত্রে এটিকে এভাবে দেখানো যায় ঃ

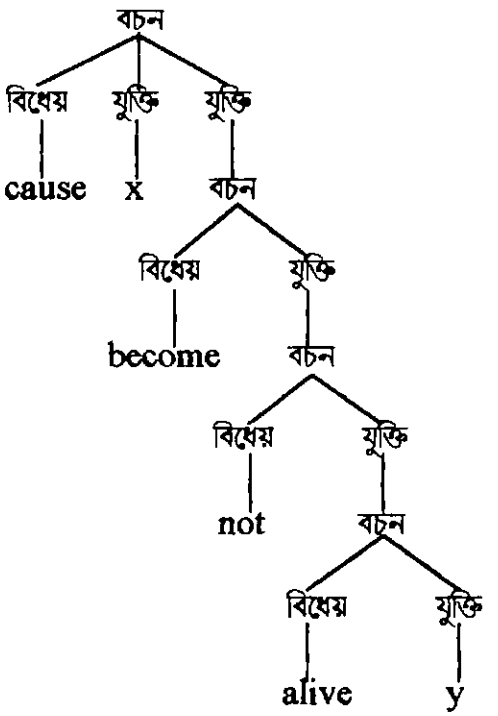

● "I accordingly conclude that selectional restrictions are definable solely in terms of properties of semantic representations and that to determine whether a constituent meets or violates a selectional restriction it is necessary to examine its semantic representation and nothing else." J. D. McCawley (1968), *The Role of Semantics in a Grammar*, p. 134

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকলের বিখন্ডীভূত ক্ষুদ্র বাগর্থিক উপাদানগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় । এই প্রক্রিয়াকে তিনি বলেন *বিধেয় উত্তোলন* । বাচনিক সংগঠনের অনুরূপ একটি গঠনচিত্র থেকে ক্রিয়া (V) নিয়ে ক্রমানুয়ে গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত করা হবে । এরফলে সরল ধারণা থেকে উর্ধ্বক্রমে জটিল ধারণা নির্গত হবে । kill (হত্যা করা) -এর মাধ্যমে বিধেয় উত্তোলন প্রক্রিয়াটি নীচে দেখানো হলো ঃ

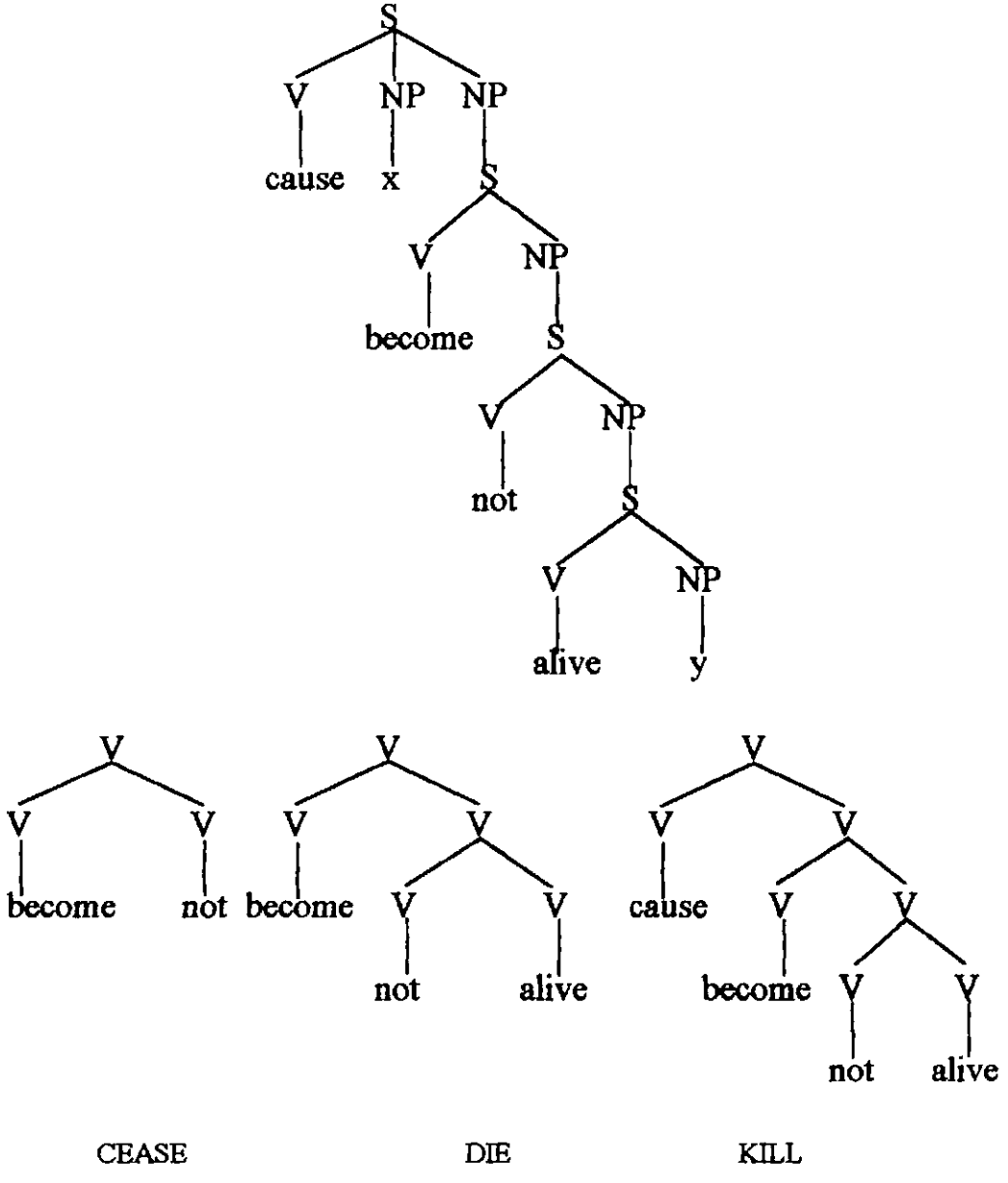

এখানে , x killed y = x caused y to die = x caused y to cease to be alive

ল্যাকফ, রস ও অন্যান্য ঃ সঞ্জননী ব্যাকরণ নিয়ে অন্যান্য যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে ল্যাকফ (১৯৬৫, ১৯৬৮), রস (১৯৬৭) এর নাম অগ্রগণ্য । ম্যাকলের মতো তারাও মনে করেন যে গভীর সংগঠন হলো বাগর্থিক উপস্থাপনা যার থেকে রূপান্তরমূলক নিয়মে উপরি সংগঠন নিঃসৃত হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

যদি গভীর সংগঠনকে বাগর্থিক উপস্থাপনা বলতে হয় তাহলে প্রথমে এটা প্রমান করা প্রয়োজন যে এই সংগঠন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বে যেরকম দেখানো হয় তার চেয়েও বিমূর্ত, বাক্যতাত্ত্বিক উপস্থাপনায় যার যথাযথ স্বরূপ উপস্থাপিত হয় না। ল্যাকফ (১৯৬৫) এ উদ্দেশ্য দেখান যে কোন কোন বাক্য যেমন John opened the door এর গঠন আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হলেও তার আভ্যন্তরীণ সংগঠন বেশ জটিল। তিনি বলেন যে আলোচ্য বাক্যটিতে দুটি অন্তঃশায়িত বাক্য রয়েছে ঃ The door opened এবং John caused the door to be open বাক্যের আভ্যন্তরীণ সংগঠনটি বৃক্ষচিত্রে প্রদর্শন করা যায় ঃ

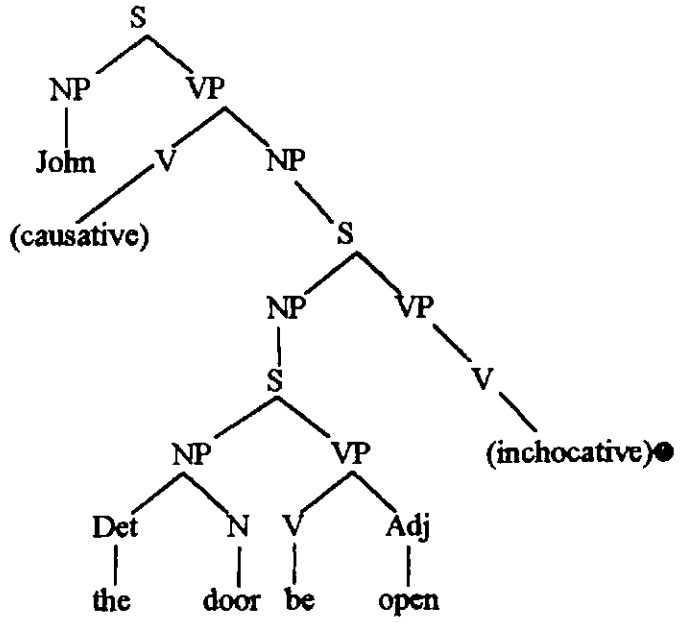

এই আভ্যন্তরীণ সংগঠনটি বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। রজেনবৌম (১৯৬৫) একই যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি দেখান যে seem আসলে একটি অকর্মক ক্রিয়া যার কর্তা থাকে পুরো বাক্য। যেমন James seems to know the answer এর গভীর সংগঠন বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে এরকম চিত্র ঃ

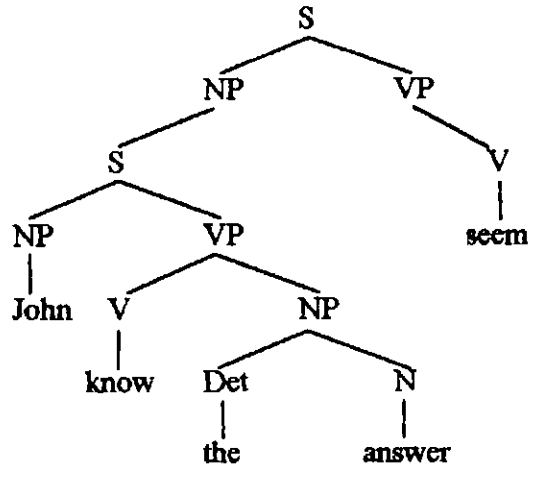

● চিত্রে inchoative হলো বিমূর্ত উপাদান যা বিশেষণের সাথে যুক্ত হয়ে পরিবর্তনসূচক ক্রিয়া গঠন করে, যেমন redden, blacken, flatten ইত্যাদি। এটি become দ্বারা উপলব্ধ হতে পারে যেমন redden = become red, blacken = become black, flatten = become flat.

Dhaka University Institutional Repository

এধরনের প্রমান সাক্ষ্য দেয় যে গভীর সংগঠন অত্যন্ত বিমূর্ত এবং বাগর্থিক উপস্থাপনাই কেবল সেই বিমূর্ততাকে ধারণ করতে পারে । রস (১৯৬৭)ও গভীর সংগঠনের বিমূর্ততার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । তিন বলেন গভীর সংগঠনে বাক্যের গঠক উপাদানের বিশ্লেষণ হবে বৃক্ষচিত্রে । যেমন ঃ

John tried to begin to solve the problem.
John began to try to solve the problem.

এ দুটি বাক্যের গঠক উপাদান এক হলেও তাদের সংগঠন ভিন্ন এবং এই ভিন্নতা প্রকাশিত হবে বাগর্থিক উপস্থাপনায় । বাগর্থিক উপস্থাপনা যেহেতু বাগর্থিক ক্ষুদ্র উপাদান কাজে লাগায় কাজেই এটি প্রত্যাশিত যে এতে মোট ক্যাটিগরি বা শ্রেণীর সংখ্যা অনেক কম হবে । বাখ (১৯৬৮) এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন । তিনি দেখান যে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ার মধ্যে প্রথাগত ব্যাকরণগত পার্থক্যটি বিভ্রান্তিমূলক এবং এই তিনটি ক্যাটিগরি বা শ্রেণী একটিমাত্র মৌল উপাদান দ্বারাই উপস্থাপিত হতে পারে । যেমন ঃ

1. a. The man is working.
   b. The one who is working is a man.
2. a. The man is large.
   b. The one who is large is a man.

এই চারটি বাক্যের আভ্যন্তরীন সংগঠন হবে এরকম ঃ

1. a. The one who is a man is working.
   b. The one who is working is a man.
2. a. The one who is a man is large.
   b. The one who is large is a man.

এখানে ক্রিয়া (working.), বিশেষ্য (man) এবং বিশেষণ (large) এর ব্যবধান লুপ্ত এই অর্থে যে এগুলো একই সাংগঠনিক কৌশলে বিশ্লেষিত । এতে এটাই প্রমানিত হয় যে বাগর্থিক উপস্থাপনা বাক্যতাত্ত্বিক উপস্থাপনার চেয়ে অনেক কম ক্যাটিগরি বা শ্রেণী নিয়ে কাজ করতে পারে ।

কাজেই দেখা যায় গভীর সংগঠন যে বাগর্থিক উপস্থাপনা হওয়া উচিত এর পিছনে অনেক যুক্তি আছে যা সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যাকে শক্ত ভিত্তি প্রদান করে । মার্গারেট কিং (১৯৭৬ ঃ ৮৩) সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন । যথা ঃ

১. বাগর্থিক উপস্থাপনা রৌপিক বাক্যতাত্ত্বিক উপস্থাপনার মতো । বাগর্থিক বৃক্ষচিত্রে অপ্রান্তিক গ্রন্থির সংখ্যা উপরি সংগঠনের অনুরূপ ।
২. রূপান্তর ও বাগর্থিক ব্যাখ্যা একই নিয়ম সংশ্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং গভীর সংগঠন বাগর্থিক উপস্থাপনার সাথে একীভূত হবে যাতে এটি বাক্যতাত্ত্বিক চরিত্র হারিয়ে বাগর্থিক চরিত্র অর্জন করে ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যে নিয়মসমষ্টি দিয়ে কোন বাক্যের অর্থ নির্ধারিত হবে, সেগুলো দিয়ে বাক্যের ব্যাকরণিকতা নির্ধারিত হবে ।

৪. ব্যাকরণের কাজ হবে একগুচ্ছ আহরণ সঞ্জনন করা এবং তার সাথে আহরণগাত নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করা । আহরণগাত নিয়ন্ত্রণ দেখাবে বাগর্থিক সংগঠনে কিভাবে উপাদানসমূহের সংযুক্তি ঘটবে, কিভাবে উপরি সংগঠনে উপাদান সমূহ সম্মিলিত হবে এবং কিভাবে আহরণমূলক প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে ।

এই চারটি বৈশিষ্ট্য একদিকে যেমন সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার স্বরূপ তুলে ধরে, অন্যদিকে এগুলো ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার সাথে এর পার্থক্য বয়ান করে । আমরা যেরকম উপলব্ধি করি, ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যা ও সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার মূল পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে গভীর সংগঠন বাক্যতাত্ত্বিক এবং বাক্যের অর্থ অর্জিত হয় ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ায়, এবং দ্বিতীয়টিতে গভীর সংগঠন বাগর্থিক এবং এর থেকে রূপান্তরমূলক নিয়মে বাক্যের উপরি সংগঠন আহরিত হয় । অর্থাৎ প্রথম রূপায়নটি বাক্যতত্ত্বভিত্তিক এবং দ্বিতীয় রূপায়নটি বাগর্থতত্ত্বভিত্তিক । এজন্যই ওয়ালেস চাফ (১৯৭০) সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যাকে বলেন **বাগর্থিকতাবাদ** এবং ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যাকে বলেন **বাক্যিকতাবাদ** । তিনি বাক্যিকতাবাদের চেয়ে বাগর্থিকতাবাদকে অধিক সুষ্ঠু বলে গণ্য করেন । তিনি বাগর্থিকতাবাদের অন্ততঃ চারটি গুণ উল্লেখ করেন (Chafe 1970: 65-67) ঃ

প্রথমত, বাগর্থিকতাবাদের একটি নান্দনিক গুণ রয়েছে যার ফলে এর উপস্থাপনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী বলে অনুভূত হয় ।
দ্বিতীয়ত, বাগর্থিকতার মাধ্যমে ভাষার ব্যবহার বা বাস্তব প্রয়োগ অধিকতর সহজে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ।
তৃতীয়ত, ভাষার বিবর্তনমূলক ব্যাখ্যার সাথে বাগর্থিকতাবাদ অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ।
চতুর্থত, বাগর্থিকতাবাদ গভীর সংগঠন ও উপরিসংগঠনের মাঝখানের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে বাক্যতত্ত্ব ও বাগর্থবিদ্যাকে একসূত্রে আবদ্ধ করে ।

তবে সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা একদিকে যেমন নন্দিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি হয়েছে নিন্দিত । কেম্পসন (১৯৭৭ ঃ ১৭৬-১৭৭) দেখান যে সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা বাক্যিক সংগঠন ও বাগর্থিক সংগঠনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রমান করতে পারে না । লীচ (১৯৮১ ঃ ৩৪৭) বলেন যে কেবল গভীর সংগঠন নয়, উপরিসংগঠনের সাথেও অর্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং এজন্য সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা নাবোধকতা ও পরিমাপনের পরিধি ব্যাখ্যা করতে পারে না । তিনি আরো বলেন যে শাব্দিক অনুপ্রবেশ রূপান্তরের ধাপে ধাপে সংঘটিত হয় বলে এটি শেষ পর্যন্ত অর্থের অপরিবর্তনীয়তা নীতি বজায় রাখতে পারে না । তবে সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার সবচেয়ে বড় সমালোচক মনে হয় চমস্কি । তিনি বলেন যে সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যা ভাষিক তত্ত্বে নতুন কিছু যোগ করে না । তিনি দেখান যে প্রমিত তত্ত্বের সাথে এর কোন মৌলিক পার্থক্য নেই । যেমন ঃ

প্রমিত তত্ত্ব ঃ $$\Sigma = (P_1,\ldots,\underset{\substack{|\\ S}}{P_i},\ldots,\underset{\substack{|\\ P}}{P_n})$$

সঞ্জননী তত্ত্ব ঃ $$\Sigma = (S,\ldots,P_n,\ldots,P)$$

Dhaka University Institutional Repository

এখানে,

Σ = বাক্যতাত্ত্বিক সংগঠন
P_1 = ভিত্তি বা যৌক্তিক রূপ
P_i = গভীর সংগঠন
P_n = উপরি সংগঠন
S = বাগর্থিক উপস্থাপনা
P = ধ্বনিবৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা

সঞ্জননী তত্ত্বে P_1, P_i, S একীভূত হয়ে যায় এবং ক্রম শুরু হয় S থেকে। এদিক থেকে এটি প্রমিত তত্ত্ব থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতা কোন তাৎপর্য সৃষ্টি করে না। কারণ রৌপিক উপাদানগুলো কিরূপে বিন্যস্ত হবে বা তাদের অভিমুখ কি হবে তার কোন তাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই (Chomsky 1972: 85)। বিশ্লেষণ যে কোন পর্যায় থেকে শুরু হতে পারে এবং যে কোন অভিমুখে প্রবাহিত হতে পারে, তাতে একই ফলাফল অর্জিত হবে। তাই চমস্কি (১৯৭২ ঃ ১৯৭) বলেন, "In short, it seems to me that in the few areas of substantive difference, generative semantics has been taking the wrong course."

হাচিন্সের মডেল ঃ ডব্লিউ, জে, হাচিন্স (১৯৭১) সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার একটি ভিন্নতর মডেল নির্মান করেন। তিনি শব্দের অর্থকে বলেন *অর্থমূল* এবং অর্থমূল যে সব মৌল অর্থ উপাদানে গঠিত তাদের বলেন *অর্থাণু*। অর্থাণুসমষ্টি থেকে কিভাবে কথ্যবাক্য বা লিখিত বাক্য আহরিত হয় হাচিন্স তা ব্যাখ্যা করেন। প্রক্রিয়াটি শুরু হয় জ্ঞানাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে। বক্তা বা লেখক বাস্তবে *যে জ্ঞানাত্মক অভিজ্ঞতা* লাভ করেন তাকে প্রকাশ করার জন্য প্রথমে *অর্থাণু বাছাই* করে একটি *অর্থাণু জালিকা* তৈরী করেন। অর্থাণু জালিকা থেকে তিনি *অর্থমূল নির্বাচন* করেন। নির্বাচিত অর্থমূলের উপর এরপর তিনি প্রয়োগ করেন *শাব্দিক সূত্রাবলী* যাতে থাকে গ্রন্থি ও বন্ধন। শাব্দিক সূত্রাবলী *অর্থশাব্দিক রূপান্তরের* মাধ্যমে *শাব্দিক উপস্থাপনা* অর্জন করে। শাব্দিক উপস্থাপনা এরপর দ্বিমূখী রূপান্তরের সম্মুখীন হয় যোগাযোগের মাধ্যমে অনুসারে। কথার ক্ষেত্রে শাব্দিক উপস্থাপনা প্রথমে *শাব্দরূপমূলীয় রূপান্তরের* মাধ্যমে *রূপমূলীয় উপস্থাপনা* এবং রূপমূলীয় উপস্থাপনা *রূপধ্বনিমূলীয় রূপান্তরের* মাধ্যমে *ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনা* অর্জন করে এবং ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনা *বক্তব্যকর্মের* মাধ্যমে *কথ্যবাক্যে* রূপ লাভ করে। অন্যদিকে লেখার ক্ষেত্রে শাব্দিক উপস্থাপনা *শাব্দলিপিমূলীয় রূপান্তরের* মাধ্যমে *লিপিমূলক উপস্থাপনা* অর্জন করে যা আবার *লিখন কর্মের* মাধ্যমে *লিখিত বাক্যে* রূপলাভ করে। পুরো প্রক্রিয়াটিকে হাচিন্স নিম্নরূপ চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন (Hutchins 1971: 8) ঃ

Dhaka University Institutional Repository

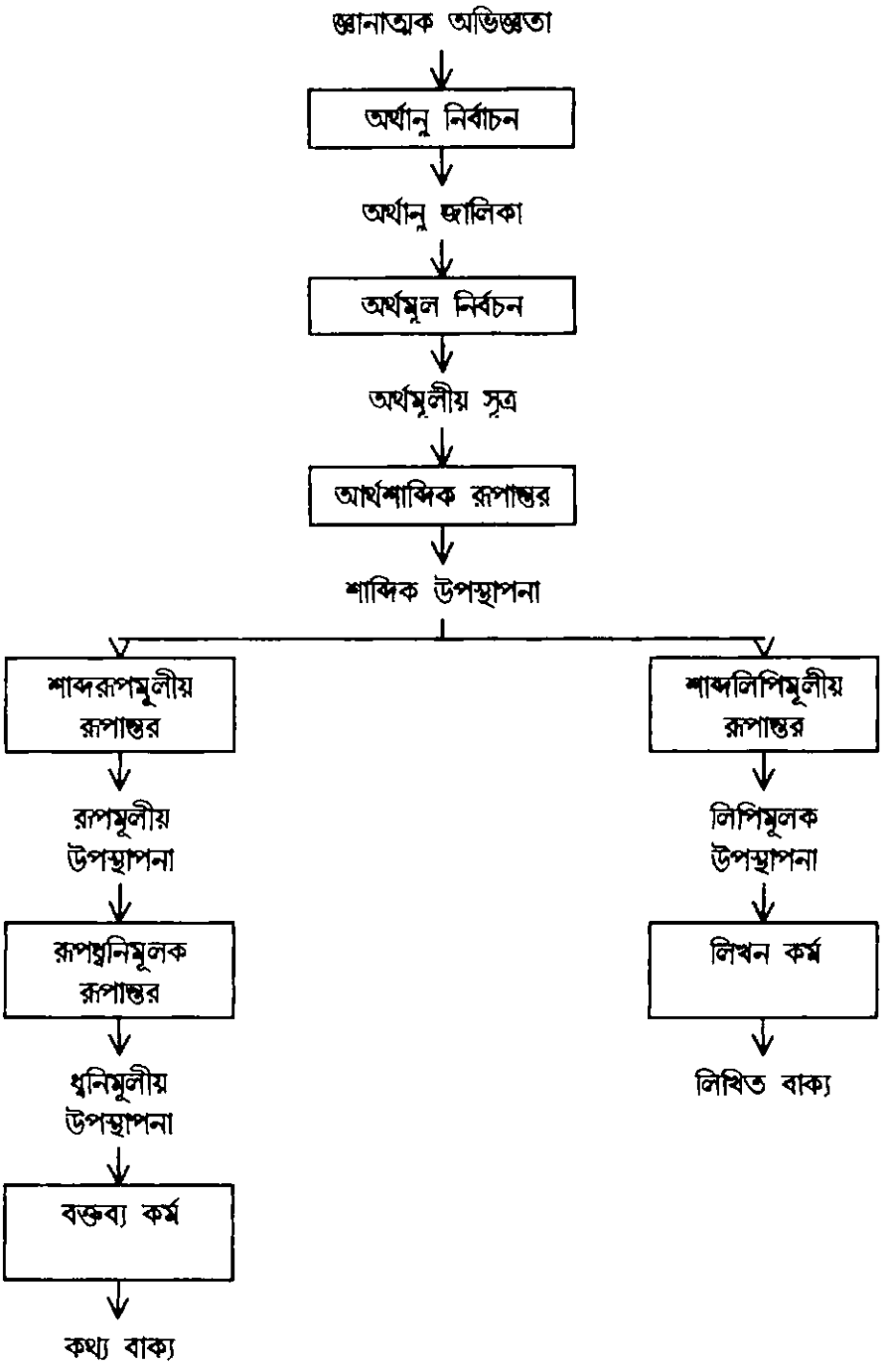

হাচিন্সের তত্ত্বের পরিকাঠামো

হাচিন্সের তত্ত্বের ভিত্তি বাগর্থিক । এটি দেখায় কিভাবে একটি বাগর্থিক ভিত্তি থেকে বাক্যতাত্ত্বিক সংগঠন আহরিত হয় । এজন্যই এটি সঞ্জননী তত্ত্ব । এতে যদিও গভীর ও উপরি সংগঠনের স্পষ্ট উল্লেখ নেই তবু এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সঞ্জননী প্রক্রিয়া শুরু হয় গভীর সংগঠন থেকে এবং শেষ হয় উপরি সংগঠনে এসে । হাচিন্স কয়েক ধরনের সঙ্গতিবিধির কথা বলেন যেগুলো ক্রিয়াশীল হয় রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়াটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আর্থশাব্দিক রূপান্তর অর্থাৎ অর্থমূলীয় সূত্রাবলী কিভাবে শাব্দিক উপস্থাপনা লাভ করে তার বর্ণনা । আর্থশাব্দিক রূপান্তরের দুটি অংশ – *রেখাবদ্ধকরণ* এবং *আর্থশাব্দিক নিয়মের প্রয়োগ* । এগুলো কিভাবে কাজ করে উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক । নীচের চিত্রটি একটি শাব্দিক সূত্র ঃ

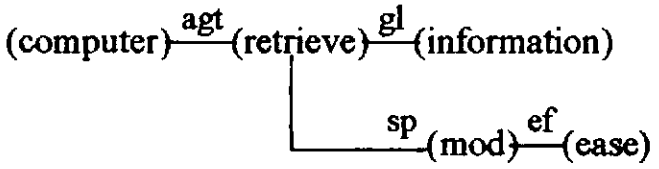

এখানে,

agt = কর্তা
gl = কর্ম
sp ও ef = বিশেষণ চিহ্ন
mod = বিশেষণ শ্রেণী

এবার রেখাবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় এখানে *বিষয়বস্তু গ্রন্থি* ও *কেন্দ্রবিন্দু গ্রন্থি* প্রদর্শিত হবে । যেমন ঃ

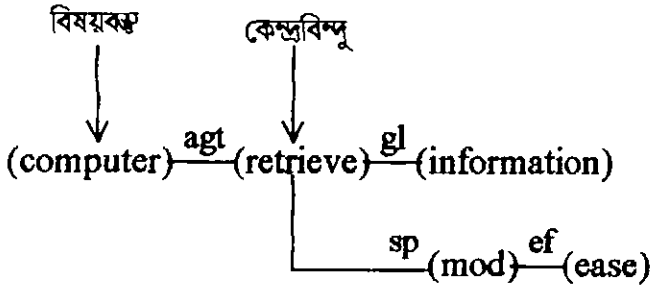

এবার বাক্যের প্রকার ও শাখাবিভক্তির স্থান নির্ধারণ করতে হবে । আমরা ধরে নিতে পারি বাক্যটি হবে বিবৃতিমূলক (decl) এবং শাখা বিভাক্ত (b) হবে retrieve থেকে । ফলে আমরা পাবো ঃ

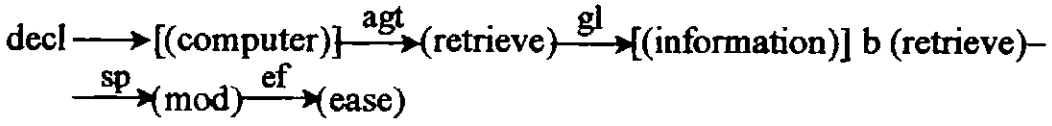

এভাবে রেখাবদ্ধকরণ শেষ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে এর উপর আর্থশাব্দিক নিয়ম প্রযোজ্য হবে । হাচিন্স ৩৯১ টি আর্থশাব্দিক নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন । আমরা সেসবের বিস্তারিত বর্ণনায় যাবো না । শুধু এটুকু বলবো যে হাচিন্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আলোচ্য ক্ষেত্রে মোটামুটি এগারটি আর্থশাব্দিক নিয়ম প্রযোজ্য হয় এবং তার ফলে শাব্দিক উপস্থাপনা হিসাবে নিম্নলিখিত ক্যাটিগরি ও শব্দ পাওয়া যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

NP (N (computer))
V (retrieve))
NP (N (information))
V (△)
Adv (ease))

এগুলোকে বৃক্ষচিত্রে প্রদর্শন করলে এরকম দেখাবে ঃ

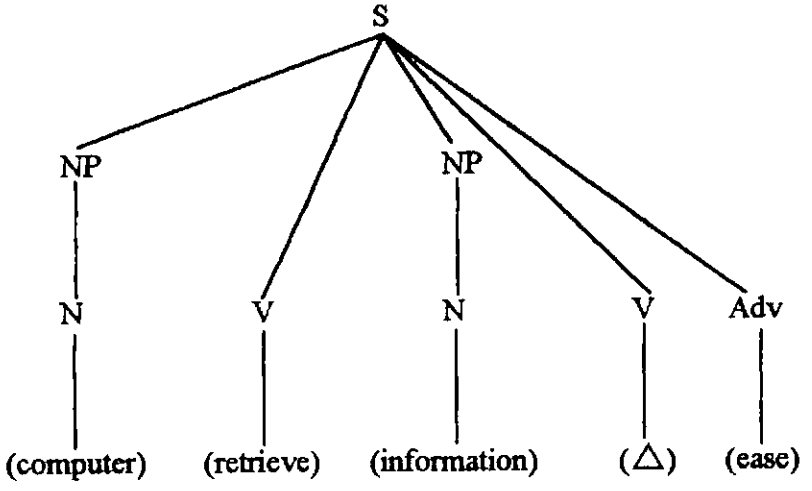

এই শাব্দিক উপস্থাপনা এরপর পর্যায়ক্রমে শাব্দলিপিমূলক রূপান্তর ও লিখনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বাক্য এবং অন্যদিকে শাব্দরূপমূলীয় রূপান্তর, রূপধ্বনিমূলক রূপান্তর ও বক্তব্যকর্মের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বাক্যের উচ্চারণে রূপলাভ করে ঃ

Computer retrieves information easily.
/kəm'pju:tə rɪ'tri:vz ɪnfə'meɪʃən 'i:zɪlɪ/

হাচিন্সের তত্ত্বের যন্ত্রপ্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল । তবে এটি রূপান্তরমূলক ব্যকরণের যে কোন তত্ত্বের চেয়ে ব্যাপক । এটি একাধারে কথ্য ও লিখিত যোগাযোগের ব্যাখ্যা প্রদান করে । ফলে প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে নিঃসন্দেহে এর মূল্য অধিক হবে ।

নীচের প্রস্তাবনা ঃ উপরের স্তরে একটি বাক্যের অর্থের বিশ্লেষণকে বলা যেতে পারে **উপরি বাগর্থিক সংগঠন** । গভীর স্তরে এই সংগঠন আবার এক বা একাধিক বাগর্থিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা বিপরীত হতে পারে । এটি হলো **গভীর বাগর্থিক সংগঠন** ।

Dhaka University Institutional Repository

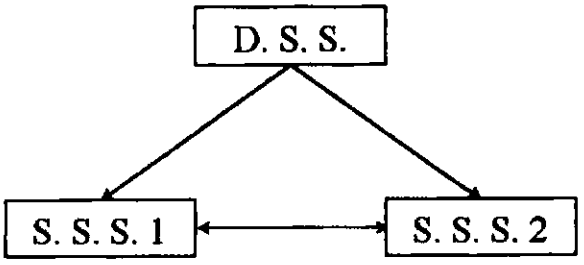

এখানে, D.S.S. = গভীর বাগর্থিক সংগঠন
S.S.S. = উপরি বাগর্থিক সংগঠন

এভাবে জেফ্রি লীচ (১৯৮১ ঃ ২৬৮-২৭৬) বাগর্থিক সংগঠনকে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করেন রূপান্তরবাদী বাক্য তত্ত্বের ঢংয়ে । লীচ তার প্রস্তাবনা একটি প্রকল্পাকারে প্রকাশ করেন যার নাম দেন তিনি **গভীর বাগর্থিক সংগঠন প্রকল্প** এবং তিনি তার তত্ত্বালোচনাকে **গভীর বাগর্থবিদ্যা** অভিধায় ভূষিত করেন ।

লীচের মতে গভীর বাগর্থিক সংগঠন হলো বাগর্থিক উপাদানের জালিকা যা গঠিত হয় প্রান্ত ও বন্ধন দ্বারা । জালিকা প্রদর্শিত হয় লেখচিত্রে যাতে থাকে প্রান্ত উপস্থাপনার জন্য বৃত্ত এবং বন্ধন উপস্থাপনার জন্য সরলরেখা তীরচিহ্ন । লীচ দাবি করেন গভীর বাগর্থিক সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের বিধেয়নসহ সহনির্দেশন, প্রতিবিম্ব সম্পর্ক প্রভৃতি বিশ্লেষন করা যায় । এক স্থানিক বিধেয়নের ক্ষেত্রে বন্ধনের সাথে একটিমাত্র প্রান্ত যুক্ত থাকে । ফলে এটি প্রদর্শিত হবে এভাবে ঃ

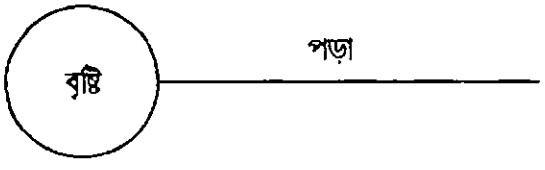

বৃষ্টি পড়ে

দ্বিস্থানিক বিধেয়নের ক্ষেত্রে বন্ধন দুটি প্রান্তকে একসাথে যুক্ত করে । এটি প্রদর্শিত হয় এভাবে ঃ

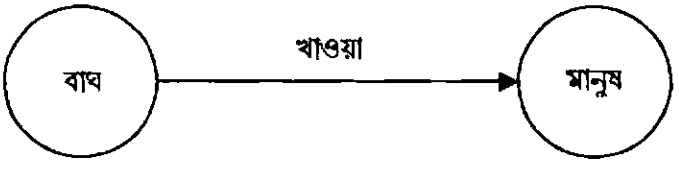

বাঘ মানুষ খায়

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তীরচিহ্নের অভিমুখের গুরুত্ব রয়েছে। উপরের চিত্রে তীরের অভিমুখ বিপরীত হলে তার অর্থ হবে *মানুষ বাঘ খায়*ঃ

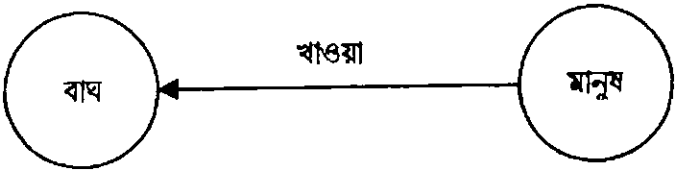

মানুষ বাঘ খায়

যদি একটি বিধেয়ন অন্য একটি বিধেয়নের অধীনস্থ নয় তবে একটি তীরচিহ্নের প্রান্ত আরেকটি তীরচিহ্নের মাঝামাঝি স্পর্শ করবে। এতে লেখচিত্রটি দেখাবে কাত হওয়া T অক্ষরের মতো। যেমন ঃ

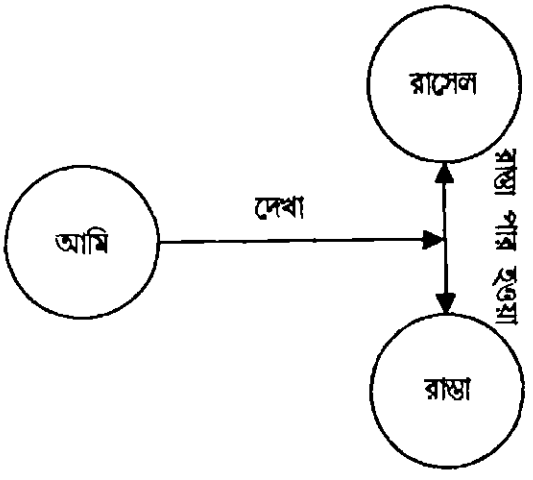

আমি রাসেলকে রাস্তা পার হতে দেখেছি

বিশেষণমূলক বিধেয়নের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ এখানেও দুইটি তীরচিহ্ন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় যার ফলে চিত্রটি দেখতে অবিকল T এর মতো। যেমন ঃ

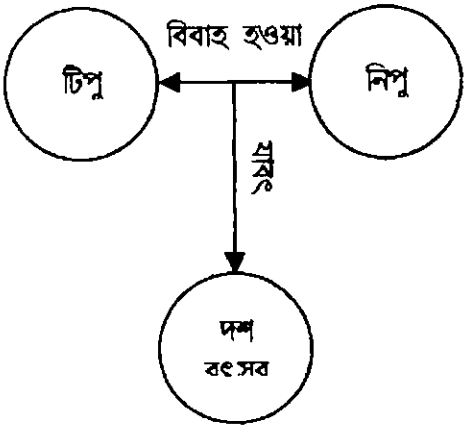

টিপুর সাথে নিপুর বিয়ে হয়েছে দশ বৎসর হলো

Dhaka University Institutional Repository

সম্বন্ধপদের ক্ষেত্রে লেখচিত্রটি উল্টো L এর আকার ধারণ করে । যেমন ঃ

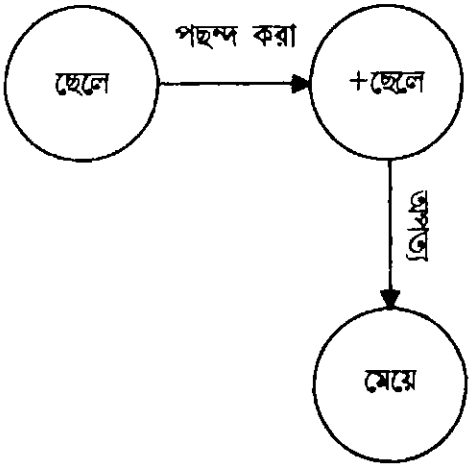

ছেলেটি মেয়ের বাবাকে পছন্দ করে

সহনির্দেশনের ক্ষেত্রে দুটি বৃত্ত একই চক্রে আবদ্ধ থাকে । দুটি বৃত্তের একটিতে একটি যুক্তি এবং অপরটিতে অন্য যুক্তির সাম্পর্কিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত হয় । যেমন ঃ

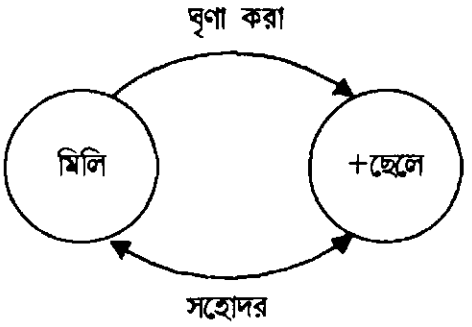

মিলি তার ভাইকে ঘৃণা করে

প্রতিবিম্ব সম্পর্কের ক্ষেত্রে তীরচিহ্ন তার উৎস্যবৃত্তে প্রত্যাবর্তন করে । যেমন ঃ

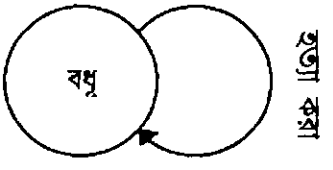

বধূটি আত্মহত্যা করেছে

Dhaka University Institutional Repository

জালিকাচিত্রে এভাবে অনেক জটিল সম্পর্ক ও প্রদর্শন করা সম্ভব । যেমন ঃ

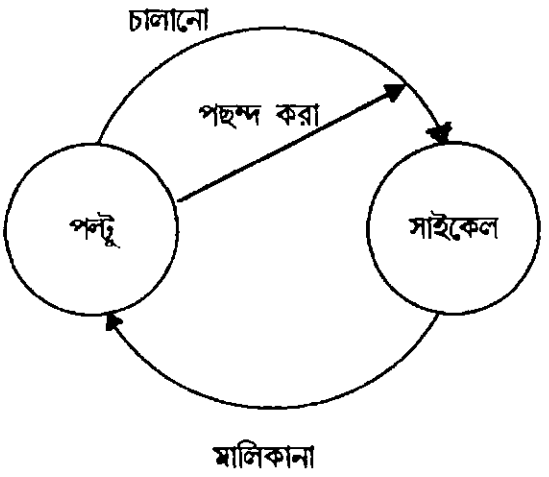

পল্টু তার নিজের সাইকেলটি চালাতে পছন্দ করে

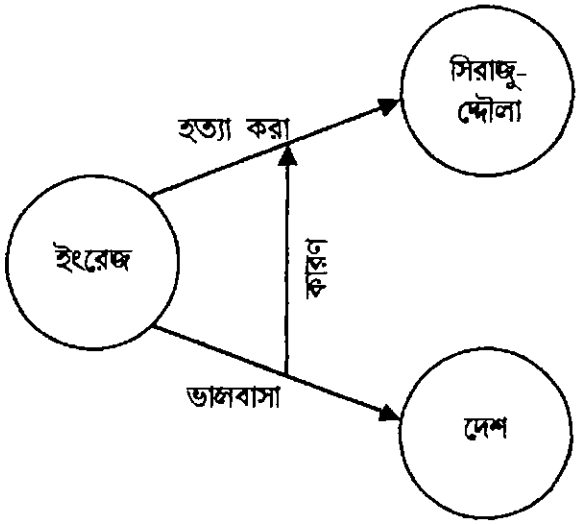

ইংরেজরা সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করেছে কারণ তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন

লীচ তার গভীর বাগর্থবিদ্যাকে বৃহত্তর তাত্ত্বিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস পান । তিনি বৃহত্তর তাত্ত্বিক সংগঠনটি উপস্থাপন করেন ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যা ও সঞ্জননী বাগর্থবিদ্যার মধ্যে আপোষমীমাংসারূপ । তার মতে এরূপ একটি ভাষিক তত্ত্ব হবে তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ঃ একটি প্রকোষ্ঠ বাক্যতত্ত্বের, একটি বাগর্থতত্ত্বের এবং তৃতীয়টি ধ্বনিতত্ত্বের । প্রতিটি প্রকোষ্ঠ আবার উপরি ও গভীর এই দুই স্তরে বিভক্ত থাকবে । ফলে বাক্যতত্ত্ব বিভক্ত হবে গভীর ও উপরি বাক্যতত্ত্বে, বাগর্থবিদ্যা বিভক্ত হবে গভীর ও উপরি বাগর্থবিদ্যায় এবং ধ্বনিতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্ত হবে গভীর ও উপরি ধ্বনিতত্ত্বে । তিনটি প্রকোষ্ঠেই রূপান্তরমূলক নিয়ম কার্যকরী হবে, তবে বাগর্থবিদ্যা ও বাক্যতত্ত্ব এই দুই প্রকোষ্ঠের সংযোগে কাজ করবে প্রকাশমূলক নিয়ম । বাগর্থবিদ্যা প্রকোষ্ঠের ভিতরে আবার গভীর ও উপরি স্তর সম্পর্কিত হবে ইঙ্গিতের নিয়ম দ্বারা । ভাষিক তত্ত্বের পরিকাঠামোর এক প্রান্তে থাকবে জ্ঞানাত্মক সত্তার আগম বা নির্গম পথ এবং অন্য প্রান্তে থাকবে ধ্বনিবৈজ্ঞানিক সত্তার আগম বা নির্গম পথ । লীচ তার তত্ত্বকে নিম্নরূপ চিত্রে প্রদর্শন করেন (১৯৮১ ঃ ৩৫০) ঃ

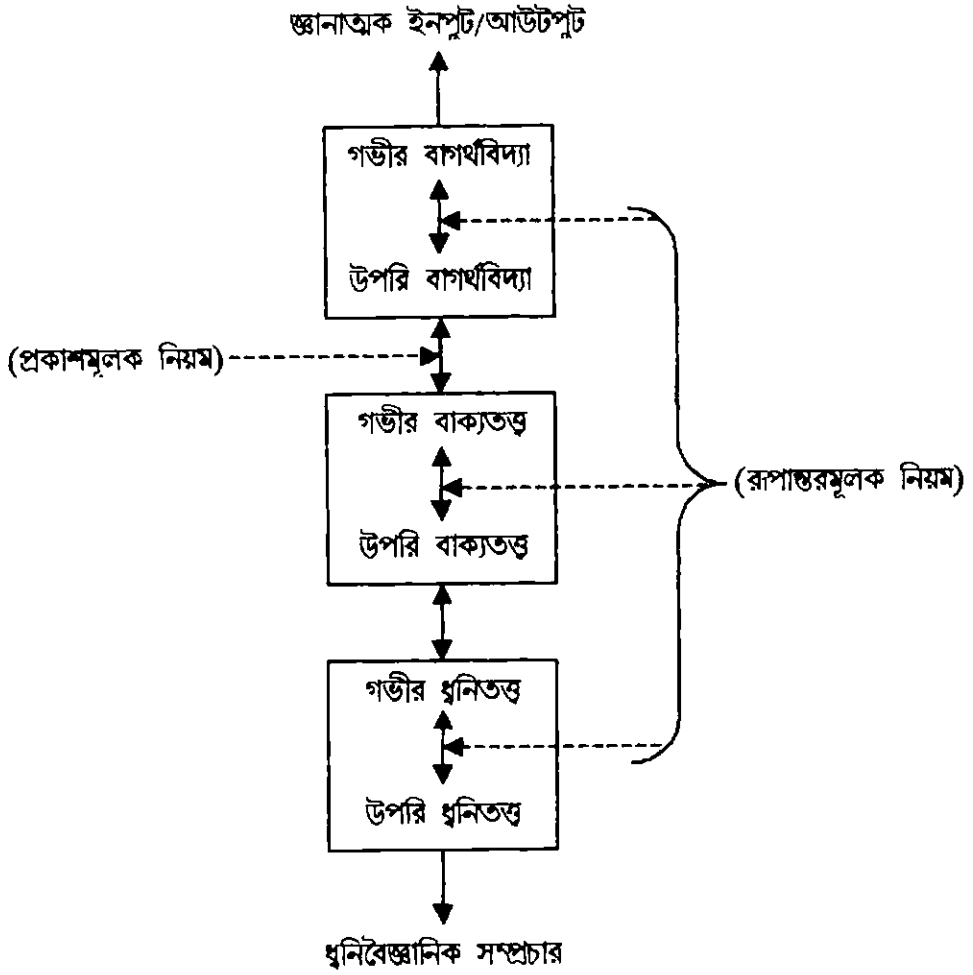

লীচের তত্ত্বের পরিকাঠামো

লীচ দেখান যে তার তত্ত্বে ব্যাখ্যামূলক ও সঞ্জননী উভয় বাগর্থবিদ্যার কিছু কিছু অংশ অন্তর্ভূক্ত আছে । ফলে তিনি আশা করেন তার এই বহুভিত্তিক মডেল উভয়ের মধ্যে তীব্র বিতর্কের অবসান ঘটাবে ।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদ্যা

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদ্যা

বাগর্থবিদ্যার এই শাখাটির বিকাশ ঘটে সাধারণ ভাষা দর্শনের পথ ধরে । আমরা দেখেছি যে রৌপিক ভাষা দর্শন ভাষাকে আদর্শায়িত করে কৃত্রিম সংকেতের মাধ্যমে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে মদদ যুগিয়েছে । যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যায় আমরা তার কিছু নমুনা প্রত্যক্ষ করেছি । সাধারণ ভাষা দর্শন এই প্রবণতার বিরোধিতা করে বলে যে কৃত্রিম সংকেতের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভাষার অর্থকে সঠিরভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না, বরং সাধারণ ভাষাই এক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী । বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাগর্থিক আলোচনায় সাধারণ ভাষা প্রয়োগের যে আন্দোলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে সে আন্দোলন আরো জোরদার হয় । ভিটগেনস্টাইন, অস্টিন, সার্ল, গ্রাইস প্রমুখ দার্শনিকদের প্রভূত অবদানের প্রতিশ্রুতিতে জন্মলাভ করে **প্রয়োগবিদ্যা**, যা সত্যশর্তের বদলে ভাষার অর্থকে যোগাযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয় । বাস্তবে মানুষ কিভাবে ভাষা ব্যবহার করে, সাধারণ কথোপকথনে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কিভাবে অর্থের আদানপ্রদান ও উপলব্ধি হয়, ভাষিক যোগাযোগে কি ধরনের নিয়ম কাজ করে এবং এই নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল কি – প্রয়োগবিদ্যা, বা আমরা যাকে বলছি প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদ্যা, এসব নিয়েই আলোচনা করে । আমরা এ অধ্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগবাদী তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো ।

প্রয়োগ তত্ত্ব

দার্শনিক লুডউইগ ভিটগেনস্টাইন (১৯৫৮)-কে বলা হয় প্রয়োগতত্ত্বের প্রথম ও প্রধান প্রচারক । কেউ যখন বলেন *অর্থ কি* তখন মনে হয় অর্থ যেন কোন বস্তু বা সত্তা যাকে আমরা খুঁজে বের করতে পারি এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারি অর্থ হলো এই জিনিস । আমরা দেখেছি নির্দেশন তত্ত্বে অর্থকে জাগতিক বস্তু এবং ভাবনাবাদী তত্ত্বে অর্থকে মানসিক বস্তু বলা হয়েছে । কিন্তু ভিটগেনস্টাইনের মতে এ ধরনের প্রচেষ্টা সঠিক নয় । তিনি বলেন অর্থ কোন বস্তু নয়, তাই কোন শব্দের অর্থ খোঁজা বৃথা । অর্থকে বুঝতে হলে তাকাতে হবে শব্দের প্রয়োগের দিকে । অর্থের পরিচয় পাওয়া যায় প্রয়োগে । তাই *প্রয়োগই হলো অর্থ* । তিনি বলেন, "কোনো শব্দের অর্থ খোঁজো না, তার প্রয়োগ খোঁজো ।" (Don't look for the meaning of word, look for its use.)

তার মতে কোন শব্দের অর্থ সংজ্ঞায়িত হতে পারে সে শব্দের প্রয়োগের আবশ্যক শর্তাবলী বর্ণনার মাধ্যমে । অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন শব্দের অর্থ হলো সেই শব্দটি কোন ভাষা সম্প্রদায় কিভাবে ব্যবহার করে তার ফাংশন বা অপেক্ষক (Alston 1964: 32) । কাজেই কোন ভাষায় কোন শব্দের অর্থ জানা হলো তার প্রয়োগবিধি জানা । একইভাবে বাক্য বা উক্তির অর্থও নির্ধারিত হবে সামাজিক মানদণ্ডে । একটি ভাষাসম্প্রদায়ের প্রচলিত বিধিবিধান প্রচলের নিরিখে বিচার করে বলতে হবে কোন উক্তির অর্থ কি । যেমন *আপনাকে অনেক ধন্যবাদ* এ উক্তির অর্থ বোঝার জন্য কেবল শব্দের অর্থ জানলেই হবে না, জানতে হবে কিছু সামাজিক নিয়ম – কেন ধন্যবাদ দিতে হয়, কখন ধন্যবাদ দিতে হয়, কিভাবে ধন্যবাদ দিতে হয় ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

ভিটগেনস্টাইন মনে করেন কোন ভাষার শব্দাবলী বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের যন্ত্রপাতিস্বরূপ । যেমন কাউকে আদেশ করতে হলে বলি – *এখানে আসো, ওখানে দাঁড়াও* ; অনুরোধ করতে হলে বলি – *দয়া করে আপনার কলমটা একটু দিবেন কি, অনুগ্রহ করে আমার কথা একটু শুনুন* ; প্রশ্ন করতে হলে বলি – *আপনার নাম কি, কোথায় যাবেন* ; কাউকে অপমান করতে হলে বলি *আপনি বাজে কাজ করেছেন, এখান থেকে বেরিয়ে যান* ইত্যাদি । এরকম প্রমান আছে যে শিশুরা শব্দের কার্যকম্পাদনের শক্তি থেকে শব্দের অর্থ আয়ত্ত করতে শিখে (দ্রষ্টব্য Clark & Clark 1977: 364-368) । কাজেই কোন ভাষায় x শব্দের অর্থ কি তা নির্ধারণ করতে হলে জানতে হবে উক্ত ভাষায় শব্দটির কি কাজ বা ভূমিকা । লিয়ন্স (১৯৬৪ ঃ ৪১১) বলেন, "স্বাভাবিক যোগাযোগ এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শব্দকে আমরা সবাই একইভাগে বুঝি ।" (Normal communication rests upon the assumption that we all understand words in the same way.)

ভাষার অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সামাজিক ঐক্যের ব্যাপার আছে । কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি শব্দ কি বোঝাবে তা নির্ভর করে ভাষাব্যবহারকারীদের ঐকমত্যের উপর বা তাদের নির্ধারণ করে দেয়া নিয়মের উপর । যেমন একটি সারণী থেকে আমরা বিভিন্নভাবে অর্থ বের করতে পারি । যেমন ঃ

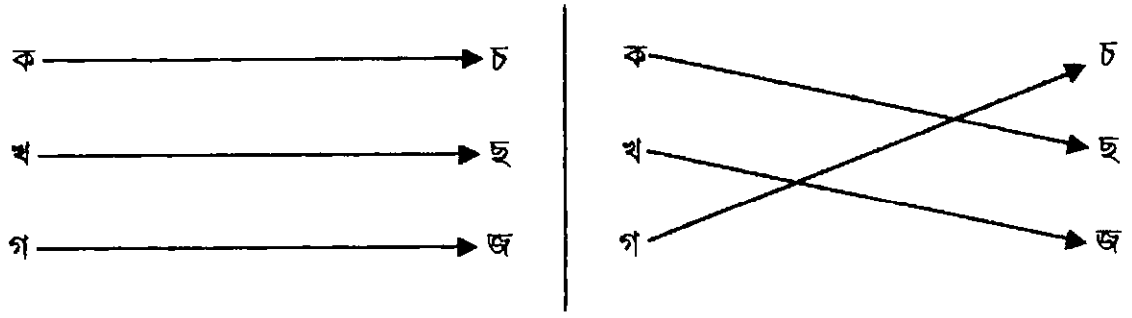

তীরচিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম যারা জানেন তারা বুঝবেন দুটি সারণী কিভাবে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে । ভাষা ব্যবহারের নিয়মও ঠিক অনুরূপ (Harrison 1979: 235) । ক্রিকেটের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা জানেন সেখানে *রান* এর অর্থ কি । এখানে রান বলতে শুধু দৌড়ানো বোঝাবে না, ইচ্ছা করলে ব্যাটস্ম্যান হেঁটেও রান নিতে পারেন, কিংবা বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে কোন নড়াচড়া না করেও রান পেতে পারেন । বেসবলের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য (Hofman 1993: 299) । ভাষা হলো শব্দের খেলা, যেখানে শব্দ খেলোয়াড়কে জানতে হয় শব্দ চালনার নিয়ম কানুন । ভাষিক ক্রীড়ার নিয়মকানুন না জানা এবং শব্দের, বাক্যের বা ভাষার অর্থ না জানা একই কথা । কাজেই প্রয়োগ তত্ত্বের মূল কথা আমরা সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করতে পারি (Akmajian et al 1995: 223) ঃ

> "কোন ভাষিক প্রকাশের অর্থ নির্ধারিত হয় ভাষা সম্প্রদায়ে এর ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সেই ব্যবহার বর্ণনা করাই ভাষার অর্থ বর্ণনা করা ।" ●

● "The meaning of an expression is determined by its use in the language community, and to specify that use is to specify its meaning." Akmajian, Demers, Farmer & Harnish. (1995), *Linguistics: An Introduction to Language and Communication*, p.223

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ তত্ত্বের কিছু অসাধারণ গুণ রয়েছে । প্রথমত, এটি দিয়ে এমন কিছু ভাষিক উপাদান ব্যাখ্যা করা যায় যা অন্য কোন তত্ত্ব দিয়ে করা যায় না । যেমন অনুভূতি প্রকাশক শব্দ (ইংরেজীতে যাদের বলে interjection) *উহ্, আহ্* প্রভৃতির অর্থ ব্যাখ্যার জন্য এ তত্ত্ব বলে যে এ জাতীয় শব্দের অর্থ কেবল বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই অনুধাবন করা যায়, কোনরকম ভাষিক বর্ণনায় তা প্রকাশ করা যায় না । দ্বিতীয়ত, সামাজিকভাবে বিধিবদ্ধ সৌজন্যবোধক ভাষা যেমন *স্বাগতম, আদাব, ধন্যবাদ, hi!, hallo, how do you do* ইত্যাদি এ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যাযোগ্য । তৃতীয়ত, অব্যয়শব্দ যেমন *এবং, কিন্তু, যদি, তবে* ইত্যাদিও এই তত্ত্বের ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে । এসব ভাষিক উপাদানের অর্থ কেবল তার প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় । নির্দেশনের মাধ্যমে বা ভাষিক বর্ণনায় বলতে পারি না *এবং* এর অর্থ হলো অমুক, যেমনভাবে আমরা বলতে পারি *কলম* হলো সেই দ্রব্য যা দিয়ে কাগজে লেখা হয় । দরকার হলে আমরা কোন কলম প্রদর্শনও করতে পারি, কিন্তু আমরা কোনকিছু প্রদর্শন করে বলতে পারবো কি এই হলো *এবং* ? চতুর্থত, এ তত্ত্বের সাহায্যে *এটা, ওটা, এখানে, ওখানে, আমি, তুমি, আজ, কাল* প্রভৃতি দ্বিবাচক উপাদান সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, অন্য তত্ত্ব দিয়ে যা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন । চতুর্থত, এই তত্ত্বে সত্যশর্তমূলক তত্ত্বের মতো কোন বচনের সত্যতা নির্ধারণের ঝামেলা নেই । বচনের অর্থ তার সত্যতার শর্তের উপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে তার প্রয়োগের উপর (Harrison 1979: 236)।

এই তত্ত্বের সমস্যাও কম নয় । প্রথমত, শব্দের অর্থকে যদি প্রয়োগ বলা হয় তবে জ্ঞানতত্ত্বই এক অর্থে অসম্ভব হয়ে পড়ে । জ্ঞানের জন্য নির্দেশন প্রয়োজন, শুধু প্রয়োগ নয় । দ্বিতীয়ত, এ তত্ত্ব অর্থকে প্রয়োগ বলেই ক্ষান্ত, কিন্তু এই প্রয়োগ বলতে কি বোঝায়, এর পরিধি কতটুকু, প্রসঙ্গের সাথে এর সম্পর্ক কি এসব তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করে না । তৃতীয়ত, এ তত্ত্ব মানুষের স্বজ্ঞা বিরোধী । অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ *অর্থ মানে প্রয়োগ* এই সরলোক্তিতে তুষ্ট নয় । মানুষের মন অর্থ দিয়ে কোন সত্তাকেই আবিষ্কারে আগ্রহী ।

প্রসঙ্গ তত্ত্ব

ভিটগেনস্টাইনের প্রয়োগতত্ত্বে প্রয়োগের কথা আছে, কিন্তু প্রসঙ্গের কথা স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি । কিন্তু এটি অস্বীকার করা যাবে না যে প্রয়োগের কথা উঠলেই প্রসঙ্গের কথা আসে । এক অর্থে ভাষার প্রয়োগ বলতে আমরা প্রসঙ্গের উপস্থিতিকে বুঝতে পারি । প্রসঙ্গ ছাড়া কোন প্রয়োগ হতে পারে না । ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে প্রসঙ্গের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । পরিস্থিতি থেকেই শব্দ বা উক্তির অর্থ স্পষ্ট হয় । শুধু *বিশ্বকাপ* শব্দটি থেকে আমরা বুঝতে পারি না এটি ফুটবল, ক্রিকেট না অন্য কোন খেলার বিশ্বকাপের কথা বলা হচ্ছে । তেমনি *খেলোয়ার* বললে আমরা বুঝতে পারি না কোন্ খেলার খেলোয়ারের কথা বলা হচ্ছে ; আবার রূপকার্থে রাজনীতি, ব্যবসা, ঝুকিপূর্ণ কাজ, যৌনাচার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও খেলোয়ার হতে পারে । প্রসঙ্গ ছাড়া *বীর* শব্দটিও বোঝা যায় না । প্রাচীনকালের প্রসঙ্গে বীর বলতে বোঝাবে বর্মাবৃত শরীরে তলোয়ার হাতে সুঠামদেহী সাহসী যুদ্ধকুশলী কোন ব্যক্তিকে, কিন্তু আধুনিককালের প্রসঙ্গে বীর বলতে বোঝাবে কর্মবীরকে, এবং বাংলাদেশের প্রসঙ্গে বীর বলতে আবার মুক্তিযোদ্ধাকে বোঝাতে পারে । আমরা নীচের সংলাপটুকুর দিকে লক্ষ্য করতে পারি ঃ

ক ঃ আপনার কাছে আগুন হবে ?
খ ঃ দুঃখিত, আমি অধুমপায়ী ।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে *আগুন* শব্দটির যে অর্থ (আগুন জ্বালানোর বস্তু, যেমন দিয়াশলাই বা লাইটার) তা কেবল প্রসঙ্গ থেকেই স্পষ্ট হয়, বিচ্ছিন্নভাবে জানা যায় না ।

প্রসঙ্গ তিন ধরনের হতে পারে ঃ শব্দগত, ভৌত ও মনস্তাত্ত্বিক (Jenkinson 1967: 92) । **শব্দগত প্রসঙ্গ** বলতে কথায় বা লেখায় নির্দিষ্ট শব্দের পরিপার্শ্ব বা পূর্বাপর ভাষাকে বুঝায় । যেমন উপরের সংলাপে *আগুন* এর শব্দগত প্রসঙ্গ হবে *আগুন* এর আশেপাশে অন্যান্য যেসব শব্দ আছে (আপনার কাছে, হবে, দুঃখিত আমি অধুমপায়ী) তাদের সমষ্টি । **ভৌত প্রসঙ্গ** হলো জাগতিক বাস্তব পরিস্থিতি যেখানে কোন ভাষিক কার্য সম্পাদিত হয় । স্থান, কাল, চলমান ঘটনাবলী ভৌত প্রসঙ্গের মধ্যে পড়ে । **মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ** বলতে বোঝায় ভাষাব্যবহার কারীর মানসিক অবস্থা – তার দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, অনুভূতি । এই তিন ধরনের প্রসঙ্গই ভাষিক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অনেকে অবশ্য প্রসঙ্গকে দুটি ভাগে ভাগ করেন । তারা আমাদের পূর্বালোচিত প্রথম শ্রেণীর প্রসঙ্গকে বলেন **ভাষিক প্রসঙ্গ** এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রসঙ্গকে একত্রে বলেন **পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গ** । সমস্ত প্রসঙ্গকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ **সম্ভাব্য প্রসঙ্গ** এবং **বাস্তবিক প্রসঙ্গ** (Dijk 1977: 192) সম্ভাব্য প্রসঙ্গ কল্পিত জগতের ঘটনাবলী এবং বাস্তবিক প্রসঙ্গ বাস্তব জগতের ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করে ।

নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনাওস্কি দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রবিয়্যান্ড দ্বীপবাসীদের ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গকে কাজে লাগান । বস্তুতঃ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় পরিস্থিতির প্রসঙ্গ অভিধাটি তারই অবদান । তিনি বলেন যে দ্বীপবাসীদের কথা বুঝতে হলে কোন্ পরিস্থিতিতে তা ব্যবহৃত হয় তা পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া উপায় নেই । যেমন, তারা নৌকা চালাতে চালাতে যখন *কাঠ* বলে তখন বুঝতে হবে তারা বৈঠাকে বোঝাচ্ছে । এভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ভাষার অর্থের উপলব্ধি হয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে, এটি নিছক চিন্তার প্রতিফলন নয় । এজন্য তিনি ভাষাকে বলেন কর্মের সংহিতা, এবং ভাষার কর্মঘনিষ্ঠ ব্যবহারকে বলেন **গভীর যোগাযোগ** (Lyons 1981: 143) ।

ম্যালিনাওস্কিকে অনুসরণ করে ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী জে. আর. ফার্থ ভাষার একটি প্রসঙ্গমূলক বিশ্লেষণ প্রদান করেন । তিনি পরিস্থিতির প্রসঙ্গের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে এটি হলো পর্যবেক্ষণসম্ভব সামাজিক ঘটনার অনুক্রম যা ভাষাব্যবহারে বক্তার ব্যকরণিক জ্ঞানের পরিপূরক । ফার্থ পরিস্থিতির প্রসঙ্গের ভিতর নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেন ঃ

ক. ভাষিক যোগাযোগে অংশগ্রহণকারীদের প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যবলী ঃ ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব
   ১. অংশগ্রহণকারীদের ভাষিক কর্ম
   ২. অংশগ্রহণকারীদের অভাষিক কর্ম
খ. প্রাসঙ্গিক বস্তুসমূহ, এবং
গ. ভাষিক কর্মের ফলাফল

ফার্থের মতে ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম । তিনি বলেন, "একটি শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ সর্বদাই প্রসঙ্গমূলক, এবং পরিপূর্ণ প্রসঙ্গহীন কোন অর্থের আলোচনাই গুরুত্ববহ নয় ।"● তার মতে অর্থ হলো

● "The complete meaning of a word is always contextual and no study of meaning apart from a complete context can be taken seriously." J. R. Firth (1957), *Papers in Linguistics*, p.7

Dhaka University Institutional Repository

ভাষিক উপাদানসমূহের সম্পর্কের বা কার্যের জালিকা । কাজেই অর্থকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে কর্ম উপাদানের তালিকা । প্রতিটি কর্ম উপাদান সংজ্ঞায়িত হবে কোন প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে কোন ভাষিক রূপের প্রয়োগ দ্বারা (Catford 1969: 252) । ফার্থের কাছে ভাষার বর্ণনামূলক অর্থের চেয়ে সামাজিক অর্থটিই প্রধান, কারণ ভাষার প্রধান কাজই হলো সামজিক যোগাযোগ সংঘটিত করা ।

ফার্থের পর হ্যালিডে, হাইমস, লুইস প্রমুখ ভাষার অর্থবিশ্লেষণে প্রসঙ্গের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের নিজস্ব প্রসঙ্গ তত্ত্বে ধারণা প্রকাশ করেন । হ্যালিডে (১৯৬১) বলেন, ভাষা হলো একটি বহুস্তরবিশিষ্ট সংগঠন এবং তাতে প্রসঙ্গের একটি স্থান রয়েছে । তিনি বলেন যে প্রসঙ্গ একদিকে শব্দ ও ব্যাকরণ এবং অন্যদিকে ভাষাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বা পরিস্থিতির সাথে যুক্ত । তার মতে, প্রসঙ্গের আলোচনা বাগর্থবিদ্যার সাথে অভিন্ন । সামগ্রিক ভাষিক তত্ত্বে হ্যালিডে প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের অবস্থানটি নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে (Hoey 1991: 195) ঃ

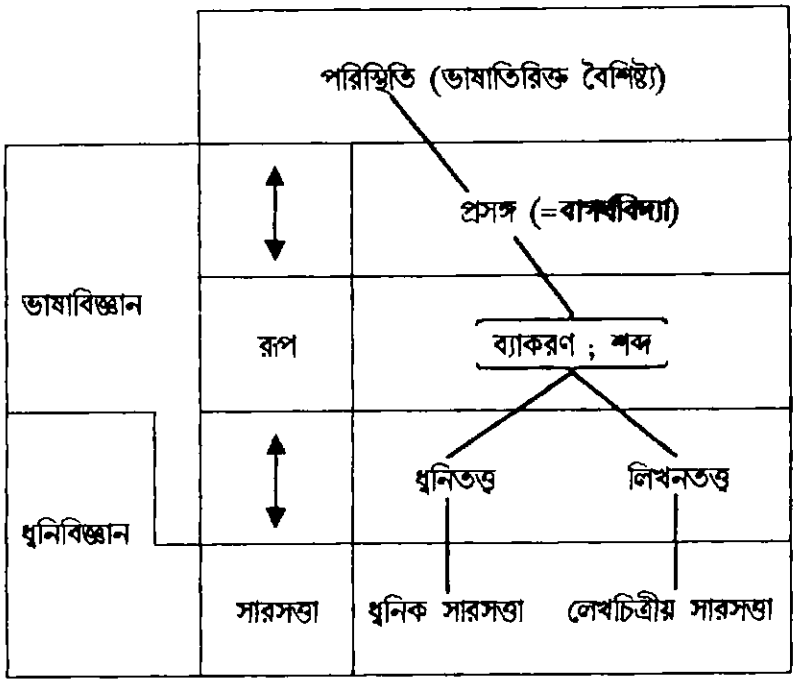

হ্যালিডের ভাষা সংগঠন

হাইমস (১৯৬৪) তার *বক্তব্য ঘটনাকে* প্রসঙ্গের ধারণায় বিশ্লেষণ করেন । বক্তব্যঘটনা সম্পন্ন হয় একজন *বক্তব্যপ্রদানকারী* ও একজন *বক্তব্যগ্রহণকারীর* মধ্যে । বক্তব্যপ্রদানকারী হতে পারে বক্তা বা লেখক এবং বক্তব্য গ্রহণকারী হতে পারে শ্রোতা বা পাঠক । বক্তব্যঘটনায় একটি *আলোচ্য বিষয়* থাকে এবং থাকে একটি *প্রতিবেশ* । বক্তব্যঘটনা সম্পাদিত হয় কোন একটি *নালার* মাধ্যমে যেমন কথা, লেখা, গান গাওয়া, কবিতা পাঠ ইত্যাদি এবং নালার থাকে আবার বিভিন্ন *সংকেতরূপ* যেমন মানভাষা, উপভাষা, ব্যবহারশৈলি ইত্যাদি । এতে আরো থাকে একটি *বাণীরূপ* যেমন খোশগল্প, তর্ক, প্রেমালাপ ইত্যাদি এবং একটি *চাবি* যা বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের সাথে যুক্ত । সবশেষে বক্তব্যকর্মের একটি উদ্দেশ্য থাকে যা অংশগ্রহণকারীরা মনের ভিতর পোষণ করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই দেখা যায় হাইম্‌সের প্রসঙ্গের বৈশিষ্ট্যাবলী একটি তালিকাস্বরূপ যা যে কোন ভাষিক কর্মের অর্থ নির্ধারণের মানদন্ড হিসাবে কাজ করে ।

লুইস (১৯৭২)ও তার তাত্ত্বিক সংগঠনে হাইম্‌সের মতো প্রসঙ্গের বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি তালিকা তৈরী করেন যার নিরিখে একটি বাক্যের সত্যতা নির্নীত হয় বলে তিনি রায় দেন । তিনি একেকটি বৈশিষ্ট্যকে একেকটি সহগরূপে প্রদর্শন করেন । তার তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

১. সম্ভাব্য পৃথিবী সহগ ঃ এটি দিয়ে বাক্যে বর্ণিত কল্পিত বা সম্ভাব্য ঘটনা ব্যাখ্যাত হয় ।

২. সময় সহগ ঃ এটি দিয়ে *আজ* কিংবা *কাল* কিংবা *পরশু* এরূপ সময় নির্দেশিত হয় ।

৩. স্থান সহগ ঃ এটি দিয়ে *এখানে* বা *ওখানে* এরকম স্থান নির্দেশিত হয় ।

৪. বক্তা সহগ ঃ এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত প্রথম পুরুষ (*আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের* ইত্যাদি) ব্যাখ্যাত হয় ।

৫. শ্রোতা সহগ ঃ এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত দ্বিতীয় পুরুষ (*তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের* ইত্যাদি) ব্যাখ্যাত হয় ।

৬. নির্দেশিত বস্তু সহগ ঃ এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত *এটি, ওটি, এগুলো, ওগুলো,* ইত্যাদি নির্দেশক উপাদান ব্যাখ্যাত হয় ।

৭. পূর্বসান্দর্ভিক সহগ ঃ এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত *পূর্বোক্ত, উপরোল্লিখিত* ইত্যাদি অতিবাক্যিক উপাদান ব্যাখ্যাত হয় ।

৮. কাজ সহগ ঃ এটি দিয়ে বক্তার অসংখ্য অনুক্রম নির্দেশিত হয় ।

প্রসঙ্গ একদিকে ভাষিক এবং অন্যদিকে অতিভাষিক উপাদান । তাই একে ভাষিক তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করা অনেক ঝামেলার কাজ । আমরা দেখেছি অধিকাংশ রূপান্তরবাদী ও যৌক্তিক বাগর্থবিদ প্রসঙ্গকে বাদ দিয়েই তাদের তত্ত্ব প্রগঠন করেছেন । তবে ভাষিক বর্ণনায় প্রসঙ্গের স্থান থাকা উচিত । নতুবা তা আদর্শায়িত হয়ে পড়ে এবং বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যায় । প্রসঙ্গবিহীন তত্ত্ব ভাষার অর্থকে সরলায়িত করে, যার ফলে এতে অর্থের স্বরূপ সঠিকভাবে চিত্রিত হয় না । কারণ ঃ

> "ভাষায় অর্থ কোন একক সম্পর্ক নয়, বরং বহুবিচিত্র সম্পর্ক যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে উক্তি ও তার অংশসমূহ এবং পরিবেশের প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের মধ্যে । এই পরিবেশ সাংস্কৃতি ও ভৌত উভয়ই, যা মানব সমাজে আন্তব্যক্তিক সম্পর্কের বিশাল সংশ্রয়ের অংশ ।" ●

● "Meaning in language is therefore not a single relation or a single sort of relation, but involves a set of multiple and various relations holding between the utterance and its parts and the relevant features and components of the environment, both cultural and physical, and forming part of the more extensive system of interpersonal relations involved in the existence of human societies." R.H. Robins (1980), *General Linguistics: An Introductory Survey*, p. 23.

Dhaka University Institutional Repository

কৃতিসাধক তত্ত্ব

জে. এল. অস্টিন (১৯৬১, ১৯৬২) সত্যশর্তমূলক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করে এর বিকল্প হিসাবে তার কৃতিসাধক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে ভাষায় এমন অনেক বাক্য আছে যেগুলো সাধারণভাবে সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। যেমন ঃ

আমি তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করছি।
আমি শিশুটির নাম রাখলাম দুখু।

এধরনের বাক্যের ব্যাপারে সত্যতা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন আসে না, যেমনভাবে আসে নীচের বাক্যগুলোতে ঃ

সে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে।
শিশুটির নাম দুখু।

অস্টিন প্রথম শ্রেণীর বাক্যকে বলেন **কৃতিসাধক**, যা ব্যবহৃত হয় কোন কিছু করার জন্য। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্যকে বলেন **বাকসাধক**, যা ব্যবহৃত হয় কোনকিছু বলার জন্য। কাজেই বলা মানে শুধু বলা নয়, বলা মানে করাও। যখন কেউ বলে *আমি শপথ করছি যে . . .* অথবা *আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে . . .* তখন সে সত্যিকার অর্থে কিছু করে। এই করা কথার মাধ্যমে করা। অন্যদিকে বাকসাধক কোন ঘটনার বিবৃতিমাত্র। তা দিয়ে কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়। কৃতিসাধক ও বাকসাধকের পার্থক্য বোঝার জন্য আমরা কিছু ইংরেজী বাক্য বিবেচনা করতে পারি (Vendler 1972: 129) ঃ

1. a. I suggest that Joe committed the crime.
   b. Joe committed the crime.
2. a. I deny having seen the victim.
   b. I have seen the victim.
3. a. I call it murder.
   b. It is murder.
4. a. I urge you to proceed.
   b. You proceeded.
5. a. I appoint you to the presidency.
   b. You are the president.
6. a. I promise to pay on time.
   b. Ipaid on time.
7. a. I apologize for having offended you.
   b. I have offended you.

Dhaka University Institutional Repository

উপরের বাক্যজোড়সমূহের প্রথমটি কৃতিসাধক এবং দ্বিতীয়টি বাকসাধক। কোন বাক্যকে কৃতিসাধক হওয়ার জন্য বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন। যেমন *আমি তোমাদের দুজনকে স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করছি*। এ বাক্যটি যে কেউ বললে বা যেখানে সেখানে বললে এটি বৈবাহিক সম্পর্কের ঘোষণা হবে না। এটি উচ্চারিত হতে হবে কোন আইনসম্মত বা ধর্মনির্ধারিত ব্যক্তি দ্বারা বিশেষ দুজন নর-নারীর সামনে স্বাক্ষীসমেত কোন আসরে। *আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার ছোটভাইকে দিয়ে গেলাম, আমি এই অভিযানের নাম দিলাম মরুঝড়* ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ কৃতিসাধককে সফল হতে হলে কতগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্ত পূরণ না করতে পারলে তা ব্যর্থ হয়ে। অস্টিন কৃতিসাধকের চারটি শর্তের কথা উল্লেখ করেন ঃ

১. একটি প্রথাগত প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকবে যেখানে একটি পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা বিশেষ শব্দগুচ্ছ উচ্চারিত হলে একটি বিশেষ প্রথাগত ফলাফল সৃষ্টি করবে।

২. প্রথাগত প্রক্রিয়াটি সম্পাদানের জন্য বিশেষ ব্যক্তি এবং পরিস্থিতি যথোপযুক্ত হবে।

৩. অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রক্রিয়াটি সঠিরভাবে বাস্তবায়িত হবে।

৪. অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে।

প্রথাগত কথামূলক কাজের জন্য এই চারটি শর্ত প্রতিপালিত হতে হবে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো যে এর জন্য কিছু প্রথাগত শব্দও নির্দিষ্ট করা থাকে। বিবাহের ক্ষেত্রে, আইনী কাজে এ ধরনের শব্দের প্রয়োগ স্পষ্ট। মুসলমানী বিবাহে কাজীর জবাবে বর কনে *কবুল* শব্দ উচ্চারণ না করলে বিবাহ হয় না। বিশেষ পারিবারিক অবস্থায় *তালাক* শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করলে বিবাহ ভঙ্গ হয়। দলিলাদির ক্ষেত্রে *আমি প্রত্যয়ন করছি যে . . . আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে . . .* এই জাতীয় শব্দের প্রয়োগ আছে। এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে কৃতিসাধনমূলক বাক্যে কর্তা হিসাবে প্রথম পুরুষ একবচন এবং ক্রিয়ার সাধারণ কাল কর্মবাচ্য রূপ ব্যবহৃত হয়।● ইংরেজীতে হয় I + present action simple verb (Coulthard 1985: 16) ঃ আমরা লক্ষ্য করতে পারি ঃ

I thank you.
I bid you welcome.

তবে সব কৃতিসাধকেরই যে এরকম বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন *যাত্রীদের সীটবেল্ট বেঁধে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হচ্ছে, সবাইকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে কেউ যাতে নকল না করে* এ ধরনের বাক্যও কৃতিসাধক। পার্থক্য করার জন্য প্রথম শ্রেণীর বাক্যকে বলা যেতে পারে **প্রকাশ্য কৃতিসাধক** এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্যকে বলা যেতে পারে **অপ্রকাশ্য কৃতিসাধক**। প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য যে কোন কৃতিসাধকই শর্তের উপর নির্ভরশীল। উপরে আমরা চারটি সাধারণ শর্ত উল্লেখ করেছি। কোন বিশেষ কৃতিসাধকের জন্য আবার বিশেষ নিয়মগুচ্ছের প্রয়োজন। এধরনের নিয়মগুচ্ছকে অস্টিন বলেন **সুখ-শর্ত**। অর্থাৎ এ বিশেষ শর্তগুলো প্রতিপালিত হলে একটি বিশেষ কৃতিসাধক

● হফম্যান (১৯৯৩ ঃ ২৮৪) লক্ষ্য করেন যে কৃতিসাধক পতনশীল স্বরভঙ্গি দ্বারাও চিহ্নিত হতে পারে। কৃতিসাধকের বাক্যতাত্ত্বিক ও ধ্বনিমূলক বৈশিষ্ট্যকে তিনি একত্রে বলেন *কৃতিসাধক চিহ্নক*।

Dhaka University Institutional Repository

সুখী বা সফল হয় এবং সেগুলো প্রতিপালিত না হলে তা অসুখী বা ব্যর্থ হয় । যেমন *প্রতিশ্রুতির* ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুখশর্ত ক্রিয়াশীল (Levinson 1983: 238-239) ঃ

১. বক্তা বলে যে সে একটি ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পাদন করবে ।

২. সেটি করার ইচ্ছা তার আছে ।

৩. সে বিশ্বাস করে যে সে তা করতে পারে ।

৪. সে মনে করে যে সাধারণ ঘটনাপ্রবাহে সে সেটি করতো না ।

৫. সে মনে করে যে এটি করুক শ্রোতা তা চায় ।

৬. প্রতিশ্রুতিমূলক বাক্যটি উচ্চারণ করে সে নিজেকে একটি বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে যায় ।

৭. বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই প্রতিশ্রুতিমূলক বাক্যটি বুঝতে পারে ।

৮. তারা উভয়েই সচেতন স্বাভাবিক মানবীয় প্রাণী ।

৯. অন্যান্য শর্ত প্রতিপালিত হলে বাক্যনিহিত বিশেষ (কৃতিসাধক) শক্তি ক্রিয়াশীল হয় ।

এগুলো প্রতিপালিত হলেই বলা যাবে কারো *আমি প্রতিশ্রুতি করছি . . .* এ জাতীয় কৃতিসাধক সুখী বা সফল হয়েছে । অন্যথায় বলতে হবে তা অসুখী বা ব্যর্থ হয়েছে ।

আমরা লক্ষ্য করে থাকবো কৃতিসাধনমূলক বাক্যে বিশেষ ধরনের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় । সব ধরনের ক্রিয়া কৃতিসাধকের উপযোগী নয় । যেমন ঃ

আমি তোমাকে পিটাচ্ছি ।
আমি প্রতিদিন সকালে দৌড়াই ।

পিটানো, দৌড়ানো ইত্যাদি ক্রিয়া কৃতিসাধনমূলক নয় । কারণ *আমি তোমাকে পিটাচ্ছি* এ কথা বললেই কাউকে পিটানো হয়ে যায় না কিংবা *আমি প্রতিদিন সকালে দৌড়াই* একথা বললেই দৌড়ানো হয়ে যায় না । কিন্তু *আমি বাজি ধরছি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি* এ ধরনের বাক্য বললে ঠিকই বাজি বা প্রতিজ্ঞা হয়ে যায় । যে ধরনের ক্রিয়া কৃতিসাধনমূলক বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাদের বলে **কৃতিসাধক ক্রিয়া** । অস্টিন কৃতিসাধক ক্রিয়াগুলোকে পাঁচটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা ঃ

১. **রায়সাধক** ঃ এ ধরনের ক্রিয়াগুলো জুরি, বিচারক বা আম্পায়ারের রায় ঘোষণার মতো, যেমন – খালাস দেয়া, গ্রেড দেয়া, পরিমাপ করা, সনাক্ত করা ।

২. **ক্ষমতাসাধক** ঃ এ ধরনের ক্রিয়াগুলো ক্ষমতা, অধিকার বা প্রভাব খাটানোর সাথে সম্পর্কিত, যেমন – নিয়োগ করা, আদেশ করা, উপদেশ দেয়া, সতর্ক করা ।

৩. **অঙ্গীকারসাধক** ঃ এ ধরনের বাক্যগুলো বক্তার তরফ থেকে কোন অঙ্গীকার বা অন্য কোন ধরনের ঘোষণার ইঙ্গিত দেয়, যেমন – প্রতিশ্রুতি করা, গ্যারান্টি দেয়া, বাজি ধরা, বিরোধিতা করা ।

৪. **আচারসাধক** ঃ এ ধরনের ক্রিয়াগুলো বিভিন্ন ধরনের মনোভাব ও সামাজিক আচরনের সাথে যুক্ত, যেমন – ক্ষমা চাওয়া, সমালোচনা করা, আশীর্বাদ দেয়া, চ্যালেঞ্জ করা ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. **চিহ্নসাধক** ঃ এ ধরনের ক্রিয়াগুলো দেখায় কিভাবে একটি সন্দর্ভে উক্তি বা উক্তিসমূহ খাপ খায় বা ব্যবহৃত হয়, যেমন – যুক্তি দেখানো, বিধিবদ্ধ করে দেয়া, নিশ্চিত করা, একমত হওয়া ।

অস্টিনের কাছে, কোন কিছু বলা মানেই কোন কিছু করা (to say something is to do something) । তিনি বলেন যে বক্তার কোন উক্তি একসাথে তিন ধরনের অর্থ প্রকাশ করতে পারে অথবা তিন ধরনের কর্ম সম্পাদন করতে পারে । এগুলো হলো ঃ

ক. **বাঙমূলক কর্ম** ঃ বাঙমূলক কর্ম হলো কোন উক্তির শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থ । যেমন কেউ যদি বলে *ওখানে সাপ আছে*, তখন শ্রোতা এর এই আক্ষরিক অর্থ আবিস্কার করি যে কোন একটি বিশেষ জায়গায় একটি বিশেষ ধরনের সরীসৃপ আছে ।

খ. **অবাঙমূলক কর্ম** ঃ অবাঙমূলক কর্ম বলতে বোঝায় আক্ষরিক অর্থের বাইরে বক্তার মনের কোন গুঢ় ভাব, যেমন কোন কৃতিসাধক । *ওখানে সাপ আছে* একথা বলে বক্তা বোঝাতে পারে যে সাবধান হও অথবা ওটাকে হত্যা করো । এ ধরনের অর্থ শ্রোতা উক্তির আক্ষরিক অর্থ থেকে উদ্ধার করেনা, উদ্ধার করে বক্তার মন পাঠের মাধ্যমে অথবা পরিস্থিতি থেকে ।

গ. **পরিবাঙমূলক কর্ম** ঃ পরিবাঙমূলক কর্ম বলতে বোঝায় শ্রোতার মনের উপর উক্তির যে ফলাফল তাকে । যেমন *ওখানে সাপ আছে* এই কথাটি বললে বক্তার মনে ভয়ের উদয় হতে পারে, ফলে সে লাফিয়ে উঠবে অথবা দৌড়ে পালাবে কিংবা তার মনে আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া হতে পারে যার ফলে সে হয়তো সাপটিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করবে । বক্তার মনের উপর এই ধরনের প্রভাবও উক্তির অর্থের অন্তর্ভুক্ত ।

এভাবেই অস্টিন তার কৃতিসাধক তত্ত্বের মাধ্যমে অর্থের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করেন, যে অর্থ আসে ভাষার বাস্তব ব্যবহার থেকে । তিনি ভাষাকে দার্শনিকের টেবিল থেকে নামিয়ে আনেন জনস্রোতে হাটেমাঠেবাঠে যেখানে সাধারণ মানুষ প্রথাগত বা সামাজিক নিয়মে ভাষা ব্যবহার করে । এজন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার । তার প্রশংসায় মান্ডল (১৯৭৯ ঃ ৮২-৮৩) বলেন ঃ

> "অস্টিন ভাষাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, ব্যাকরণে এক নূতন মাত্রা যোগ করেছেন ব্যাকরণের চেয়ে অধিক ভারিক্কিমার্কা কিছু না দিয়েও । . . . অস্টিনের লেখা মৌলিকত্ব, সূক্ষ্মতা ও বিচক্ষনতায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ।" ●

বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব

জে. আর. সার্ল (১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭৫) অস্টিনের তত্ত্বকে পরিমার্জন ও উন্নত করে একে তার বক্তব্যকর্ম তত্ত্বে রূপ দেন । তার মতে বক্তব্য মাত্রই কোন না কোন কর্ম সম্পাদন করে এবং এজন্য তিনি এ ধরনের

● "Austin made important contributions to linguistics, added a new dimension to grammar, without however representing what he was doing as something more sublime than grammar .... Austin's writings are distinguished for their originality, subtlety and wit." C. W. K. Mundle (1979), *A Critique of Linguistic Philosophy*, p. 82-83.

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকে বলেন বক্তব্যকর্ম । আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, বিবৃতি, জিজ্ঞাসা এগুলো বিভিন্ন বক্তব্যকর্ম । বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যকর্ম প্রকাশের জন্য সাধারণতঃ ভাষায় বিভিন্ন বাক্যতাত্ত্বিক রূপ থাকে । নীচে তার কয়েকটি উগাহরণ দেয়া হলো ঃ

সারণী-ক

বাক্য	ব্যাকরণগত নাম	বক্তব্যকর্ম
তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করেন ।	বর্ণনামূলক বাক্য	বিবৃতি
তুমি কি ব্যায়াম করো ?	প্রশ্নবোধক বাক্য	জিজ্ঞাসা
নিয়মিত ব্যায়াম করো ।	অনুজ্ঞাবাচক বাক্য	উপদেশ
এখান থেকে বেরিয়ে যাও ।	অনুজ্ঞাবাচক বাক্য	আদেশ
দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন ।	অনুজ্ঞাবাচক বাক্য	অনুরোধ

তবে ব্যাকরণিক বাক্য ও বক্তব্যকর্মের মধ্যে একাকক সম্পর্ক নেই । অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্য যে সবসময় বিবৃতি, প্রশ্নবোধক বাক্য যে সবসময় জিজ্ঞাসা এবং অনুজ্ঞাবাচক বাক্য যে সবসময় আদেশ-উপদেশ-অনুরোধ প্রকাশ করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই । বর্ণনামূলক বাক্য দিয়ে জিজ্ঞাসা বা আদেশ-উপদেশ-অনুরোধ, প্রশ্নবোধক বাক্য দিয়ে বিবৃতি বা জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হতে পারে । যেমন, *আমি আপনার নামটা মনে করতে পারছি না* এই বর্ণনামূলক বাক্যটি আসলে একটি জিজ্ঞাসা যার অন্তর্নিহিত বাক্যতাত্ত্বিক রূপটি হতে পারে – *আপনার নাম কি ?* আবার *আপনি কি বলতে পারেন তিনি কোথায় থাকেন ?* এই প্রশ্নবোধক বাক্যটি আসলে একটি অনুরোধ যার অন্তর্নিহিত বাক্যতাত্ত্বিক রূপটি হতে পারে – *দয়া করে তার ঠিকানাটা বলুন* । একইভাবে, *ঐ ছেলের সাথে মিশো না* এই অনুজ্ঞাবাচক বাক্যটি একটি বিবৃতি প্রকাশ করতে পারে, যার অন্তর্নিহিত বাক্যতাত্ত্বিক রূপটি হতে পারে – *ছেলেটি ভালো নয়* । বাক্যের রূপ ও বৃত্তির এই বিচ্যুতিকে নীচের সারণীতে দেখানো হয়েছে ঃ

সারণী-খ

রূপ	বৃত্তি/বক্তব্যকর্ম
বর্ণনামূলক বাক্য (আমি আপনার নামটা মনে করতে পারছিনা ।)	বিবৃতি
প্রশ্নবোধক বাক্য (আপনি কি বলতে পারেন তিনি কোথায় থাকেন ?)	জিজ্ঞাসা
অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (ঐ ছেলের সাথে মিশো না ।)	অনুরোধ

সারণী-ক -এর ক্ষেত্রে বাক্যগুলো বক্তব্যকর্মের সাথে প্রকাশ্যভাবে বা সরলরৈখিকভাবে সম্পর্কিত । সার্ল এ ধরনের বক্তব্যকর্মকে বলেন **প্রত্যক্ষ বক্তব্যকর্ম** । সারণী-খ -এর ক্ষেত্রে বাক্যগুলোর মধ্যে বক্তব্যকর্ম উহ্য রয়েছে অর্থাৎ বাক্যগুলো বক্তব্যকর্মের সাথে অপ্রকাশ্যভাবে বা আড়াআড়িভাবে সম্পর্কিত । সার্ল এ ধরনের বক্তব্যকর্মের নাম দেন **পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম** ।

Dhaka University Institutional Repository

সার্লের মতে প্রতিটি উক্তির দুটি অংশ থাকে – বচন এবং বৃত্তি নির্দেশক কৌশল । বৃত্তিনির্দেশক কৌশলই কোন উক্তির অবাঙমূলক কর্ম নির্ধারণ করে । বচন ও বৃত্তিনির্দেশক কৌশলকে সার্ল নিম্নরূপ সহজ প্রতীকে প্রকাশ করেন (Searle 1969: 31) ঃ

$$F(p)$$

এখানে, F = বৃত্তিনির্দেশক কৌশল
p = বচন

এই মৌলসূত্রকে কাজে লাগিয়ে এবার বিভিন্ন ধরনের অবাঙমূলক কর্ম দেখানো যায় ঃ

বিবৃতি	$\vdash (p)$
প্রতিশ্রুতি	$\mathrm{Pr}\ (p)$
অনুরোধ	$!\ (p)$
সতর্ককরণ	$\mathrm{W}\ (p)$
জিজ্ঞাসা	$?\ (p)$

উদাহরণসহযোগে এগুলো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । আমরা দেখবো কিভাবে একটি উক্তি ভেঙ্গে আমরা বৃত্তিনির্দেশক অংশ ও বচন পাই ।

বাক্য		বৃত্তি নির্দেশক কৌশল	বচন
তাকে ভালো মানুষ বলা যায়	=	আমি বলছি	+ সে ভালো মানুষ
আপনি টাকা ফেরত পাবেন	=	আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি	+ আমি টাকা ফেরৎ দিই
কাছে এসো	=	আমি অনুরোধ করছি	+ তুমি আমার পাশে
কুকুরটি কামড় দিতে পারে	=	আমি সাবধান করে দিচ্ছি	+ কুকুর কামড়ায়
তুমি কি পরীক্ষা দিচ্ছো	=	আমি প্রশ্ন করছি	+ তুমি পরীক্ষা দাও

উপরের বাক্যগুলোতে বৃত্তিনির্দেশক কৌশল শব্দে প্রকাশিত হয়নি । কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই তা শব্দে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যেমনটা আমরা দেখেছি কৃতিসাধকের ক্ষেত্রে যেখানে স্পষ্টতঃ একটি কৃতিসাধক ক্রিয়া থাকে । কৃতিসাধক ক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য অনেক কিছু বৃত্তি নির্দেশক কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে, যেমন শব্দক্রম, স্বরাঘাত, স্বরভঙ্গি, বিরাম, ক্রিয়ার ভাব ইত্যাদি (Coulthard 1985: 21) ।

বক্তব্যকর্মের ব্যাখ্যায় সার্ল দুই ধরনের নিয়মের মধ্যে পার্থক্য করেন – নিয়ন্ত্রক নিয়ম এবং সংঘটক নিয়ম । যে সমস্ত নিয়ম মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় **নিয়ন্ত্রক নিয়ম** ; যেমন *বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ, দেয়ালে পোষ্টার লাগানো নিষেধ, হর্ণ বাজাবেন না, কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য* ইত্যাদি । এগুলো বিশেষ শর্ত বা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ঘটনাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রন করে । অন্যদিকে যে সমস্ত নিয়ম কোন আচরণ বা ঘটনার জন্য আবশ্যক শর্ত হিসাবে কাজ করে তাদের বলে **সংঘটক নিয়ম** ; যেমন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার নিয়ম । এক্ষেত্রে যদি বিশেষ নিয়ম না থাকে তবে খেলারই অস্তিত্ব থাকে না । অর্থাৎ ফুটবলের নিয়ম ছাড়া বল নিয়ে ছোটাছুটি হলেও আমরা বলতে পারি না ফুটবল খেলা হচ্ছে কিংবা ক্রিকেটের নিয়ম ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাটবল ঠোকাঠুকি হলেও আমরা বলতে পারি না ক্রিকেট খেলা হচ্ছে । মানুষের অবাঙমুলক কর্মে তার প্রতিফলন ঘটে । যেমন প্রতিশ্রুতির জন্য চার ধরনের সংঘটক নিয়ম রয়েছে বলে সার্ল মনে করেন ঃ

১. **বাচনিক বিষয় নিয়ম** ঃ প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একজন বক্তা এমন কোনকিছুর প্রতিশ্রুতি করতে পারে না যা অন্যে করে দিবে ।

২. **প্রস্তুতিমুলক নিয়ম** ঃ (ক) যদি বক্তা বিশ্বাস না করে যে শ্রোতা প্রতিশ্রুত ঘটনা কামনা করেনা অথবা শ্রোতা যদি প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অবগত না থাকে তবে প্রতিশ্রুতি ত্রুটিপূর্ণ হবে । (খ) বক্তা এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি করতে পারে না যা স্বাভাবিকভাবে তার নিকট থেকে আশা করা হয় । প্রতিশ্রুতি এরকম হলে তা বক্তাকে আনন্দিত করার বদলে উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে । কোন স্বামী যদি বলে যে *আগামী সপ্তাহে আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো,* তবে স্ত্রী বেচারীর উদ্বেগ বাড়বে বৈ কমবে না ।

৩. **আন্তরিকতা নিয়ম** ঃ প্রতিশ্রুত কর্ম সম্পাদনের জন্য বক্তার ইচ্ছা থাকতে হবে । যদি ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কেউ প্রতিশ্রুতি করে তবে বলতে হবে সে ভাষার অপব্যবহার করছে ।

৪. **অত্যাবশ্যক নিয়ম** ঃ প্রতিশ্রুতির শব্দ উচ্চারণ করে বক্তা একটি বাধ্যবাধকতার ভিতর জড়িয়ে পড়ে ।

আমরা যদি প্রতিশ্রুতির জন্য অস্টিনের সুখ-শর্ত ও সার্লের সংঘটক নিয়মের তুলনা করি তাহলে দেখবো যে এদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই । প্রথম জন প্রতিশ্রুতিকে ব্যাখ্যা করেন শর্তের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়জন ব্যাখ্যা করেন নিয়মের মাধ্যমে । উভয়েই একই সত্য তুলে ধরে যে প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য বক্তব্যকর্ম নির্ভর করে কিছু প্রথাগত সামাজিক নিয়মের উপর করে যা ছাড়া ভাষিক যোগাযোগ অর্থহীন ।

সার্ল দাবি করেন যে কোন বক্তব্য কর্মের জন্য এই চার প্রকার সংঘটক নিয়ম কাজ করে । যেমন *অনুরোধ* বা *সতর্ককরণের* জন্য আমরা বাচনিক বিষয় নিয়ম, প্রস্তুতিমূলক নিয়ম, আন্তরিকতা নিয়ম ও অত্যাবশ্যক নিয়ম প্রণয়ন করতে পারি । বক্তাকে S, শ্রোতাকে H, কর্মকে A এবং ঘটানাকে E ধরে আমরা অনুরোধ ও সতর্ককরণের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম পাবো । তুলনার জন্য তাদের একই সারণীতে স্থাপন করা যায় (Levinson 1983:240) ঃ

নিয়ম	অনুরোধ	সতর্ককরণ
বাচনিক বিষয়	H এর ভবিষ্যৎকর্ম A	ভবিষ্যৎ ঘটনা E
প্রস্তুতিমূলক	ক. S বিশ্বাস করে H A করতে পারে	ক. S মনে করে যে E ঘটবে এবং তা H এর জন্য ভালো হবে না
	খ. H বলা ছাড়া A করতো কিনা তা স্পষ্ট নয়	খ. S মনে করে যে E যে ঘটবে তা H এর কাছে স্পষ্ট নয়
আন্তরিকতা	S চায় H A করুক	S বিশ্বাস করে যে E ঘটুক তা H এর কাম্য নয়
অত্যাবশ্যক	H এর মাধ্যমে A করানোর প্রচেষ্টা	H এর স্বার্থের বিরুদ্ধে E এর সংঘটনের সূত্রপাত

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখেছি অস্টিন কৃতিসাধক ক্রিয়াসমূহকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছিলেন। সার্লের প্রচেষ্টাও ছিলো অনুরূপ। তিনি সমস্ত বক্তব্যকর্মকে পাঁচটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এগুলো নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) **প্রতিনিধিত্বকর্ম** ঃ এ ধরনের বক্তব্যকর্ম প্রকাশিত বচনের সত্যতার প্রতি বক্তার বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে। যেমন ঃ বর্ণনা করা, সিদ্ধান্তে আসা ইত্যাদি।

(২) **নির্দেশকর্ম** ঃ এ ধরনের বক্তব্যকর্ম বক্তার পক্ষ থেকে শ্রোতার প্রতি কোন নির্দেশ জারি করে। যেমন ঃ অনুরোধ করা, প্রশ্ন করা ইত্যাদি।

(৩) **অঙ্গীকারকর্ম** ঃ এ ধরনের বক্তব্যকর্ম বক্তার পক্ষ থেকে কোন ভবিষ্যৎ কাজের ইঙ্গিত দেয়। যেমন ঃ প্রতিজ্ঞা করা, ভীতিপ্রদর্শন করা, প্রস্তাব করা ইত্যাদি।

(৪) **প্রকাশকর্ম** ঃ এ ধরনের বক্তব্যকর্ম বক্তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন ঃ ধন্যবাদজ্ঞাপন, ক্ষমাপ্রার্থনা, অভ্যর্থনা জানানো ইত্যাদি।

(৫) **ঘোষণাকর্ম** ঃ এ ধরনের বক্তব্যকর্ম প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত করে। যেমন ঃ যুদ্ধ ঘোষণা, নামকরণ, বরখাস্ত করা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত প্রতিটি শ্রেণীকে আবার বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। রিচার্ডস ও শ্মিড্ট (১৯৮৩ ঃ ৩৮-৪১) এরকম কিছু পন্থা প্রদর্শন করেছেন। নীচে আমরা কেবল প্রতিনিধিত্বকর্মের উপশ্রেণীসমূহ আলোচনা করবো। আমরা দেখেছি প্রতিনিধিত্বকর্মের সাথে বক্তার বিশ্বাস জড়িত, কিন্তু এই বিশ্বাস নানাভাবে উপলব্ধ হতে পারে।

(ক) বিশ্বাসটি বক্তার নিজের মতামত থেকে এসেছে
   ১) সময়সংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকে (নিশ্চিত করা, অভিযোগ করা, বর্ণনা করা, দাবি করা, ঘোষণা করা, পালন করা)
   ২) ভবিষ্যৎ সময় নির্দেশে (পূর্বঘোষণা করা, অনুমান করা, ভবিষ্যতবাণী করা)
   ৩) অতীত সময় নির্দেশে (প্রতিবেদন দেয়া, পুনঃগণনা করা)

(খ) বিশ্বাসটি যাচাইযোগ্য জ্ঞানের সাথে যুক্ত (উপদেশ দেয়া, ঘোষণা করা, জানানো, উদ্‌ঘাটন করা, পরীক্ষা করা)

(গ) বিশ্বাসটি কোন সত্য অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত (মূল্যায়ন করা, প্রত্যয়ন করা, সিদ্ধান্ত নেয়া, বিচার করা, সত্যতা প্রতিপাদন করা)

(ঘ) বিশ্বাসটি পূর্বের কোন বিশ্বাসের বিরোধী (স্বীকার করা, রাজী হওয়া, অনুমোদন দেয়া, সম্মত হওয়া)

(ঙ) বক্তার মধ্যে আর বিশ্বাসটি বর্তমান নেই (সংশোধন করা, নিন্দা করা, অস্বীকার করা)

(চ) বিশ্বাসটির সাথে অন্য কারো সংযুক্তি রয়েছে (একমত পোষণ করা, গ্রহণ করা, সম্মত হওয়া)

(ছ) বিশ্বাসটির সাথে অন্য কারো সংযুক্তি নেই (ভিন্নমত পোষণ করা, অসম্মত হয়, প্রত্যাখ্যান করা)

Dhaka University Institutional Repository

(জ) বিশ্বাসটি প্রমানিত নয় (কল্পনা করা, প্রকল্প গঠন করা, চিন্তা করা)

(ঝ) বিশ্বাসটি বিবেচনার যোগ্য (সত্য বলে ধরে নেয়া, বিধিবদ্ধ করা, তত্ত্বায়িত করা)

(ঞ) বিশ্বাসটি সকলের নয় (তর্ক করা, আপত্তি করা, প্রতিবাদ করা)

আকমাজিয়্যান ও অন্যান্য (১৯৯৫) বক্তব্যকর্মকে আরো ব্যাপক পরিসর থেকে বিবেচনা করেন। তারা শব্দোচ্চারণ এবং বচনকেও বক্তব্যকর্মের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্য দুটি বক্তব্যকর্ম হলো অবাঙমূলক বক্তব্যকর্ম এবং পরিবাঙমূলক বক্তব্যকর্ম। নিম্নলিখিত চিত্রে তাদের বিভাজন স্পষ্ট হয়েছে ঃ

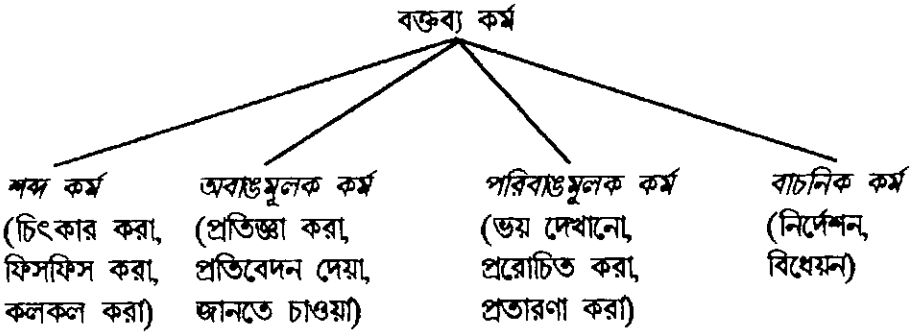

(Akmajian et al 1995: 337)

হারফোর্ড ও হীসলী (১৯৮৩ ঃ ২৪৮)ও একই অভিমত পোষণ করেন। তারা শব্দকর্মের নাম দেন ধ্বনিক কর্ম, কারণ এর দ্বারা কেবল ভৌত শব্দ নির্দেশিত হয়। কিন্তু আমরা মনে করি এই পরিকল্পনা বিভ্রান্তিকর। প্রথমত, শব্দ বা ধ্বনিক কর্ম যদি বক্তব্যকর্ম হয় তাহলে কল কারখানার আওয়াজ, মেঘের গর্জন, জীবজন্তুর হুংকার প্রভৃতিকে বক্তব্যকর্ম বলে গণ্য করতে হবে যা অবাস্তব বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, সার্ল স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে কোন বাক্য বা উক্তির অন্তর্নিহিত বচনে কোন প্রকার বক্তব্যকর্ম থাকে না, এটি বাক্যে বচনের বাইরে বাক্যের বৃত্তি নির্দেশক কৌশলে। তৃতীয়ত, পরিবাঙমূলক কর্ম অনুভূত হয় শ্রোতার মনে প্রতিক্রিয়া হিসাবে, একে বক্তব্যকর্ম বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা স্পষ্ট নয়।

আমরা শুরুতে দেখেছি যে সার্ল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্যকর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এখানে আমরা পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম নিয়ে আরেকটু আলোচনা করবো। পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম সাধারণ ভাষার একটি সহজদৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। বক্তা অনেক সময় ইচ্ছা করেই তার বক্তব্য পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন। দ্ব্যর্থকতার সুবাধে এর মাধ্যমে অনেক অপ্রীতিকর অবস্থা এড়ানো সম্ভব হয় (দ্রষ্টব্য, *অস্পষ্টতা*, পঞ্চম অধ্যায়)। নীচে পরোক্ষ বক্তব্যকর্মের সহজবোধ্য কিছু উদাহরণ প্রদত্ত হলো ঃ

তরকারিটা খুব স্বাদ হয়েছে (= আমাকে আরেকটু তরকারি দিন)

আপনি আমার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন (= পা সরান)

Dhaka University Institutional Repository

আপনার পাগড়িটা মাথায় থাকলে আমি সামনের দৃশ্য দেখতে পারি না (= পাগড়িটা খুলে রাখুন)

আমি বেশি কথা পছন্দ করি না (= আপনি চুপ করুন)

কড়কড়া মাছ ভাজা খেতে চাইলে তেলও সেরকম দিতে হয় (= তাড়াতাড়ি কাজ চাইলে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিন)

আমার যদি ওরকম একটা কলম থাকতো (= কলমটা আমাকে দিয়ে দাও)

এমন কেউ কি পৃথিবীতে আছে যে টাকা চায় না (= আমার টাকা চাই)

একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না (= তুমি মিথ্যা কথা বলছো)

আমার বাসে চড়লে বমি আসে (= রিক্সা নাও)

আমার চানাচুর খাওয়ায় ডাক্তারের নিষেধ আছে (= মিষ্টি থাকলে দিন)

এটা সবাই পারে (= তুমি কোন আহামরি কাজ করোনি)

এক মাঘে শীত যায় না (= তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দিবো)

এখন প্রশ্ন হলো পরোক্ষ বক্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে শ্রোতা কিভাবে বুঝতে পারে যে বক্তা শব্দগত অর্থের বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলছে ? সার্ল এর জবাবে বলেন যে বক্তা একটি অনুমানমূলক প্রক্রিয়ায় এ তথ্য আবিস্কার করে । এজন্য তাকে ধাপে ধাপে যুক্তি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয় (যদিও মানব মস্তিষ্কে ব্যাপারটি ঘটে চকিতে) । যেমন ঃ

ক ঃ চলো সিনেমা দেখে আসি ।
খ ঃ আগামীকাল পরীক্ষা আছে ।

এখানে খ পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলো যে সে সিনেমা দেখতে যাবে না । কিন্তু ক ব্যাপারটি বুঝতে পারলো কিভাবে ? সার্লের ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে আমি যদি ক হই তাহলে সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য আমাকে অন্ততঃ দশটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে (Searle 1975: 163) ঃ

ধাপ ১ ঃ আমি একটি প্রস্তাব দিয়েছি এবং উত্তরে খ বললো যে তার পরীক্ষা আছে । (পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ)

ধাপ ২ ঃ আমি ধরে নেই যে খ কথোপকথনে সহায়তা করছে এবং সেজন্য তার মন্তব্য প্রাসঙ্গিক । (কথোপকথনের সহযোগিতা নীতি)

ধাপ ৩ ঃ একটি প্রাসঙ্গিক উত্তর অবশ্যই গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হবে । (বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব)

ধাপ ৪ ঃ কিন্তু আক্ষরিক উক্তি এর কোনটা নয়, কাজেই উক্তিটি প্রাসঙ্গিক নয় । (১ ও ৩ থেকে অনুমান)

ধাপ ৫ ঃ কাজেই খ সম্ভবত আক্ষরিক অর্থের অতিরিক্ত কিছু বলতে চাইছে । (১ ও ৪ থেকে অনুমান)

ধাপ ৬ ঃ আমি জানি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অনেক সময় দরকার এবং সিনেমা দেখার জন্যও বেশ সময় দরকার । (পূর্ব বাস্তব জ্ঞান)

Dhaka University Institutional Repository

ধাপ ৭ ঃ কাজেই একসাথে খ দুইদিকে সময় ব্যয় করতে পারে না। (৬ থেকে অনুমান)

ধাপ ৮ ঃ খ পরীক্ষা ভালো করতে চায়। (৫, ৬ ও ৭ থেকে অনুমান)

ধাপ ৯ ঃ কাজেই সে এমন কিছু বলেছে যা আমার প্রস্তাবনা বিরোধী। (১, ৭ ও ৮ থেকে অনুমান)

ধাপ ১০ ঃ কাজেই সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। (৫ ও ৯ থেকে অনুমান)

শ্রোতা এভাবে ধাপে ধাপে অনুমানের মাধ্যমে পরোক্ষ বক্তব্যকর্মের অর্থ উদ্ধার করে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। এটি অভিজ্ঞতামূলক যাচাইপ্রক্রিয়ায় পরীক্ষিত হতে পারে। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে শ্রোতা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তার সাংসারিক জ্ঞান ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে থাকেন। এজন্য শ্রোতার তরফ থেকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব থাকলে, পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম অসফল হতে পারে। যেমন শিশু কিংবা হাবাগোবা শ্রোতা হলে সে পরোক্ষ বক্তব্যের অর্থ ধরতে পারবে না।

টিউন এ ফান ডিইক (১৯৭৭)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়ে বক্তব্যকর্মের আলোচনা শেষ করতে চাই। ডিইক লক্ষ্য করেন যে একাধিক বক্তব্য একত্রে যুক্ত হয়ে বক্তব্য অনুক্রম গঠন করতে পারে। এটি অনেকটা জটিল ও যৌগিক বাক্য গঠনের মতোই। আবার অনেকগুলো বক্তব্যকর্ম একসাথে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে। এ ধরনের বক্তব্য কর্মের গুচ্ছকে ডিইক বলেন **মহাবক্তব্যকর্ম**। মহাবক্তব্যকর্ম ভাষায় বিরল নয় এবং তাদের চিহ্নিত করাও খুব কষ্টকর নয়। যেমন – নীতি গল্প। নীতি গল্প শোনানোর পর বলা হয়ে থাকে *কাজেই আমরা এ গল্প থেকে ও শিক্ষ পাচ্ছি যে . . .*। সেই শিক্ষাটাই হলো মহাবক্তব্য কর্মের মূল অর্থ। একইভাবে সভা সমিতিতে আলাপ আলোচনার শেষে বলা হয় *কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে . . .*। জুরিদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত, সংসদীয় অধিবেশন প্রভৃতিও মহাবক্তব্যকর্মের উদাহরণ।

মানুষের ব্যবহৃত ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় বক্তব্যকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। কেম্পসন (১৯৭৭) বক্তব্যকর্ম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনাকে **বক্তব্যকর্ম বাগর্থবিদ্যা** নামে অভিহিত করেন। তিনি দেখান যে সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার চেয়ে বক্তব্যকর্ম বাগর্থবিদ্যা অনেক বাস্তবভিত্তিক এবং অধিক সম্ভাবনাময়। এতে রৌপিক দর্শনের কৃত্রিম ভাষাজনিত সীমাবদ্ধতা নেই। এটি শুধুমাত্র ভাষিক যোগ্যতাকে ব্যাখ্যা করে না, বৃহৎ পরিসরে মানুষের যোগাযোগীয় যোগ্যতার ব্যাখ্যা প্রদান করে। আর যোগাযোগীয় যোগ্যতার ব্যাখ্যা অবশ্যই ভাষার ব্যবহার তত্ত্ব (Kempson 1977: 55)।

ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব

এইচ. পি. গ্রাইস (১৯৭৫, ১৯৮১) মানুষ কিভাবে ভাষা ব্যবহার করে তার ব্যাখ্যাস্বরূপ ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব প্রগঠন করেন। তিনি বলেন যে কথোপথনের সময় মানুষ একটি অলিখিত মৌলিক নীতি মেনে চলে যা কার্যকরীভাবে ভাষা ব্যবহারের নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে। তিনি এর নাম দেন **সহযোগিতা নীতি**। সহযোগিতা নীতিটি হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"কথোপথনের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তুমি এর যে পর্যায়ে আছো সে প্রয়োজন অনুযায়ী তাতে অবদান রাখো ।" (Make your contribution such as is required at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.)

এই সহযোগিতা নীতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখান যে এর অভ্যন্তরে চারটি নীতিসূত্র রয়েছে । এই চারটি নীতিসূত্র পালন বা লঙ্ঘনের উপর যোগাযোগের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে । এগুলো নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **গুণের নীতিসূত্র** ঃ
তোমার অবদান যেন সত্য হয়, বিশেষ করে
ক. এমন কিছু বলো না যা তুমি মিথ্যা বলে বিশ্বাস করো
খ. এমন কিছু বলো না যার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমান নেই

২. **পরিমানের নীতিসূত্র** ঃ
ক. কথোপকথনের বর্তমান উদ্দেশ্যে যতটুকু প্রয়োজন তোমার অবদানকে ততটুকু তথ্যবহুল করো
খ. তোমার অবদানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্যবহুল করো না

৩. **প্রাসঙ্গিকতার নীতিসূত্র** ঃ
তোমার অবদান যেন প্রাসঙ্গিক হয়

৪. **কৌশলের নীতিসূত্র** ঃ
প্রাঞ্জলভাবে বলো এবং বিশেষ করে
ক. অস্পষ্টতা এড়িয়ে চলো
খ. দ্ব্যর্থকতা এড়িয়ে চলো
গ. সংক্ষেপে বলো
ঘ. গুছিয়ে বলো

কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীগণ আশা করে যে উভয় পক্ষ এই নীতিসূত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে । আপাতদৃষ্টিতে কোন নীতিসূত্রের লঙ্ঘন দৃষ্টিগোচর হলেও শ্রোতা ধরে নিবে গভীর পর্যায়ে বক্তা নীতিসূত্র পালন করেছে । নীতিসূত্রগুলি কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি● বিবেচনা করতে পারি ঃ

১. ক ঃ আপনি সুচিত্রা সেনকে পছন্দ করেন ?
খ ঃ আমি তার সব ছবি দেখেছি ।

● উদাহরণগুলি ডঃ রাজীব হুমায়ুনের সাথে কথোপকথন থেকে নেয়া ।

Dhaka University Institutional Repository

২. ক ঃ বিয়ে করেছেন ?
খ ঃ আমার দুই ছেলে এক মেয়ে ।

৩. ক ঃ চলো কক্সবাজার বেড়িয়ে আসি ।
খ ঃ পকেট একদম খালি ।

উদাহরণ ১ -এ আমরা দেখি যে খ ক -এর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়নি । যেখানে তার উত্তর হ্যাঁ বা না হওয়া উচিত ছিল সেখানে সে বলছে *আমি তার সব ছবি দেখেছি* । এখানে সহযোগিতা নীতির আপাত লঙ্ঘন ঘটেছে । খ গুণ, পরিমান, প্রাসঙ্গিকতা ও কৌশলের নীতিসূত্র মানেনি বলে মনে হয় । কিন্তু যোগাযোগ সফল হতে হলে সহযোগিতা নীতি মানতেই হবে । এই প্রত্যয় থেকে ক ধরে নেয় যে খ -এর উত্তর সত্য, কোন না কোনভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক পরিমান ও কৌশলে প্রদত্ত । ফলে সে খ -এর উক্তির বাইরের অবয়ব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এর অভ্যন্তরে, বাহ্যিক অর্থের বদলে খুঁজে বের করে এর অন্তর্গত অর্থ – উত্তরকে সহযোগিতা নীতির মাধ্যমে সঠিকভাবে সম্পর্কিত করে প্রশ্নের সাথে । ফলে ক বুঝতে পারে যে খ বলছে সে সুচিত্রা সেনকে খুবই পছন্দ করে । উদাহরণ ২ ও ৩ এর ব্যাপারেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য । ২ -এ ক এর প্রশ্নের জবাবে *আমার দুই ছেলে এক মেয়ে* খ -এর এই উত্তর এবং ৩ -এ ক এর প্রশ্নের জবাবে *পকেট একদম খালি* খ -এর এই উত্তর পরোক্ষ । এই পরোক্ষ উত্তরকে প্রশ্নের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সম্পর্কিত করতে হলে তার উপর সহযোগিতা নীতি আরোপ করতে হবে । ক যদি তা সফলভাবে করতে সক্ষম হয় তাহলে সে খ এর উক্তির সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারবে । বিষয়টি যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বাস্তবে ভাষা ব্যবহারকারীরা প্রায়ই পরোক্ষ উক্তি করে থাকে এবং শ্রোতাকে তার সঠিক অর্থ খুঁজে বের করতে হয় । কথোপকথনে ব্যবহৃত পরোক্ষ উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থকেই গ্রাইস বলেন **ইঙ্গিতার্থ** এবং এর থেকেই তার তত্ত্বের নাম হয়েছে **ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব** ।

গ্রাইস বলেন যে প্রতিটি উক্তিরই একটি শব্দগত অর্থ আছে যা থেকে নির্ধারিতভাবে কিছু ইঙ্গিতমূলক অর্থ আবিস্কার করা যেতে পারে । এ ধরনের অর্থকে বলা যেতে পারে **প্রচলনির্ভর ইঙ্গিতার্থ** । যেমন *হ্যাবলাও পরীক্ষায় পাস করেছে* – শব্দগুণে এর ইঙ্গিতার্থ হলো অন্যেরা পাস করেছে এবং হ্যাবলাও তাদের সাথে কোনরকমে উৎরে গেছে । গ্রাইসের তত্ত্বের ইঙ্গিতার্থ প্রচলনির্ভর বা প্রথাগত নয় । এ ধরনের ইঙ্গিতার্থের ব্যবহার কেবল কথোপকথনেই পরিলক্ষিত হয় যা আসে সহযোগিতা নীতির প্রতিশ্রুতিতে । এজন্যই গ্রাইসের ইঙ্গিতার্থকে বলা হয় **কথোপকথনমূলক ইঙ্গিতার্থ** । তবে কথোপকথনমূলক ইঙ্গিতার্থের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, । একে তার অস্তিত্বের জন্য আংশিকভাবে প্রচলনির্ভর অর্থের উপর নির্ভর করতে হয় । প্রচলনির্ভর অর্থ যেখানে অপ্রযোজ্য, সেখাইে ইঙ্গিতার্থ প্রযোজ্য হয় । ব্রাউন ও ইউল (১৯৮৩ ঃ ৩৩) বলেন ঃ

> ইঙ্গিতার্থ হচ্ছে অর্থের প্রায়োগিক দিক এবং তার কিছু সনাক্তিযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এটি অংশত উক্তির প্রচলনির্ভর বা আক্ষরিক অর্থ থেকে আহরিত হয়, যে উক্তি উৎপন্ন কোন বিশেষ প্রসঙ্গে যেখানে থাকে বক্তা ও শ্রোতা যারা সহযোগিতা নীতি ও তার নীতিসূত্রসমূহ মেনে চলে । ●

● "Implicatures are pragmatic aspects of meaning and have certain identifiable characteristics. They are partially derived from the conventional or literal meaning of an utterance, produced in an specific context which is shared by

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলনির্ভর ইঙ্গিতার্থ ও কথোপকথনমূলক ইঙ্গিতার্থ অর্থের দুটি ভিন্ন দিক এবং তাদে গুরুত্ব ভিন্ন । হর্ন (১৯৮৮ ঃ ১২৩) তাদের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য নির্দেশ করেন ঃ

প্রচলনির্ভর ইঙ্গিতার্থ	কথোপকথনমূলক ইঙ্গিতার্থ
ক) এটি প্রকাশের উপর যথাযোগ্যতার শর্ত আরোপ করে ।	ক) এটি প্রকাশের উপর সত্যশর্ত আরোপ করে ।
খ) এটি শব্দের প্রথাগত অর্থ থেকে প্রাপ্ত ।	খ) এটি কি এবং কিভাবে বলা হলো তা থেকে প্রাপ্ত।
গ) একে কোন অবস্থাতেই বাতিল করা যায় না ।	গ) একে কৌশলে বাতিল করা যেতে পারে ।
ঘ) এটি পৃথকযোগ্য ; দুটি সমনামের প্রচলনির্ভর ইঙ্গিতার্থ ভিন্ন হতে পারে ।	ঘ) এটি প্রথম তিনটি নীতিসূত্র থেকে আসলে পৃথকযোগ্য, চতুর্থ নীতিসূত্র থেকে আসলে পৃথকযোগ্য নয় ।
ঙ) এটি বিধিবদ্ধ এবং এর জন্য হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নেই ।	ঙ) এটি সহযোগিতা নীতি এবং তার নীতিসূত্রসমূহ থেকে হিসাবনিকাশ করে বের করতে হয় ।
চ) এর উপর শব্দের প্রক্ষেপন নীতি প্রযোজ্য হয় ।	চ) এর উপর শব্দের প্রক্ষেপন নীতি প্রযোজ্য হয় না ।

বক্তার পক্ষ থেকে কোন নীতিসূত্রে লঙ্ঘন এবং শ্রোতার পক্ষ থেকে তার ব্যাখ্যা কিভাবে হয় তা বোঝার জন্য আমরা এখানে আরো কিছু কথোপকথন বিবেচনা করবো ঃ

ক (পথিককে) ঃ গাড়ীর তেল ফুরিয়ে গেছে ।
খ ঃ সামনেই একটি তেলের ডিপো আছে ।

খ -এর উক্তিতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রাসঙ্গিকতা মূলসূত্রের লঙ্ঘন ঘটেছে । কারণ ক তাকে জিজ্ঞেস করেনি কোথায় তেলের ডিপো আছে । কিন্তু খ ক -এর উক্তি থেকে তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকর্ম আবিস্কার করেছে এবং সে অনুযায়ী মন্তব্য করেছে । আবার সহযোগিতা নীতি অনুযায়ী ক ধরে নিবে যে খ -এর উক্তিটি প্রাসঙ্গিক এবং সে সত্য কথা বলছে । তেলের ডিপোটি বেশি দূরে নয়, সেটি এখন খোলা আছে এবং কেনার মতো পর্যাপ্ত তেল সেখানে আছে । এসব যদি সত্য না হয় তবে খ একজন প্রতারক অথবা সে ক -এর সাথে মশকরা করছে । সহযোগিতা নীতিতে প্রতারণা বা মশকরার স্থান নেই । যদি ক -এর সহযোগিতা নীতিতে বিশ্বাস থাকে তবে সে খ -কে ধন্যবাদ জানিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে তেলের ডিপোর সন্ধানে যেখানে খ এর উক্তির সত্যসত্য বিচার হবে ।

ক ঃ চলো বাচ্চাদের কিছু কিনে দেই ।
খ ঃ হ্যাঁ দেয়া যায়, তবে আই-সি-ই-সি-আর-আই-এম-ই নয় ।

এখানে দেখা যায় খ কৌশলের নীতিসূত্র লঙ্ঘন করেছে যে উক্তিকে প্রাঞ্জল হওয়া উচিত (খ শব্দ উচ্চারণ না করে ইংরেজী ভাষায় বানান উচ্চারণ করেছে ।) এখানে প্রসঙ্গের ব্যাপারটি স্পষ্ট । দুজন স্বামীস্ত্রী তাদের

---

the speaker and the hearer and depend on a recognition by the speaker and the hearer of the cooperative principle and its maxims." Gillian Brown & George Yule (1983), *Discourse Analysis*, p.33.

Dhaka University Institutional Repository

বাচ্চকাচ্চা নিয়ে ঘুরতে বেড়িয়েছে মার্কেটে অথবা পার্কে এবং এটাও স্পষ্ট যে বাচ্চাগুলো ইংরেজী বোঝে না । খ -এর কৌশল মুলসূত্র লঙ্ঘন থেকে ক ধরে নিবে যে সেখানে তার জন্য কিছু জরুরী তথ্য আছে । যেমন খ চায় ক বাচ্চাদের আইসক্রিম কিনে না দিক কারণ তাতে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগতে পারে অথবা খ সরাসরি আইসক্রিম শব্দটি উচ্চারণ করেনি কারণ তাতে হয়তো বাচ্চারা ঐ জিনিসটি খাওয়ার জন্যই গোঁ ধরবে । এভাবেই ক খ -এর উক্তির কৌশলগত বিচ্যুতির ব্যাখ্যা খুঁজে বের করে ।

ক ঃ এখন কয়টা বাজে বলতো ।
খ ঃ ঐ তো দুধওয়ালা এসেছে ।

উপরের কথোপকথনটির ব্যাখ্যা কি ? খ কি বোঝাতে চাইছে ক তা কি করে জানতে পারে ? আপাতদৃষ্টিতে খ -এর উক্তিটি অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও ক সহযোগিতা নীতির ফলে ধরে নিবে এটি কোন না কোনভাবে প্রাসঙ্গিক । প্রথমত, দুধওয়ালা একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসে ক এবং খ উভয়েই তা জানে, সেটি হতে পারে সকাল সাতটা অথবা বিকাল পাঁচটা । দ্বিতীয়ত, খ ঘড়ি দেখার ঝামেলা এড়াতে চাইছে এবং সে ধরে নিয়েছে ক -এর একেবারে সঠিক সময়টি (ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ড উল্লেখসহ) দরকার নেই । তাই সে চাক্ষুষ ঘটনা থেকেই খ -কে প্রয়োজনীয় তথ্যটি সরবরাহ করেছে ।

ক ঃ তার সাথে লাগতে যেয়ো না, চাকরি খোয়াবে ।
খ ঃ হ্যাঁ, সে অফিসের বড় বস্ তো !

এখানে খ যা বলছে তা বোঝাচ্ছে না । সে যাকে বড় বস্ বলেছে সে যে আসলে তা নয় এটি ক ও খ উভয়ের জানা আছে । তাহলে বলতে হয় খ মিথ্যা বলেছে এবং গুণের নীতিসূত্র লঙ্ঘন করেছে । এবং খ -এর এই আপাত মিথ্যা বলা ক -এর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ । ক সহযোগিতা নীতিতে বিশ্বাসী এবং সে ধরে নিবে যে খ এর মিথ্যায় কোন সত্য লুকিয়ে আছে । জাগতিক জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সহযোগিতা নীতির ভিত্তিতে ক এই সিদ্ধান্তে পৌছে যে খ ব্যঙ্গ করছে এবং সে মনে করে না অফিসের বড় বস্ বলে উল্লেখিত ব্যক্তি তার চাকুরির ক্ষতি করতে সক্ষম । আমরা অনুসন্ধান করলে দেখবো ব্যাজোক্তিও সৃষ্টি হয় গুণের নীতিসূত্র লঙ্ঘন করার ফলে । যেমন ঃ

ক ঃ আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি ।
খ ঃ খুব ভালো করেছো ।

এখানে স্পষ্টতই খ ভালো বলে তার উল্টোটাই বোঝাতে চাইছে । এবং ক -এরও তা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় বলে মনে হয় না ।

এবার পরিমানের নীতিসূত্র লঙ্ঘনের একটি দৃস্টান্ত বিবেচনা করতে পারি। নীচের দৃষ্টান্তগুলি সংলাপ আকারে উপস্থাপিত নয়, এখানে কেবল সেই বিশেষ উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে যা কোন ইঙ্গিতার্থ প্রকাশ করে ।

খেলা খেলাই ।
হয় সে আসবে, নয়তো না আসবে ।
যদি সে টাকা নিয়ে থাকে তো নিয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

এ উক্তিগুলো স্পষ্টতঃই তথ্যবহুল নয়, অর্থাৎ এগুলো পরিমানের নীতিসূত্র লঙ্ঘন করেছে । কিন্তু এর তাৎপর্য কি ? তাৎপর্য হলো উক্তিগুলো ইঙ্গিতে অনেক তথ্য প্রকাশ করে । যেমন *খেলা খেলাই* এর ইঙ্গিতার্থ হলো খেলা নিয়ে কোন্দল বা তর্কাতর্কির কিছু নেই কিংবা খেলায় হারজিত আছেই তাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া উচিত । *হয় সে আসবে নয়তো না আসবে* এর ইঙ্গিতার্থ হলো সে আসলে ভালো না আসলে আফসোস করার কিছু নেই অথবা সে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয় যে তার আসাটা অতি জরুরি । একইভাবে *যদি সে টাকা নিয়ে থাকে তো নিয়েছে* এর ইঙ্গিতার্থ হলো তার টাকা নেয়াটা বড় কোন অপরাধ হিসাবে গণ্য নয় এবং তা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই । এখানে কিছুটা লাই দেয়ার মনোভাবও মনে হয় ব্যক্ত হয়েছে ।

আমরা দেখেছি যে গ্রাইসের ইঙ্গিতার্থ শব্দগত অর্থ থেকে ভিন্ন । ইঙ্গিতার্থ পাওয়ার জন্য উক্তির শব্দগত অর্থকে পূনর্ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় । সেই পুনর্ব্যাখ্যা গ্রাইসের নীতেসূত্র লঙ্ঘন থেকে হতে পারে । কিন্তু পুনর্ব্যাখ্যার জন্য শ্রোতা কি ধরনের নিয়ম ব্যবহার করেন । হফম্যান (১৯৯৩ ঃ ২৭৭) এ ধরনের কিছু নিয়ম প্রণয়নের চেষ্টা করেন । তিনি এদের নাম দেন **পুনর্ব্যাখ্যা নিয়ম** । নীচে আমরা ব্যাজোক্তি ও অতিশয়োক্তির পুনর্ব্যাখ্যা নিয়ম উল্লেখ করছি ।

ব্যাজোক্তি পুনর্ব্যাখ্যা নিয়ম ঃ যদি কোনকিছু সম্পর্কে প্রীতিকর কিন্তু অবিশ্বাস্য কিছু বলা হয়, তবে তাকে বিপরীত অর্থে অর্থাৎ অপ্রীতিকর অর্থে গ্রহণ করো ।

অতিশয়োক্তি পুনর্ব্যাখ্যা নিয়ম ঃ যদি কোনকিছুতে অসম্ভব পরিমান বা মাত্রা আরোপিত হয় তবে তা কমাতে থাকো যে পর্যন্ত না তা যুক্তিগ্রাহ্য হয় ।

গ্রাইসের ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রায়োগিক তত্ত্ব । কিন্তু এরও রয়েছে অনেক সমস্যা । কুলথার্ড (১৯৮৫ ঃ ৩২) এর দ্বিবিধ সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন । প্রথমত, শ্রোতা কেন বক্তার উক্তি ব্যাখ্যায় বিশেষ ধরনের লঙ্ঘনের দিকে মনোযোগী হবে গ্রাইসের তত্ত্বে তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই । দ্বিতীয়ত, একটি উক্তির নানারকম ইঙ্গিতার্থ থাকতে পারে, গ্রাইসের তত্ত্ব তাদের সুনির্দিষ্টতা সম্পর্কে কিছু বলে না।

পূর্বধারণা ও প্রজ্ঞাপন

প্রতিটি উক্তিই কোন না কোন কিছুকে সত্য বলে ধরে নেয় অথবা বক্তাশ্রোতার সাধারণ জ্ঞানের বিষয় বলে গণ্য করে । যেমন *তার ভাই বাইরে অপেক্ষা করছে* এই উক্তিতে এটি সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে যে তার একটি ভাই আছে । আবার ঃ

ক ঃ সে কাজটা ঠিক করেনি ।
খ ঃ তার শাস্তি হওয়া উচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

এই কথোপকথনে যার সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে সে বক্তা শ্রোতা উভয়ের নিকট পরিচিত । *সে, তার* এখানে বিশেষ একজন লোকের অস্তিত্বের ধারণা প্রকাশ করে । এই ধরনের ধারণা বা বিষয় যা কোন উক্তি থেকে অনুমানমূলকভাবে পাওয়া যায় তাকে বলে **পূর্বধারণা** । আমরা পূর্বধারণার আরো কিছু উদাহরণ দিতে পারি ঃ

১. তুমি সিগারেট খাওয়া কবে ছাড়লে ? (পূর্বধারণা ঃ তুমি সিগারেট খেতে এবং এখন খাও না)

২. যখন তাকে আক্রমন করলেন তখন আপনার সাথে কে কে ছিল ? (পূর্বধারণা ঃ আপনি তাকে আক্রমন করেছেন)

৩. বিপ্লব তাকে মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত করেছিল । (পূর্বধারণা ঃ বিপ্লব মনে করে মিথ্যা বলা অন্যায়)

৪. আজাদ শহীদের চেয়ে ভালো ভাষাতাত্ত্বিক নয় । (পূর্বধারণা ঃ আজাদ এবং শহীদ ভাষাতাত্ত্বিক)

৫. যদি আমি পাখি হতাম তবে আকাশে উড়ে বেড়াতাম । (পূর্বধারণা ঃ আমি পাখি নই)

পূর্বধারণার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে যে হাঁবোধক উক্তি বা বাক্য থেকে পূর্বধারণা আহরিত হয় তাকে যদি নাবোধক বাক্যে পরিণত করা হয় তবে পূর্বধারণাটি অক্ষুন্ন থাকে । পূর্বধারণার এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় **নেতিবাচকতায় স্থিরতা** (Levinson 1983: 168; George Yule 1996: 132) । বার্টশ (১৯৭৬ ঃ ৬৭) নেতিবাচকতায় স্থিরতাকে পূর্বধারণার সংজ্ঞায় এভাবে প্রকাশ করেন ঃ

$$\text{A presupposes B} = Df \begin{array}{l} \text{A necessitates B} \\ \text{and} \\ \text{–A necessitates B} \end{array}$$

হাঁবোধক উক্তি থেকে যে পূর্বধারণা পাওয়া যায় তা তার প্রতিপক্ষ নাবোধক বাক্য থেকে পওয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আমরা নীচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করতে পারি ঃ

১. তার মামা লন্ডন থেকে আসছে ।
তার মামা লন্ডন থেকে আসছে না ।
পূর্বধারণা ঃ তার একজন মামা আছে ।

২. আমার গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে ।
আমার গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েনি ।
পূর্বধারণা ঃ আমার একটি গাড়ি আছে ।

৩. দরজা বন্ধ করো ।
দরজা বন্ধ করো না ।
পূর্বধারণা ঃ এখন দরজা খোলা ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সে পুনরায় এখানে এসেছে ।
সে পুনরায় এখানে আসেনি ।
পূর্বধারণা ঃ সে আগেও এখানে এসেছিল ।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যায় পূর্বধারণা বাক্যনিহিত বচনের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় । অর্থাৎ একটি বচন সত্য হলে পূর্বধারণাটি বজায় থাকে বা সত্য হয় । এদিক থেকে পূর্বধারণা প্রজ্ঞাপন থেকে পৃথক । প্রজ্ঞাপনের ফলে যে অনুমিত ধারণাটি পাওয়া যায় তা কেবল বচনের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । অর্থাৎ যদি কোন বচন সত্য হয় তবে প্রজ্ঞাপিত ধারণা সত্য হবে আর যদি বচনটি মিথ্যা হয় তবে প্রজ্ঞাপিত ধারণাটি সত্য না মিথ্যা হবে তা নিশ্চিত নয় । আমরা প্রজ্ঞাপনের কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি ঃ

১. পিনু অন্তসত্ত্বা । (প্রজ্ঞাপন ঃ পিনু একজন নারী)
২. সে একটি কমলা খেয়েছে । (প্রজ্ঞাপন ঃ সে একটি ফল খেয়েছে)
৩. একটি বিড়াল খাটের উপর বসে আছে । (প্রজ্ঞাপন ঃ একটি প্রাণী খাটের উপর বসে আছে)
৪. সে পত্রিকা পড়ছে । (প্রজ্ঞাপন ঃ সে পড়ছে)
৫. বাদল গান গেয়েছে । (প্রজ্ঞাপন ঃ বাদল শব্দোচ্চারণ করেছে)

এখন আমরা নেতিবাচকতা পরীক্ষা করে দেখতে পারি এই প্রজ্ঞাপনগুলি টিকে কিনা ।

১. পিনু অন্তসত্ত্বা নয় ।
∴ পিনু একজন নারী ।

২. সে কোন কমলা খায়নি ।
∴ সে একটি ফল খেয়েছে ।

৩. কোন বিড়াল খাটের উপর বসে নেই ।
∴ একটি প্রাণী খাটের উপর বসে আছে ।

৪. সে পত্রিকা পড়ছে না ।
∴ সে পড়ছে ।

৫. বাদল গান গায়নি ।
∴ বাদল শব্দোচ্চারণ করেছে ।

স্পষ্টতঃই উপরের উদহরণগুলিতে সিদ্ধান্ত বৈধভাবে অনুমিত হয়নি । এখানে যৌক্তিক ত্রুটি হলো সিদ্ধান্তের বচন আশ্রয় বাক্যের বচনের চেয়ে অধিক ব্যাপক । অর্থাৎ ঃ

নারী > অন্তসত্ত্বা
ফল > কমলা
প্রাণী > বিড়াল

Dhaka University Institutional Repository

পড়া > পত্রিকা পড়া
শব্দোচ্চারণ করা > গান গাওয়া

যে অন্তসত্তা সে অবশ্যই একজন নারী, কিন্তু যে অন্তসত্তা নয় সে নারী না হয়ে পুরুষও হতে পারে । যে কমলা খেয়েছে সে অবশ্যই ফল খেয়েছে, কিন্তু যে কমলা খায়নি সে কমলা ছাড়া অন্য যে কোন কিছু খেতে পারে । কোন কিছু বিড়াল হলে অবশ্যই তা প্রাণী হবে, কিন্তু কোনকিছু বিড়াল না হলে তা যে প্রাণী হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । একইভাবে কেউ পত্রিকা না পড়লে বা গান না গাইলে অন্য যে কোন কিছু করতে পারে । কাজেই প্রজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু গ্যারান্টি পাওয়া যায় যে কোন বাক্য সত্য হলে তার প্রজ্ঞাপিত বচনটিও সত্য হবে । কেম্পসন (১৯৭৭ ঃ ১৪৩) প্রজ্ঞাপন ও পূর্বধারণার পার্থক্যটি একটি সারণীর মাধ্যমে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন ঃ

প্রজ্ঞাপন		পূর্বধারণা	
S_1	S_2	S_1	S_2
$T \rightarrow T$		$T \rightarrow T$	
$F \leftarrow F$		$-(T \vee F) \leftarrow F$	
$F \rightarrow T \vee F$		$F \rightarrow T$	

প্রজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে S_1 সত্য হলে S_2 সত্য হবে, S_2 মিথ্যা হলে S_1 মিথ্যা হবে এবং S_1 মিথ্যা হলে S_2 সত্য অথবা মিথ্যা হবে । অন্যদিকে পূর্বধারণার ক্ষেত্রে S_1 সত্য হলে S_2 সত্য হবে, S_2 মিথ্যা হলে S_1 সত্য বা মিথ্যা কিছুই হবে না এবং S_1 মিথ্যা হলে S_2 সত্য হবে । এখানে পূর্বধারণার ক্ষেত্রে S_2 মিথ্যা হলে S_1 সত্য বা মিথ্যা কিছুই হবে না (দ্বিতীয় সূত্র) এটি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন । বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন যে *ফ্রান্সের রাজা টেকো* (The king of France is bald) এই বাক্য এই পূর্বধারণা প্রকাশ করে যে ফ্রান্সের একজন রাজা আছেন । রাসেল দাবি করেন বাস্তবে ফ্রান্সের যদি কোন রাজা থেকে না থাকে তাহলে *ফ্রান্সের রাজা টেকো* এই বাক্যটি মিথ্যা হবে । কিন্তু যুক্তিবিদ স্ট্রসন এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন । তিনি বলেন *ফ্রান্সের রাজা টেকো* এই উক্তিতে বক্তা এটা বলে না যে কোন ব্যক্তি অস্তিত্বশীল, এতে সে শুধু তার অস্তিত্বের পূর্বধারণা করে । যদি উক্ত ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকে তবে **পূর্বধারণা ব্যর্থতা** ঘটে । এক্ষেত্রে উক্তিটি মিথ্যা হয়ে যায় না বরং একটি *না সত্য না মিথ্যা* অবস্থার সৃষ্টি হয় যাকে বলা যেতে পারে **সত্যমূল্য ব্যবধান** । *ফ্রান্সের রাজা টেকো নয়* এই নেতিবাচক বাক্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য (Palmer 1981: 167) ।

পূর্বধারণাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয় **বাগর্থিক পূর্বধারণা** ও **প্রায়োগিক পূর্বধারণা** । প্রায়োগিক পূর্বধারণার ক্ষেত্রে পূর্বধারণাটি ভাষার বাস্তব প্রয়োগ থেকে দ্যোতনা মূল্যের মাধ্যমে অনুমিত হয় । যেমন ঃ

ক ঃ তুমি আমার লাইলী ।
খ ঃ তুমি আমার মজনূ ।

এখানে *লাইলী* ও *মজনুর* বিশেষ প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় বক্তা শ্রোতা উভয়ে উভয়কে ভালবাসে । বাগর্থিক পূর্বধারণার ক্ষেত্রে পূর্বধারণাটি প্রথাগত অর্থ থেকে যোগাযোগের সাধারণ নিয়মে নিঃসৃত হয় । বাগর্থিক পূর্বধারণা দু'ধরনের হতে পারে । **অস্তিত্বাচক পূর্বধারণা** এবং **যৌক্তিক পূর্বধারণা** । অস্তিত্বাচক পূর্বধারণা প্রকাশিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যে বা উক্তিতে বিশেষ শব্দের প্রয়োগে । যেমন *বালকটি* বললে আমরা বুঝবো এখানে কোন নির্দিষ্ট বালকের অস্তিত্ব নির্দেশ করা হয়েছে । অন্যদিকে যৌক্তিক পূর্বধারণা প্রকাশিত হয় কোন বাক্য ও উক্তির যৌক্তিক গঠনে, *যেমন আমি তাকে বিয়ে করে এখন আফসোস করছি* এটিতে এই পূর্বধারণা প্রকাশিত হয় যে আমি বিবাহিত । প্রজ্ঞাপন, বাগর্থিক পূর্বধারণা, প্রয়োগিক পূর্বধারণা এগুলো বিভিন্ন অনুমান প্রক্রিয়ার ফসল, যেমনভাবে আমরা দেখেছি ইঙ্গিতার্থও কথোপকথনে অংশগ্রহণকারীর অনুমান থেকে প্রাপ্ত । কাজেই এই ধারণাগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত । বলা যায় প্রজ্ঞাপন, বাগর্থিক পূর্বধারণা, প্রায়োগিক পূর্বধারণা এবং ইঙ্গিতার্থ বাক্যের বা উক্তির অর্থের বিভিন্ন স্তর যেখানে প্রজ্ঞাপনের অবস্থান সবার কেন্দ্রে এবং ইঙ্গিতার্থের অবস্থান সবার বাইরে । পল সিম্পসন (১৯৯৩ ঃ ১৩৩) একটি চিত্রের মাধ্যমে এদের স্তরিক সম্পর্ক প্রদর্শন করেন ঃ

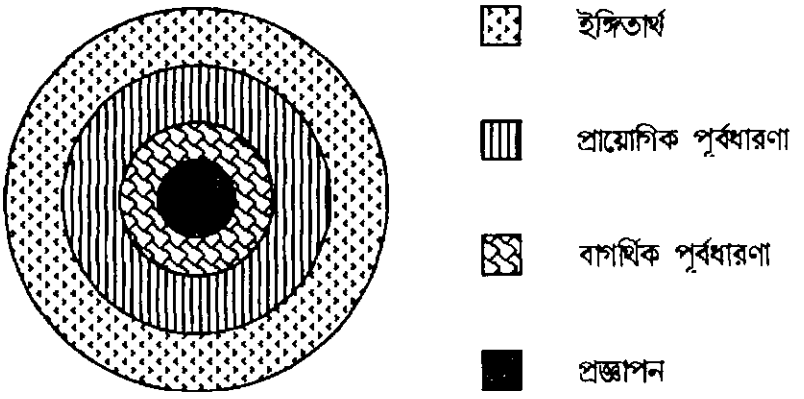

উক্তি অর্থের স্তরসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কাজেই আমরা দেখলাম বাগর্থবিদ্যার গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত বিচিত্র । বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার অর্থকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে যারফলে জন্মলাভ করেছে বিভিন্ন অভিক্রম ও তত্ত্ব । আমরা কাগর্থিক তত্ত্বায়নের প্রবনতাকে ছয়টি অভিক্রমে বিভক্ত করে ছয়টি পৃথক অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি । উপসংহারে তাদের সার্বিক মূল্যায়নের পালা । আমরা এখানে তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি প্রসঙ্গটির পুনরালোচনায় ব্যাপৃত হবো । এখানে আরো বিবেচনা করবো বাগর্থবিদ্যার অতিসাম্প্রতিক হালচাল । তারপর শেষকথায় আমরা বর্তমান অভিসন্দর্ভের যবনিকাপাত করবো ।

তত্ত্বায়নের সমস্যা ও মূলনীতি প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন

আমরা ভূমিকা পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক সমস্যা আলোচনা করেছি । আমরা লক্ষ্য করেছি প্রতিটি তত্ত্বেরই কোন না কোন সীমাবদ্ধতা রয়েছে । তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা এর আভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গিক সংগঠনে প্রতিফলিত । তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার বীজ নিহিত থাকে তার পরিপোষিত অভিক্রমে । অভিক্রমের সীমাবদ্ধতা থেকে তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উৎসারিত হয় । আমরা বর্তমান গবেষনাপত্রে ছয়টি বৃহৎ অভিক্রমের কথা উল্লেখ করেছি এবং ছয়টি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যথা ঃ (ক) ঐতিহাসিক বাগর্থবিদ্যা, (খ) সাংগঠনিক বাগর্থবিদ্যা, (গ) যৌক্তিক বাগর্থবিদ্যা, (ঘ) জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যা, (ঙ) রূপান্তরমূলক বাগর্থবিদ্যা, এবং (চ) প্রয়োগাত্মক বাগর্থবিদ্যা । এই বিভাজনকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে নীচের চিত্রে প্রকাশ করতে পারি ঃ

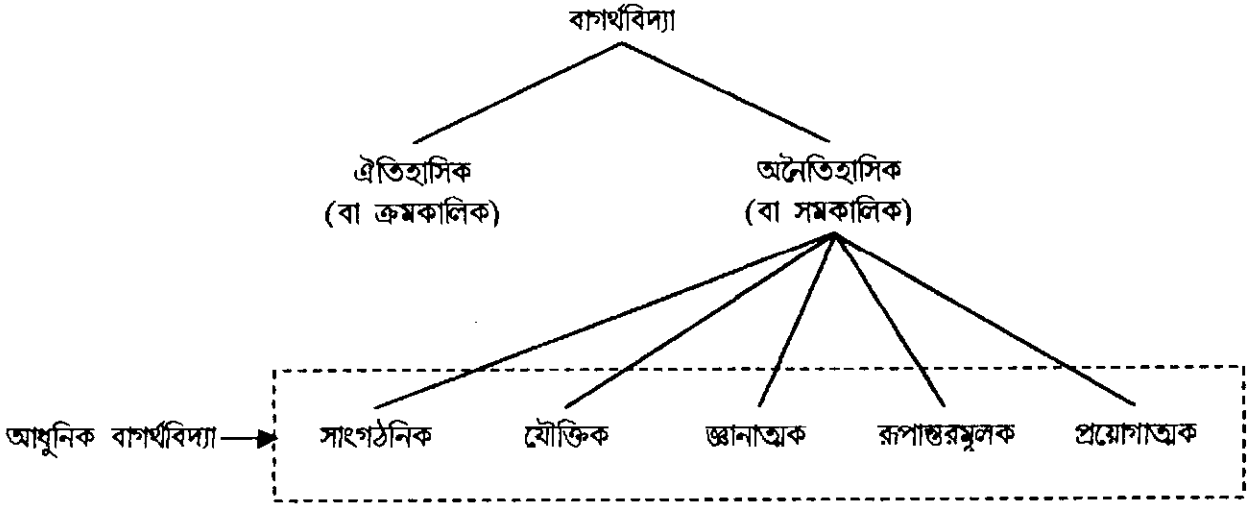

বাগর্থবিদ্যার আভিক্রমিক শ্রেণীবিভাগ

প্রতিটি অভিক্রমের রয়েছে এর নিজস্ব সীমাবদ্ধতা । বিভিন্ন অভিক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক সীমাবদ্ধতার সারসংক্ষেপ আমরা নীচের সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরতে পারি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

অভিক্রম	সীমাবদ্ধতা
ঐতিহাসিক	অর্থের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু অর্থের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারে না ।
সাংগঠনিক	অর্থের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু অর্থের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারে না ।
যৌক্তিক	আদর্শায়িত ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় উপযোগী, কিন্তু প্রাকৃতিক ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় বিশেষ উপযোগী নয় ।
জ্ঞানাত্মক	অর্থের মানসিক উপস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু অর্থ সম্পর্কসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারে না।
রূপান্তরমূলক	ভাষিক তত্ত্বে অর্থের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে, কিন্তু অর্থের প্রয়োগ উপেক্ষা করে ।
প্রয়োগাত্মক	অর্থের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু অর্থের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারে না ।

সামগ্রিকভাবে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে সক্ষম একটি পূর্ণাঙ্গ বাগর্থিক তত্ত্ব এখানো রচিত হয়নি । তা হওয়া সুদূরপরাহত । তবে আমরা নৈরাশ্যবাদী নই । বাগর্থবিদদের অবিরাম প্রচেষ্টা একদিন কাঙ্খিত ফলাফলে রূপ নিবেই । আজ তত্ত্বায়নের যে সমস্যাবলী বাগর্থবিদ্যা মোকাবিলা করছে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে একদিন সেসব দূরীভূত হবে । কিন্তু কে জানে হয়তো সেদিন দেখা দিবে তত্ত্বায়নের নতুনতর সমস্যা যার মোকাবিলায় বাগর্থবিদ্যা আরো সম্মুখপানে চালিত হবে । পূর্ণতার পথে এই অভিযাত্রা হয়তো অসীম । তাত্ত্বিক পূর্ণতার কোন শেষ আছে কিনা তা বোঝা যায় না । যতোই সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় ততোই ভেসে উঠে নতুন দৃশ্যপট – ততোই যেন প্রসারিত হয় দিগন্ত । এ যেন সতত প্রসারমান মহাবিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখেই ঘটে । প্রসারমানতার মাঝে যে প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করা যায় তা হলো পুরনো অতীত হয় নতুনকে স্বাগত জানিয়ে । বাগর্থবিদ্যায় পুরনো তত্ত্ব বাতিল হবে, সংশোধিত হবে, পরিমার্জিত হবে এবং জন্ম নিবে নতুন তত্ত্ব । দুর্বল তত্ত্বকে অপসারিত করবে সবল তত্ত্ব, যা আবার অপসারিত হবে আরো সবল তত্ত্ব দ্বারা এবং এভাবেই চলতে থাকবে ।

প্রতিটি তত্ত্বেরই নির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে । মূলনীতি হলো সেই মৌলিক ধারণা যার উপর ভিত্তি করে একটি তত্ত্ব প্রগঠিত হয় এবং যা সেই তত্ত্বকে বিশেষ আকার ও গঠনে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে । আমরা ছয়টি অভিক্রমের সাথে যুক্ত যেসব তত্ত্বের সাক্ষাত পেয়েছি তাদের মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে তালিকাবদ্ধ করতে পারি । নীচের সারণীটি সেই চেষ্টায় নিবেদিত ঃ

তত্ত্ব	মূলনীতি
উলম্যানের অর্থ পরিবর্তনের তত্ত্ব	কালিক সংস্থাপনে নাম ও অর্থের স্থানান্তর ঘটে
ঔপাদানিক/বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ	শব্দার্থ ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে বিভাজ্য
বিয়ারউিশের তত্ত্ব	বাগর্থিক বৈশিষ্ট্যে স্তরক্রম বিদ্যমান
বাগর্থিক ক্ষেত্র	ভাষার শব্দসমূহ বাগর্থিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ
ট্রিয়ারের তত্ত্ব	কালিক সংস্থাপনে বাগর্থিক ক্ষেত্রের কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়
মাতোরের তত্ত্ব	বাগর্থিক ক্ষেত্র সমাজ সংগঠনের সাথে যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আচরণবাদী তত্ত্ব	অর্থ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংগঠিত
বাগর্থিক ভূমিকা	বাক্যের অর্থ কারক সম্পর্কে সংগঠিত
স্থানিকতাবাদ	শব্দের স্থানিক অর্থ অন্যান্য অর্থ অপেক্ষা মৌলিক
নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব	শব্দ ও বস্তু সরাসরি সম্পর্কে আবদ্ধ
বিধেয় কলন	বচন বিধেয়ক-যুক্তি সম্পর্কে সংগঠিত
বাচনিক যুক্তিবিদ্যা	মহাবচনের সত্যাসত্য অনুবচনের উপর নির্ভরশীল
অর্থ স্বীকার্য	শব্দের উপনামীয় সম্পর্ক ইঙ্গিত নিয়মে আবদ্ধ
সত্যশর্ত	একটি বচনের অর্থ তার সত্য হওয়ার শর্তের সমষ্টি
বাগর্থিক পরিবহন তত্ত্ব	একটি বচনের সত্যতা তার ধনাত্মক বাগর্থিক মূল্যের সমতুল্য
বাগর্থিক জ্ঞান তত্ত্ব	ভাষার অর্থ মানুষের জ্ঞানের অংশবিশেষ
মানসচিত্র তত্ত্ব	শব্দের অর্থ মানসচিত্রে উপলব্ধ
আদর্শরূপ তত্ত্ব	মানুষের মনে প্রতিটি শ্রেণীর একটি দৃষ্টান্তস্থানীয় নমুনা থাকে
বাগর্থিক অন্তরক	শব্দের আবেগিক অর্থ পরিমাপযোগ্য
বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া	শব্দ ও শব্দনির্দেশিত বস্তুর সম্পর্ক একাধিক ধাপে মানসিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়
পান্ডুলিপি তত্ত্ব	ধারণা বা অর্থ পান্ডুলিপি বা ঘটনার টেমপ্লেটে সমাসীন থাকে
ধারণাগত সংগঠন প্রকল্প	ধারণাগত সংগঠনে থাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অবধারণমূলক তথ্য
বাগর্থিক আপেক্ষিকতা	প্রতিটি ভাষা সম্প্রদায়ের ধারণাগত সংগঠন স্বতন্ত্র
বাগর্থিক সার্বজনীনতা	সকল ভাষা সম্প্রদায়ের ধারণাগত সংগঠন অভিন্ন
সংকেত সংগঠন তত্ত্ব	অর্থের অনুধাবন ও উৎপাদন সংকেতের সংগঠনের সাথে যুক্ত
ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব	বাক্যের অর্থ গভীর সংগঠন থেকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাওয়া যায়
সঞ্জননী তত্ত্ব	গভীর সংগঠন ও বাগর্থিক সংগঠন অভিন্ন
প্রয়োগ তত্ত্ব	প্রয়োগই শব্দের অর্থ
প্রসঙ্গ তত্ত্ব	শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয় প্রসঙ্গে
কৃতিসাধক তত্ত্ব	ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্য সম্পাদিত হতে পারে
বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব	অবাঙমূলক কর্ম উক্তির অর্থের আবশ্যক উপাদান
ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব	মানুষ এক কথা দিয়ে অন্য কথা বোঝাতে পারে

আমরা ভূমিকায় আটটি দফা বা শর্ত সমন্বয়ে একটি নীতিমালা তৈরী করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এই নীতিমালার আলোকে যে কোন বাগর্থিক তত্ত্বের সফলতা ব্যর্থতার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব। আমরা এখানে এই সম্ভাব্যতা যাচাই করবো। আমরা শর্ত প্রতিপালনের উপর ০, ১, ২, ৩ এই চারটি মূল্য আরোপ করবো। কোন তত্ত্ব একটি শর্ত সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করলে মূল্য ৩, মাঝামাঝি রকমে প্রতিপালন করলে মূল্য ২, যৎসামান্য প্রতিপালন করলে মূল্য ১ এবং আদৌ প্রতিপালন না করলে মূল্য ০ অর্জন করবে। কোন তত্ত্বের প্রাপ্ত মূল্যের যোগফল থেকে আমরা তার সাফল্যের শতকরা হিসাব বের করবো। নীচের সারণীর দিকে তাকানো যাক ঃ

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্ব	শর্ত ১	শর্ত ২	শর্ত ৩	শর্ত ৪	শর্ত ৫	শর্ত ৬	শর্ত ৭	শর্ত ৮	সাফল্য
উলম্যানের অর্থ পরিবর্তনের তত্ত্ব	২	১	২	২	১	০	১	১	৪১.৬৬%
ঔপাদানিক/বাগর্থিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ	২	১	২	২	২	০	১	২	৫০.০০%
বিয়ারডিশের তত্ত্ব	২	২	২	২	২	০	২	২	৫৮.৩৩%
বাগর্থিক ক্ষেত্র	১	১	২	২	২	১	২	২	৫৪.১৬%
ট্রিয়ারের তত্ত্ব	১	১	২	২	২	১	২	২	৫৪.১৬%
মাতোরের তত্ত্ব	১	১	২	২	২	২	২	২	৫৮.৩৩%
আচরণবাদী তত্ত্ব	২	২	৩	১	১	৩	১	১	৫৮.৩৩%
বাগর্থিক ভূমিকা	১	২	২	২	২	১	২	২	৫৮.৩৩%
স্থানিকতাবাদ	২	২	২	১	১	২	১	১	৫০.০০%
নির্দেশনাত্মক তত্ত্ব	১	১	২	১	১	৩	২	১	৫০.০০%
বিধেয় কলন	১	২	১	২	২	১	১	২	৫০.০০%
বাচনিক যুক্তিবিদ্যা	১	৩	১	২	২	১	১	২	৫৪.১৬%
অর্থ স্বীকার্য	১	২	১	২	২	১	১	২	৫০.০০%
সত্যশর্ত	১	২	১	২	২	৩	২	৩	৬৬.৬৬%
বাগর্থিক পরিবহন তত্ত্ব	১	২	১	২	২	৩	২	১	৫৮.৩৩%
বাগর্থিক জ্ঞান তত্ত্ব	১	২	২	৩	২	২	২	৩	৭০.৮৩%
মানসচিত্র তত্ত্ব	২	২	১	১	১	২	২	২	৫৪.১৬%
আদর্শরূপ তত্ত্ব	১	১	১	২	১	৩	২	২	৫৪.১৬%
বাগর্থিক অন্তরক	২	১	২	২	২	২	১	১	৫৪.১৬%
বাগর্থিক কর্মপ্রক্রিয়া	১	২	২	২	২	২	১	১	৫৪.১৬%
পাণ্ডুলিপি তত্ত্ব	১	২	১	২	১	৩	১	১	৫০.০০%
ধারণাগত সংগঠন প্রকল্প	২	২	২	৩	৩	৩	৩	৩	৮৭.৫০%
বাগর্থিক আপেক্ষিকতা	২	২	২	২	১	৩	২	১	৬২.৫০%
বাগর্থিক সার্বজনীনতা	২	২	২	২	১	২	২	২	৬২.৫০%
সংকেত সংগঠন তত্ত্ব	১	২	২	৩	২	৩	১	২	৬৬.৬৬%
ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব	১	২	১	২	২	১	২	৩	৫৮.৩৩%
সঞ্জননী তত্ত্ব	১	২	১	২	২	১	২	৩	৫৮.৩৩%
প্রয়োগ তত্ত্ব	২	২	১	২	২	৩	৩	৩	৭৫.০০%
প্রসঙ্গ তত্ত্ব	৩	৩	২	২	২	৩	৩	৩	৯১.৬৬%
কৃতিসাধক তত্ত্ব	৩	৩	৩	২	২	৩	৩	৩	৯১.৬৬%
বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব	৩	৩	৩	২	২	৩	৩	৩	৯১.৬৬%
ইঙ্গিতার্থ তত্ত্ব	৩	৩	৩	২	২	৩	৩	৩	৯১.৬৬%

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বিভিন্ন তত্ত্বের সাফল্যের মাত্রা নির্ণীত হয়েছে (প্রতিটি তত্ত্বের মোট প্রাপ্ত মূল্যকে সর্বোচ্চ প্রাপ্য মূল্য ২৪ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করে) । এ ধরনের গাণিতিক পরিমাপের একটি অসুবিধা হলো কোন তত্ত্বের বিশেষ শর্ত প্রতিপালনের মাত্রাস্বরূপ যে মূল্য প্রদত্ত হয় তা অধিকাংশই ব্যক্তিনিষ্ঠ । বস্তুনিষ্ঠ মূল্য আরোপন পদ্ধতি এখনো উদ্ভাবিত হয়নি । এর উদ্ভাবনের ভার ভবিষ্যৎ গবেষকদের উপর । এরকম পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলে সঠিকভাবে বলা সম্ভব হবে কোন্ তত্ত্বের অবস্থান কোথায় । এতে তত্ত্বের সমালোচনা আরো গতিশীল ও বাস্তবভিত্তিক হবে । তবে আমাদের বিবেচনায় এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ হতে পারে । কিন্তু কিভাবে হবে তা নির্ধারণের জন্য দ্বিশৃঙ্খলাগত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে ।

বাগর্থবিদ্যার অতিসাম্প্রতিক অবস্থা

বর্তমান শতাব্দীর সত্তর, আশি ও নব্বই দশক তিনটি আধুনিক বাগর্থবিদ্যার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রূপান্তরবাদী বাগর্থবিদ্যার সীমাবদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত করে জ্যাকেনডফ (১৯৭২, ৮৩), ক্রিপকে (১৯৭২), পুটন্যাম (১৯৭৫), লুইস (১৯৭২), পার্টী (১৯৭৩, ১৯৮২, ১৯৮৪), কীন্যান ও ফ্যাল্টজ (১৯৮৫)) **বাগর্থিক বাস্তববাদ** প্রতিষ্ঠিত করেন । বাগর্থিক বাস্তববাদ মডেল থিয়োরি, সেট থিয়োরি বা টাইপ থিয়োরির মাধ্যমে জাগতিক সত্তার সাথে ভাষিক সত্তার সম্পর্ক ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয় । এই রূপায়ন অনুমান, প্রজ্ঞাপন ও সমতুল্যতার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে অস্বচ্ছ প্রসঙ্গ, দৃষ্টিভঙ্গিমূলক ক্রিয়া ও মানসিক প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা প্রদান করে । বাস্তববাদী বাগর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়ে উঠেছিল রৌপিক ভাষাকে আশ্রয় করে এবং তারা প্রাকৃতিক ভাষার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেছিল । ফলে অনেকেই প্রাকৃতিক ভাষাকে তত্ত্বায়নের কাজে লাগাতে চাইলেন এবং নানারকম প্রস্তাবনা নিয়ে হাজির হলেন (দ্রষ্টব্য ঃ William A. Ladusaw 1988: 89-112; Murvet Enc 1988: 239-254)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(১) মনটেগ তত্ত্ব (Montague 1974; Partee 1976; Dowty, Wall & Peters 1981)

(২) ক্রীড়া তত্ত্ব (Hintikka 1973; Saarinen 1978)

(৩) সন্দর্ভ উপস্থাপনা তত্ত্ব (Kamp 1981)

(৪) পরিস্থিতি তত্ত্ব (Barwise and Perry 1983)

(৫) বাচনিক তত্ত্ব (Stalnaker 1984)

(৬) সংগঠিত অর্থ তত্ত্ব (Cresswell 1985)

এসমস্ত তত্ত্ব ফ্রেঞ্জীয় বিরচনামূলক নীতিকে তাদের তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে যা একটি নতুন অভিক্রমে পরিণতি লাভ করে । এর নাম দেয়া হয় **বিরচনামূলক বাগর্থবিদ্যা** । বিরচনামূলক বাগর্থবিদ্যার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি চরিত্রগতভাবে গতিশীল যার মাধ্যমে ভাষা প্রয়োগের সূত্রাবলীও ব্যাখ্যা করা যায় । এজন্য

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত অভিক্রমটিকে **গতিশীল বাগর্থবিদ্যা**ও বলা হয় । গতিশীল বাগর্থবিদ্যার উপর সাম্প্রতিক যে কাজ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গেনারো চিয়ের্চিয়ার Dynamics of Meaning (1995) মাকেতো কানাজাওয়ার Dynamics, Polarity and Quantification (1995) এবং ক্রিস্টোফার লিয়ন্সের Definiteness (1999)। তবে অতিসাম্প্রতিক তত্ত্বসমূহ ভবিষ্যতে কিভাবে মূল্যায়িত হবে এবং তারা বাগর্থবিদ্যার ভবিষ্যৎ গবেষণাকে কিভাবে প্রভাবিত করবে তা বলা মুশকিল । এ প্রসঙ্গে অ্যালিস মিউলেন (১৯৮৮ ঃ ৪৪৪) -এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

> "এসমস্ত নতুন তত্ত্বের লাভালাভ ভবিষ্যৎ গবেষণায় পরীক্ষিত হবে, কিন্তু অর্থ উপস্থপনার সংগঠনের পরিমার্জনে এই চলতি পদ্ধতিগত প্রবনতা বৈশিষ্ট্যমূলকভাবে বাক্যতত্ত্ব, বাগর্থবিদ্যা, প্রয়োগবিদ্যা, এবং দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার জন্য যৌথ কার্যক্রম সূচিত করে ।"●

নব্বইয়ের দশকে জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় । ল্যাঙ্গাকারের Foundations of Cognitive Grammar (1986)-এর পর থেকে অনেক মনোবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানী অর্থের মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন বিভিন্ন প্রকাশনায় । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রে জ্যাকেনডফের Language of Mind (1997), গিলেস ফুকোনিয়ারের Mappings in Thought and Language (1997), এ্যান্ডি ক্লার্ক ও যোসেফা টরিবিও সম্পাদিত Language and Meaning in Cognitive Science (1998), জেন্স এস. অলউড সম্পাদিত Cognitive Semantics (1999) এবং সবশেষে লিওনার্ড ট্যালমির Toward a Cognitive Semantics (2000)● ।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাগর্থবিদ্যার আরেকটি শাখা খুব দাপটের সাথে বিকাশ লাভ করেছে যা আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভে আলোচনা করিনি । এটি হলো **প্রগণনমূলক বাগর্থবিদ্যা** । এটি কম্পিউটার ভাষার সাথে সম্পৃক্ত । বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে তথ্য মহাসরণীতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় প্রগণনমূলক বাগর্থবিদ্যা তাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে । প্রগণনমূলক বাগর্থবিদ্যার কিছু সাম্প্রতিক প্রকাশনা হলো মাইকেল রজনার ও রোডেরিক জনসন সম্পাদিত Computational Linguistics and Formal Semantics (1992), গ্লিন উইন্সকেলের The Formal Semantics of Programming Languages (1993) এবং জে. ডব্লিউ ডি বেকার ও অন্যান্যের Control Flow Semantics (1996) । প্রগণনমূলক বাগর্থবিদ্যা এমন একটি অভিক্রম যা কম্পিউটার প্রযুক্তির বা তথ্য প্রযুক্তির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত । কৃত্রিম সাংকেতিক ভাষায় গঠিত এর অবয়ব । তাই পর্যাপ্ত কৌশলগত জ্ঞান ছাড়া এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না । তবে এর যেহেতু একটি কল্যানকর প্রায়োগিক দিক রয়েছে তাই আশা করা যায় আগামী শতাব্দীতে বাগর্থবিদ্যার এই শাখাটিই হয়ে উঠবে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং নির্মান করবে অর্থের নতুন সংজ্ঞা ।

● "The viability of these new theories will have to be tested in future research but the current methodologicaltrend towards refinement in structuring the representation of meaning distinctively sets out the cooperative programme for syntax, semantics, pragmatics. and philosophy and logic." Alice ter Meulen (1988), *Linguistics and the Philosophy of Language*,p. 444

● ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় Toward a Cognitive Semantics হবে জ্ঞানাত্মক বাগর্থবিদ্যার জন্য এক জরুরী সংযোজন । বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভাষা, বক্তব্য ও যোগাযোগের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক তত্ত্বসমূহ । ২০০০ সালে বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের Massachusets Institute of Technology.

Dhaka University Institutional Repository

শেষকথা

ওগো ও চক্রবাকী
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হলো যে চক্রবাকের আঁখি । (নজরুল)

চক্রবাকীকে খুঁজে চক্রবাক যেমন হয়রান, আমাদের অবস্থাও হয়েছে তদ্রূপ । ভাষার অর্থ সম্পর্কে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার তত্ত্বালোচনার পরও কি আমাদের মনে হচ্ছে না যে আমরা এখনো অর্থের স্বরূপের সন্ধান পাইনি ? এরকম অতৃপ্তিই মনে হয় যে কোন তত্ত্বালোচনার শেষ পরিণতি এবং তা-ই হওয়া উচিত আমাদের শেষ কথা । ভাষার অর্থ ভেদ করার জন্য রচিত হয়েছে অসংখ্য তত্ত্ব এবং সাফল্যও এসেছেও সুপ্রচুর । কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাফল্যের সাথে আমাদের ব্যর্থতাও পর্বতপ্রমাণ । সহজে অর্থের নাগাল পাওয়া যায় না । হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৯)-এর ভাষায়, অর্থ সবচেয়ে অধরা, সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে বিমূর্ত । এ যেন মরমি কবির সেই পরমার্থ (যা দিয়ে আমরা ভূমিকায় *অর্থের অর্থ* -এর আলোচনা শুরু করেছিলাম) । বলিঙ্গার (১৯৭৫ ঃ ২০৫) একটু রস মিশিয়ে বলেন, "অর্থ স্নানঘরের ভেজা সাবানের টুকরোর মতো ফাঁকিবাজ ।" এটি সহজে হাতের মুঠোয় আসতে চায় না । শুধু পালিয়ে বেড়ায় । থাকতে চায় আড়ালে, অন্ধকারে ব্যাখ্যাতীত রহস্য হয়ে । আমরা কালিদাস রচিত কবিতার রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম এবং শেষও করবো কবিগুরুর কবিতা দিয়ে । কবিকে শ্রদ্ধা জানাই তার গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য ঃ

বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়ম ঘেরা মনে,
ভিতরে তা রহস্য কি
কেউ তা নাহি জানে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Abraham, S. and Keifer, F. (1966). *A Theory of Structural Semantics.* The Hague & Paris: Monton & Company.

Aitchinson, J. (1987). *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon.* Oxford: Basil Blackwell.

Akmajian, Demers, Farmer & Harnish. (1995). *Linguistics: An Introduction to Language and Communication.* New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.

Allwood, J. S. (ed). (1999). *Cognitive Semantics: Meaning and Cognition.* John Benjamin Publishing Company.

Alston, P. (1964). *Philosophy of Language.* Eaglewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc.

Anderson, J. (1983). *The Architecture of Cognition.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Austin, J. L. (1961). "Performative Utterances." In J. O. Urmson and G. L. Warnock eds. (1970), *Philosophical Papers* (pp.233-252*)*. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Austin, J. L. (1962). *How To Do Things With Words.* Oxford: Clarendon Press.

Bach, E. (1968). "Nouns and Noun Phrases." In Bach and Harms (eds.) *Universals in Linguistic Theory.* (pp.91-122). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Bar-Hillel, Y. (1964). *Language and Information: Selected Essays on Their Theory and Application.* Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Bartsch, R. (1976). *The Grammar of Adverbials.* Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Barwise, J. and Perry, J. (1983). *Situations and Attitudes.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Bekkar, J.W.D. (1996). *Control Flow Semantics.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Berlin, B. and Kay, P. (1969). *Basic Colour Terms and Their Universality and Evaluation.* Berkeley: University of California Press.

Bierwisch, M. (1970). "Semantics." In John Lyons (ed.), *New Horizons in Linguistics* (pp.166-184). Harmondsworth: Penguin Books.

Billiard, C. & Jenkinson, E.B. (1967). "How Words Change Meaning in Time and Context." In Edward B. Jenkinson (ed.), *What is Language?* Bloomington: Indiana University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Bloomfield, L. (1933/35). *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Bolinger, D. (1975). *Aspects of Language*. New York: Harcourt Brace Jovanovich..

Brainerd, B. (1971). *Introduction to the Mathematics of Language Study*. New York: American Elsevier Publishing Company, Inc.

Brown, G. & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cann, R. (1993). *Formal Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Carnap, R. (1937). *The Logical Syntax of Language*. New York: Harcourt and Brace.

Catford, J.C. (1969). "J.R. Firth and British Linguistics." In Archibald A. Hill (ed.) *Linguistics* (pp. 247-257). Washington D.C.: Voice of America Forum Lectures.

Chafe, W. L. (1970). *Meaning and the Structure of Language*. Chicago and London: The University of Chicago Press

Chierchia, G. (1995). *Dynamics of Meaning*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton

Chomsky, N. (1964). *Current Issues in Linguistic Theory*. The Hague: Mouton.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Chomsky, N. (1972). *Studies on Semantics in Generative Grammar*. The Hague: Mouton.

Chomsky, N. (1981). *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht: Foris.

Chomsky, N. (1986). *Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use*. New York: Praeger.

Clark, A. & Toribio, J. (ed). (1998). *Language and Meaning in Cognitive Science: Cognitive Issues and Semantic Theory*. 4 vols. Stanford: Stanford University Press.

Clark, H. and Clark, E. V. (1977). *Psychology of Language: An Introduction to Psycholinguistics*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Cook, V. J. (1988). *Chomsky's Universal Grammar: An Introduction*. Oxford & Cambridge: Basil Blackwell.

Coulthard, M. (1985). *An Introduction to Discourse Analysis*. London & New York: Longman.

Cresswell, M. J. (1985). *Structured Meanings*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Cruse, D. A. (1986). *Lexical Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Danto, A. (1969). "Semantical Vehicles, Understanding and Innate Ideas." In Sydney Hook (ed), *Language and Philosophy* (pp. 122-137). New York: New York University Press.

Dijk, T. A. (1977). *Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse*. London and New York: Longman.

Dowty, D. Wall, R. E. and Peters, S. (1981). *Introduction to Montague Semantics*. Dordrecht: Reidel.

Enc. M. (1988). "The Syntax-Semantics Interface." In Fredrick J. Newmeyer (ed.) *Linguistics: The Cambridge Survey*. vol 1. (pp.239-254). Cambridge: Cambridge University Press.

Fillmore, C. J. (1968). "The Case for Case." In Bach & Harms (eds.), *Universals in Language*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Firth, J. R. (1957). *Papers in Linguistics 1934-1961*. London: Oxford University Press.

Fouconnier, G. (1997). *Mappings in Thought and Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Frege, G. (1892). "On Sense and Nominatum." In H. Feigl and W. Sellars eds. (1949), *Readings in Philosophical Analysis*. Reprinted in A. P. Martinich ed. (1990), *The Philosophy of Language* (pp.190-202). 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Fries, C.C. (1971). "Meaning and Linguistic Analysis." In Harold Byron Allen (ed.), *Applied English Linguistics* (pp.98-110). Indian Edition. New Delhi: Amerind Publishing Company Private Limited.

Fromm E. (1977). "The Nature of Symbolic Language." In Benson R. Schulman (ed.), *Language and Logic* (pp.18-23). California: Westinghouse Learning Press. (pp.56-63)

Glucksberg, S. and Danks, J. (1975). *Experimantal Psycholinguistics*. Hillsdale, N. J.: Lawlerence Erlbaum Associates.

Green, G. M. (1974). *Semantic and Syntactic Regularity*. Bloomington & London: Indiana University Press.

Greenberg, J. H. (1971). *Language, Culture and Communication*. Stanford: Stanford University Press.

Grice, H. P. (1975). "Logic and Conversation." In P. Cole and J. Morgan eds. (1975), *Syntax and Semantics*, Vol. 3 (pp.41-58). New York: Academic Press. Reprinted in A. P. Martinich ed. (1990), *The Philosophy of Language* (pp.149-160). 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Grice, H.P. (1981). "Presupposition and Conversational Implicature." In Cole (ed.) *Radical Pragmatics*. New York: Academic Press.

Dhaka University Institutional Repository

Halliday, M.A.K. (1961). "Categories of the Theory of Grammar." *Word*, 17/3, pp. 241-292.

Harrison, B. (1979). *An Introduction to the Philosophy of Language.* London: The Macmillan Press Limited.

Hatch, E. & Brown, C. (1995). *Vocabulary, Semantics and Language Education.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hayakawa, S.I. (1949). "Affective Communication." In Harold E. Briggs (ed.) *Language...Man ...Society* (pp.137-151). New York: Rinehart & Company, Inc. Publishers.

Hayes, P. (1976). "Semantic Markers and Selectional Restrictions." In E. Charniak & Y. Wilks (eds), *Computational Semantics.* Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Hintikka, J. (1973). *Logic, Language Games and Information.* Oxford: Clarendon Press.

Hoey, M. (1991). *Patterns of Lexis in Text.* Oxford: Oxford University Press.

Hofmann, Th. R. (1993). *Realms of Meaning: An Introduction to Semantics.* London and New York: Longman.

Horn, L. R. (1988). "Pragmatic Theory." In Frederick J. Newmeyer (ed.), *Linguistics: The Cambridge Survey.* Vol 1 (pp. 113-145) Cambridge: Cambridge University Press.

Hudson, Rosta, Holmes & Gisborne. (1997). "Synonyms and Syntax." *Journal of Linguistics*, Vol.3. p.

Hurford, J. R. & Heasley, B. (1983). *Semantics: a coursebook.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hutchins, W. J. (1971). *The Generation of Syntactic Structures from a Semantic Base.* Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Hymes, D. (1964). "Toward Ethnographies of Communicative Events." *American Anthropologist.* Reprinted in Giglioli ed. (1972), *Language and Social Context.* Harmondraworth: Penguin Books.

Jackendoff, R. (1972). *Semantic Interpretation in Generative Grammar.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Jackendoff, R. (1983/1985). *Semantics and Cognition.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Jackendoff, R. (1995). *Languages of Mind: Essays on Mental Representation.* Massachussets; MIT Press.

Jackson, H. (1988). *Words and Their Meaning.* London and New York: Longman.

Jackson, H. (1990). *Grammar and Meaning: A Semantic Approach to English Grammar.* London and New York: Longman.

Dhaka University Institutional Repository

Jenkinson, E. B. (1967). *What Is Language?* Bloomington & London: Indiana University Press.

Kamp, H. (1981). "A Theory of Truth and Semantic Representation." In Groenendijk, Janssen & Stockhof eds. (1981), *Interpretation and Information* (pp.1-41). Dordrecht: Foris.

Kanazawa, M. ed. (1995). *Dynamics, Polarity and Quantification.* CSLI Publications.

Katz, J. J. (1966). *The Philosophy of Language.* New York & London: Harper & Row, Publishers.

Katz, J. J. (1967). "Recent Issues in Semantic Theory." *Foundations of Language*, 3, p.124-194.

Katz, J. J. (1972). *Semantic Theory.* New York: Harper & Row.

Katz, J. J. and Fodor, J. A. (1963). "The Structure of a Semantic Theory." *Language.* LIX, 170-210.

Katz, J. J. and Postal, P. M. (1964). *An Integrated Theory of Linguistic Description.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Keenan, E. L. and Faltz, L. M. (1985). *Boolean Semantics for Natural Language.* Dordrecht: Reidel.

Kemp, G. (1998). "Meaning and Truth Conditions." *The Philosophical Quarterly*, vol. 48, No.193, pp.483-493.

Kempson, R. M. (1977). *Semantic Theory.* Cambridge: Cambridge University Press.

King, M. (1976). "Generative Semantics." In E. Charniak & Y. Wilks (eds), *Computational Semantics.* Amsterdam: North Holland Publishing Company.

Kripke, A. (1972). "Naming and Necessity." In Saul Kripke (1972 / 1980), *Naming and Necessity,* Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Reprinted in A. P. Martinich ed. (1990), *The Philosophy of Language* (pp.278-294). 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Ladusaw, W. A. (1988). "Semantic Theory." In Frederick J. Newmeyer (ed), *Linguistics: The Cambridge Survey.* vol 1 (pp.89-112). Cambridge: The Cambridge University Press.

Lakoff, G. (1965). *Syntactic Irregularity.* New York: Holt, Rinehart & Winston.

Lakoff, G. (1968). "Instrumental Adverbs and the Concept of Deep Structure." *Foundation of Language*, 4. pp. 4-29.

Langakar, R. W. (1986). *Foundations of Cognitive Grammar.* Stanford: Stanford University Press.

Langer, S. (1951). *Philosophy in a New Key.* New York: Menor Book.

Dhaka University Institutional Repository

Larson, R. & Segal, G. (1995). *Knowledge of Meaning: An Introduction to Semantic Theory.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Leech, G. N. (1981). *Semantics.* Harmondsworth: Penguin Books.

Lehrer, A. (1974). *Semantic Fields and Lexical Structure.* Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Leonard, B. (1933). *Language.* New York: Holt, Rinehart & Winston. Indian edition (1935).

Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics.* Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis, D. (1972). "General Semantics." D. Davidson & G.H. Harman (eds.), *Semantics of Natural Language.* Dordrecht: Reidel.

Lewis, D. (1972). *Counterfactuals.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Lewis, M. (1993). *The Lexical Approach: the State of ELT and a Way Forward.* Hove: Language Teaching Publications.

Luria, A. R. (1982). *Language and Cognition.* New York: John Weley and Sons.

Lyons, C. (1999). *Definiteness.* Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. (1968). *Introduction to Theoretical Linguistics.* Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. (1977). *Semantics* (vol.1 & 2). Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, J. (1981). *Language and Linguistics: An Introduction.* Cambridge: Cambridge University Press.

Madocks, M. (1977). "The Limitations of Language." In Benson R. Schulman (ed.), *Language and Logic* (pp. 27-30). California: Westinghouse Learning Press.

Martinich, A. P. ed. (1990). *The Philosophy of Language.* 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Matthews, P. H. (1979). *Generative Grammar and Linguistic Competence.* London: George Allen & Unwin.

McCawley, J. D. (1968). "The Role of Semantics in a Grammar." In Bach and Harms (eds.), *Universals in Language,* New York: Holt, Rinehart & Winston.

McNeill, D. (1979). *The Conceptual Basis of Language.* Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Dhaka University Institutional Repository

Meulen, A. (1988). "Linguistics and the Philosophy of Language." In Frederick J. Newmeyer ed. (1988), *Linguistics: The Cambridge Survey,* vol. 1 (pp.430-446). Cambridge: Cambridge University Press

Miller, J. (1985). *Semantics and Syntax: Parallels and Connections*. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller. G. A. & Johnson-Laird, P. N. (1976). *Language and Perception.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Montague, R. (1974). *Formal Philosophy.* New Haven: Yale University Press.

Mundle, C. W. K. (1979). *A Critique of Linguistic Philosophy.* 2nd edition. London: Glover & Blair Limited.

Nida, E. A. (1975). *Componential Analysis Of Meaning: an Introduction to Semantic Structure.* The Hague: Mouton.

Nida, E. A., Lauw, J. P. & Smith, R. B. (1977). "Semantic Domains and Componential Analysis of Meaning." In Roger W. Cole (ed.), *Current Issues in Linguistic Theory.* Bloomington & London: Indiana University Press.

Noble. C. E. (1952). "The Analysis of Meaning." *Psychological Review*, 59. Reprinted in Cecco, J. P. (1967), *The Psychology of Language, Thought and Instruction* (pp. 147-156). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Ogden, C. K. and Richards, I. A. (1923). *The Meaning of Meaning.* London: Routledge & Kegan Paul.

Osgood, C. E. (1952). "The Nature of Meaning." *Psychological Bulletin*, 49. Reprinted in Cecco, J. P. (1967). *The Psychology of Language, Thought and Instruction* (pp. 156-164). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Osgood, C. E. Suci, G. J. & Tannenbaum, P. H. (1957). *The Measurement of Meaning*. Urbana: University of Illinois Press.

Palmer, F. R. (1981). *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, F. R. (1994). *Grammatical Roles and Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Partee, B. (1973). "The Semantics of Belief Sentences." In Hintikka, Moravcsik and Suppes (eds.), *Approaches to Natural Language.* Dordrecht: Reidel.

Partee, B. (1976). *Montague Grammar.* New York: Academic Press.

Partee, B. (1982). "Belief Sentences and The Limits of Semantics." In S. Peters & E. Saarinen (eds.), *Process, Beliefs and Questions* (pp.87-106). Dordrecht: Reidel.

Dhaka University Institutional Repository

Partee, B. (1984). "Compositionality." In Landman and Veltman (eds.), *Varieties of Formal Semantics* (pp.281-311). Dordrecht: Reidel

Platt, J. T. (1971). *Grammatical Form and Grammatical Meaning: A Tagmemic View of Fillmore's Deep Structure Case Concepts.* Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Postal, P. M. (1971). *Cross-Over Phenomena.* New York: Holt, Rinehart & Winston.

Putnam, H. (1975). "The Meaning of Meaning." In H. Putnam (1975), *Mind, Language and Reality: Philosophical Papers.* Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, and in K. Gunderson ed. (1975). *Language, Mind and Knowledge* (pp.131-193). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Quine, W. V. O. (1961). *From a Logical Point of View.* New York: Harper and Row, Publishers.

Radford, A. (1988).*Transformational Grammar.* Cambridge: Cambridge University Press.

Rapoport, A. (1977) "What Do You Mean?" In Benson R. Schulman (ed), *Language and Logic* (pp.18-23). California: Westinghouse Learning Press.

Richards, J. C. & Schmidt, R. W. (1983). *Language and Communication.* London & New York: Longman.

Rips, L. J. (1975). "Inductive Judgements about Natural Categories." *Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour*, 14, pp. 665-681.

Robins, R. H. (1980). *General Linguistics: An Introductory Survey.* London and New York: Longman.

Rosch E. & Mervis, C. B. (1975). "Family Resemblances: Studies in the Internal Structure of Categories." *Cognitive Psychology*, 7, pp.573-605.

Rosner, M. Johnson, R. ed. (1992). *Computational Linguistics and Formal Semantics.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Ross, J. (1967). *Constraints on Variables in Syntax.* Indiana: Indiana University Linguistic Club.

Russell, B. (1946). *An Inquiry Into Meaning and Truth.* London: George Allen & Unwin Ltd.

Saarinen, E. ed. (1978). *Game Theoric Semantics.* Dordrecht: Reidel.

Schank, R. (1984). *Conceptual Information Processing.* Amsterdam: North Holland.

Searle, J. R. (1965). "What is a Speech Act?" Max Black ed. (1965), *Philosophy in America* (pp.221-239), Ithaca: Cornell University Press. Reprinted in A. P. Martinich ed. (1990), *The Philosophy of Language* (pp.115-125). 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Searle, J. R. (1969). *Speech Acts.* Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1975). "Indirect Speech Acts." In Cole & Morgan (eds.) *Syntax and Semantics* . New York: Academic Press.

Simpson, P. (1993). *Language, Ideology and Point of View.* London & New York: Routledge.

Sinha, M. N.. (1993). *A Handbook of English Philology.* Bareilly: Prakash Book Depot.

Skinner, B. F. (1957). *Verbal Behaviour.* New York: Appleton Crofts.

Smith, E. E. (1977). "Theories of Semantic Memory." In W. K. Estes (ed), *Handbook of Learning and Cognitive Processes.* Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Stalnaker, R. (1984). *Inquiry.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Stock, F. C. & Widdowson, J. D. A. (1974). *Learning About Linguistics.* London: Hutchinson.

Strawson, P. F. (1969). "Meaning and Truth." In Strawson (1970), *Inaugural Lecture*, Oxford: Clarendon Press. Reprinted in A. P. Martinich ed. (1990), *The Philosophy of Language* (pp.91-102). 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Swadesh, M. (1972). *The Origin and Diversification of Language.* London: Routledge & Kegan Paul.

Talmy, L (2000 / to be published). *Toward a Cognitive Semantics.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Tarski, A. (1944). "The Semantic Conception of Truth." *Philosophy and Phenomenological Research*, IV, 341-357. Reprinted in A. P. Martinich ed. (1990), *The Philosophy of Language* (pp.48-71). 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Trudgill, P. (1983). *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society.* Harmondsworth: Penguin Books.

Ullmann, S. (1957). *The Principles of Semantics.* Oxford: Basil Blackwell

Varshney, R. L. (1993). *An Introductory Textbook of Linguistics & Phonetics.* Bareilly: Student Store.

Vendler, Z. (1972). "On Saying Something." *Res Cogitans.* Reprinted in A. P. Martinich, (ed). (1990). *The Philosophy of Language.* 2nd edition. New York & Oxford: Oxford University Press.

Weinreich, Uriel. (1972). *Explorations in Semantic Theory.* The Hague: Mouton.

Widdowson, H. G. (1990). *Aspects of Language Teaching.* Oxford: Oxford university Press.

Wierzbicka, A. (1980). *Lingua Mentalis.* New York: Academic Press.

Dhaka University Institutional Repository

Winskel, G. (1993). *The Formal Semantics of Programming Languages*: An Introduction. Mass.: MIT Press.

Wittgenstein, L. (1958). *Philosophical Investigations*. 2nd edition. Oxford: Blackwell.

Yule, G.. (1996). *The Study of Language: An Introduction*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

আজাদ, হুমায়ুন । (১৯৯৯) । *অর্থবিজ্ঞান* । ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী ।

উলম্যান, স্টিফেন (১৯৫৭) (অনুবাদ ঃ জাহাঙ্গীর তারেক ১৯৯৩) । *শব্দার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র* । ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী ।

গুপ্ত, অতুলপ্রসাদ । (১৯৭৩) । *কাব্যজিজ্ঞাসা* । কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ।

তারেক, জাহাঙ্গীর । (১৯৯৮) । *শব্দার্থবিজ্ঞান* । ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী ।

দাস, রমাপ্রসাদ । (১৯৯৫) । *শব্দ ও অর্থ ঃ শব্দার্থের দর্শন* । কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

বিশ্বাস, নরেন । (১৯৮৮) । *অলংকার অন্বেষা* । ঢাকা ঃ কালিকলম প্রকাশনী ।

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী । (১৯৭৭) । *বাগর্থ* । কলকাতা ঃ জিজ্ঞাসা ।

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী । (১৯৮৫) । *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি* । কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স ।

মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ । (১৯৯৩) । *অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ* । কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং ।

হুমায়ুন, রাঙ্গীব । (১৯৯৩) । *সমাজভাষাবিজ্ঞান* । ঢাকা ঃ দ্বীপ প্রকাশন ।